আঁধার থেকে আলোর দিকে

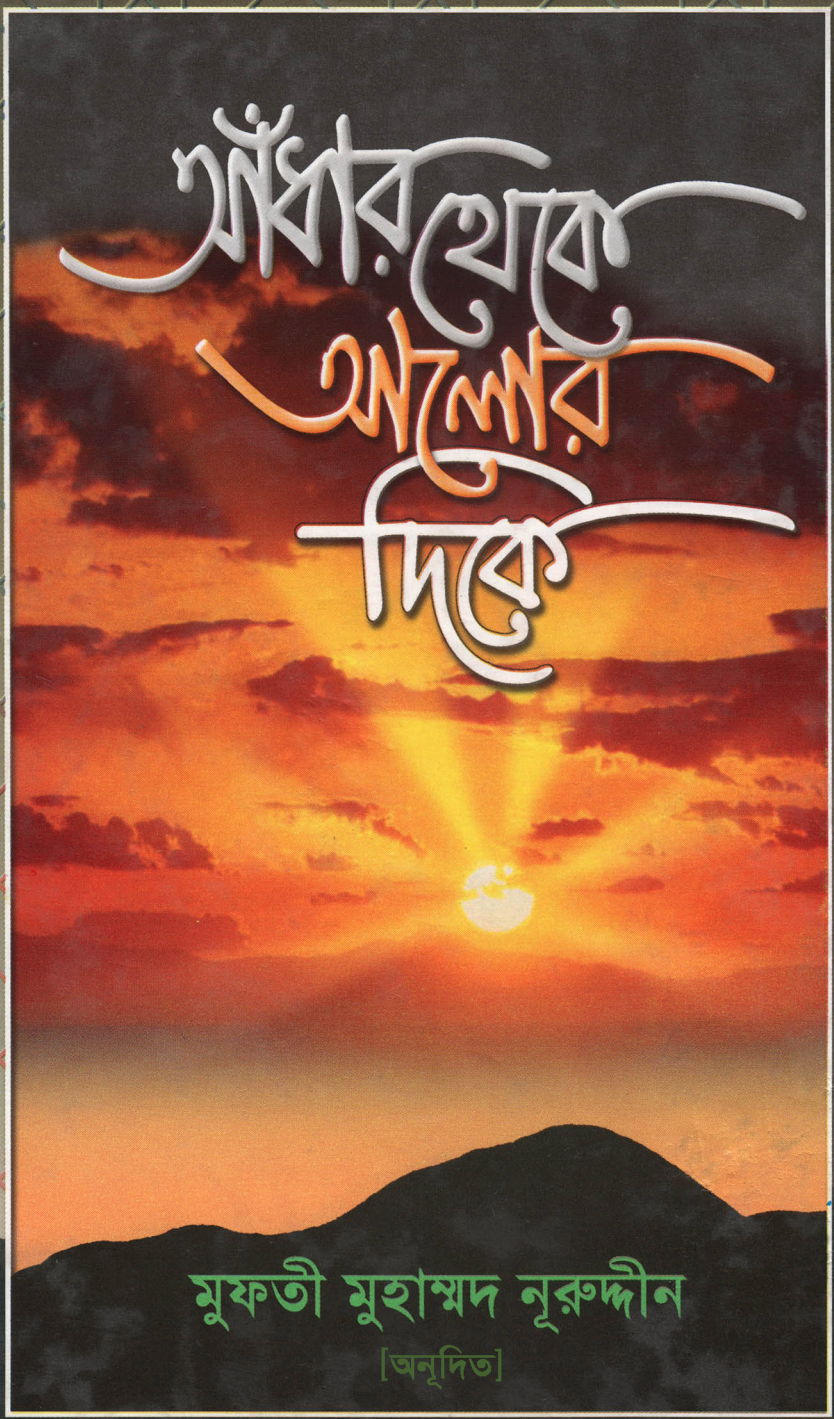

মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন

[অনূদিত]

আঁধার থেকে আলোর দিকে

মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন
সিনিয়র পেশ ইমাম
বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ
ঢাকা।

আল হায়াত প্রকাশনী

আঁধার থেকে আলোর দিকে

মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন

পরিবেশনায় ঃ আল-হায়াত প্রকাশনী
৫১, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ আগষ্ট, ২০০২

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

পরিবেশনায় ঃ আদর্শ রমণী লাইব্রেরী
বায়তুস সুজূদ জামে মসজিদ
নূরজাহান রোড (১২নং বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
মোঃ শাহীন
ক্রাফট ইন্টারন্যাশনাল
ঢাকা-১২০৭,

সৌজন্য মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা

Adhar Thaka Allor Dika by **Mufti Mohammad Nuruddin**. Publishe : Al-Hayet Prokashoni, 51 Purana Paltan Lain, Dhaka.

ইসলাম ধর্মের সত্যতা অনুধাবন করে যারা কুফরীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঈমানের আলোতে এসেছেন তাদের পরকালিন মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত .....

উপহার

আঁধার থেকে আলোর দিকে

বই খানা আমার...

কে

শ্রদ্ধার/স্নেহের
নিদর্শন স্বরূপ

উপহার
দিলাম।

স্বাক্ষর ঃ...

তারিখ ঃ...

'নিবেদন'

'আঁধার থেকে আলোর দিকে' একজন নও মুসলিমের আত্মকথা। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রেক্ষাপট, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ও অবস্থা, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি কি হারিয়েছেন আর কি লাভ করেছেন, এসব বিষয়গুলোই তিনি তার এই 'আত্ম কথায়' উল্লেখ করেছেন।

এই নওমুসলিমের নাম গাজী আহমাদ। নামটি তার নিজের পছন্দ করা। তার পূর্ব নাম ছিল কৃষ্ণলাল (কালচূনি)। কৃষ্ণলালের গোত্র সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিল। উচ্চবিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পাঠ কালেই কৃষ্ণলাল পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গাজী আহমাদ হন।

কৃষ্ণলাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বেই স্বপ্নে একাধিক বার ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিদার লাভ করেন। তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রেক্ষাপট খুবই আলৌকিক।

ঘটনাটি সেই সময়কার, যখন এই উপমহাদেশ ইংরেজ বেনিয়াদের শাসনে ছিল পরাধীন। বর্তমান পাকিস্তানের ঝিলাম জেলার একটি সীমান্ত গ্রামের নাম ছিল মিয়ানী। ঐ মিয়ানী গ্রামেই একটি সনাতন স্বচ্ছল হিন্দু পরিবারে ১৯২৪ সালে কৃষ্ণলালের জন্ম। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসের এক শুক্রবার স্থানীয় জামে মসজিদে জুমার নামাযের পূর্বে ঐ মসজিদের খতীব মাওলানা আবদুর রউফ সাহেবের হাতে ইসলামের কালিমা পাঠ করে কৃষ্ণলাল আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান হন।

কিন্তু গাজী আহমাদ তাঁর এই জীবন কথায় ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত পূর্বের একটি স্বপ্নের কথাও উল্লেখ করেছেন। গাজী আহমাদ সাহেব বলেন ঃ

'আমি তখনও কৃষ্ণলাল। একরাত্রে স্বপ্নে দেখি আমার এক পাঠ্যসাথী সহ আমরা দু'জন কা'বার পথে অগ্রসর হচ্ছি। মক্কা পৌছে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে দেখি হাতীম আর রোকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহর ঘরের দেয়াল ঘেঁষে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সঃ) বসে রয়েছেন। তাঁর চতুর্দিকে বিশিষ্ট সাহাবীগণও বসা। আমি অগ্রসর হতেই নবীজী (সাঃ) উঠে এসে পরম স্নেহে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কেন এসেছ? আমি বললাম, আপনার হাতে আপনার ধর্ম গ্রহণ করার জন্য। নবীজী কাবা গৃহের দেয়াল স্পর্শে বসে খুবই খুশী মনে আমাকে কালেমা তায়্যেবা পাঠ করালেন। তারপর বললেন, এখন তুমি মুসলমান। এর পরই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নওমুসলিম গাজী আহমাদ তাঁর পিতা কর্তৃক চরম হঠকারিতার শিকার হন এবং পরে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও যাতনা ভোগ করেন। গাজী আহমাদের পিতা কাশ্মীরের পাহাড়ী দুর্গম এলাকায় চাকুরী করতেন। কৃষ্ণলালের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত সংবাদ পেয়ে তিনি বাড়ী এসে টাকার বিনিময়ে আদালত হতে এক তরফা হঠকারীমূলক রায় নিয়ে তিনি ছেলেকে নিজের কর্মস্থল কাশ্মীরে নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে তিনি গাজী আহমাদকে লোকালয় থেকে বাইরে পাহাড়ী নির্জন এলাকায় নিয়ে বলেনঃ "তোকে এখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মজা বুঝাব" এই বলে গাজী আহমাদকে বেধম প্রহার শুরু করেন। পায়ের উরু ও গোছা ফেটে রক্ত বেরুতে শুরু করলো। গাজী আহমাদ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। গাজী আহমাদের এক আত্মীয় নাকি পরামর্শ দিয়েছিল নির্জন কোন এলাকায় নিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলার জন্য।

এবার তিনি সম্ভবতঃ সেই পরামর্শই পালন করতে যাচ্ছিলেন। পাহাড়ী উঁচু স্থান হতে ধাক্কা দিয়ে গাজী আহমাদকে কয়েক হাজার ফুট নীচুতে প্রবাহিত শ্রোতস্বিনি ঝর্ণায় ফেলে

দিতেই ছিলেন। এখানেও গাজী আহমাদ এক অলৌকিক ব্যবস্থায় বেঁচে যান। 'আরো বিভিন্ন পথ ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে' গাজী আহমাদকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবার জন্য। কিন্তু গাজী আহমাদ অটল ও অবিচল থাকেন। পিতার মারধোর ও নির্যাতন নীরবে সয়ে যান। মনে মনে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকেন হে আল্লাহ! যেভাবে আমাকে আপনার উপর ঈমান আনার তৌফিক দান করেছেন, তেমনিভাবে আমাকে ঈমানের উপর অটল ও অবিচল রাখুন।

ইসলামের আদর্শ-বৈশিষ্ট, ইসলামের আচার-আচরণ, ইসলামের সাম্য-ইনসাফ, মমত্ব-মহত্ব, ইসলামের বিচার-ফয়সালা দেখে এই ধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝে যারা তাদের মনের কপাট খুলে অবিশ্বাসের ভ্রান্তি আর কুফরীর আবর্জনা দূর করে ঈমান ও বিশ্বাস দ্বারা যারা–তাদের অন্তর ভরে নেন, 'যারা কুফরীর আঁধার থেকে থেকে ঈমানের আলোতে আসেন' এবং ঈমান যাদের অন্তরের গভীরে স্পর্শ করে তাদেরকে কোন ভাবেই ইসলাম থেকে সরানো যায় না। অর্থ ও ললনার লোভ-লালসা দিয়েও নয়, নিষ্ঠুর যাতনা-নির্যাতন করেও নয়, যেমন করা যায়নি বিলাল হাবসী, আম্মার ইবনে ইয়াসির, খাব্বাব ও খোবায়েব প্রমূখ সাহাবী (রাঃ) গণকে। তেমন সরানো যায়নি গাজী আহমাদকেও।

গাজী আহমাদ সাহেবের পরবর্তী জীবন ছিল যেমন সফল তেমনি বর্ণাঢ্য। একদিকে তিনি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীগুলো গৌরবের সাথে লাভ করতে থাকেন অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে দরসে নিযামী (কওমী) মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী 'দাওরা হাদীস' পাশ করে অতি উঁচু পর্যায়ের খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন হন।

গাজী আহমাদ সাহেব পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম,এ, আরবী ও এম,এ, ইসলামিয়াত দু'টি বিষয়েই প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে দু'টি স্বর্ণ পদক ও অপর একটি বিষয়ে তৃতীয় একটি রৌপ্য পদক লাভ করেন।

গাজী আহমাদ সাহেব প্রথম ব্যক্তি যিনি মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে পাঠ্য ফিক্‌হে হানাফীর বিখ্যাত গ্রন্থ হিদায়ার উর্দূ অনুবাদ করেছেন। বিখ্যাত আরবী কাব্য-সাহিত্য 'দেওয়ানে হামাসা' উসূলে ফিকহের উসূলে শাশীরও তিনি অনুবাদক। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনী ভিত্তিক একটি ইংরেজী বইও তিনি লিখেছেন।

দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য কর্ম জীবনে গাজী আহমাদ অনেক অনেক অনুরাগী ও শুভাকাংখী পেয়েছিলেন। তারা বার বার তাকে তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো উল্লেখ পূর্বক একটি আত্মজীবনী লিখে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। গাজী আহমাদ প্রথম দিকে বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরবর্তী সময়ে 'আঁধার থেকে আলোর দিকে' একটি আত্মকথা লিখে দেন। বইটির গ্রন্থনায় তার নামের সার্থক ব্যাখ্যা ফুটানো হয়েছে।

বইটি বাজারে আসার সাথে সাথে হাজারো মানুষের ঈমানী চেতনার খোরাক হয়ে যায়। চাহিদার কারণে পুনঃ পুনঃ মুদ্রণ করতে হয়। ইংরেজী, হিন্দী, সিন্দী সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বইটির অনুবাদ কারা হয়। আজ বাংলা ভাষায় বইটির মুদ্রণ করতে পারায় মহান আল্লাহর দরবারে অন্তহীন শোকর আদায় করছি।

গাজী আহমাদের জীবন কথাগুলো খুবই হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী ও ব্যথা-বেদনায় ভরা। যার মধ্যে রয়েছে ঈমানী চেতনা ও প্রেরণা। বইটি পাঠে আল্লাহ আমাদের ঈমানী চেত'না বৃদ্ধি করুন।

'আঁধার থেকে আলোর দিকে' বইটির প্রকাশ লগ্নে আমি "মাসিক আদর্শ রমণী" পত্রিকার সম্পাদক, হাফেজ মাওলানা কামরুল ইসলাম ও সহযোগী সম্পাদক মুফতী মাওলানা আবুল হাসান শরীয়তপুরীর আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করছি।

মুহাম্মদ নুরুদ্দীন।

রাওয়ালপিন্ডি হতে সারগোদা যাওয়ার পথে চাকওয়ালের চব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত উঁচু এলাকাটির নাম দিনহার। এটা ১৯২০ ইং সালের কথা। ঝিলাম জিলার শেষ প্রান্তের এই এলাকাটি সমুদ্র স্তর হতে প্রায় দুই হাজার সাতশত ষাট ফুট উঁচু। এ কারণে এলাকাটি শীত প্রধান, তবে গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম অনুভব হয় না। তখন মৌসুমও থাকে খুবই মনোরম। তীব্র গরমের সময়ও দিনহারের ঠান্ডা বাতাস মানুষের মনকে মুগ্ধ করে রাখে। কথিত রয়েছে "মোগল সম্রাট বাবর যখন খোশাবের দিকে অভিযান পরিচালনা করার সময় এখানে আসেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করেন, তখন এখানকার আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে মুগ্ধ করে তোলে। তিনি আনমনে বলে উঠেন "দিনহার তো ছোট্ট কাশ্মীর"। গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন অঞ্চল হতে লোকজন দিনহারে আসেন, তখন এলাকাটি সৌখিন পর্যটকদের একটি মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে দিনহারের প্রতিটি গ্রামে হিন্দু বসতি ছিল। মুসলমানদের তুলনায় তাদের সংখ্যা যদিও কম ছিল, কিন্তু ধন-সম্পদে প্রাধান্য ছিল তাদের। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ-সম্পদ ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। মুসলমানরা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে হিন্দুদের নিকট থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ গ্রহণ করত। কিন্তু অনেকেই তা আদায় করতে পারতো না। ফলে সারা জীবনই তাদের চক্রবৃদ্ধির সুদ মুসলমানদের গুণতে হতো এবং তারা নিঃস্ব হয়ে পড়তো। সেখানকার মুসলমান ছেলেরা কিছু শিক্ষাগ্রহণ করেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যেত।

দিনহারে সাতাশটি গ্রাম ছিল। তন্মধ্য হতে আবাদী, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে 'বুঝালকালা' গ্রামটি ছিল সবচেয়ে উন্নত। এটাই ছিল ঐ অঞ্চলের প্রাণ কেন্দ্র। বুঝালকালার দুই মাইল উত্তরে একটি ছোট্ট গ্রাম। এর জনবসতি ছিল খুব কম। এ গ্রামেই ছিল গাজী আহমাদদের বাড়ী। গ্রামে দুইশত পরিবার ছিল। তার মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল এক চতুর্থাংশ। গ্রামে তিনটি দোকান ছিল। ডাল, চাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সেখানে পাওয়া যেত। এই দোকানগুলোর মালিক ছিল হিন্দুরাই। তারা অভাবী মুসলমানদের বাকীতে খাদ্য সামগ্রী দিত এবং মৌসুমী ফসলের সময় অতি অল্প মূল্যে ঐসব ফসল তারা বিক্রীত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য হিসেবে আদায় করে নিত।

মুসলমানদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে হিন্দুদের দাওয়াত দিতে হতো এবং মুসলমানদের পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ মিটাবার জন্য হিন্দুদের ফয়সালাই গ্রহণ করতে হতো। মিয়ানীর এক প্রভাবশালী হিন্দু ছিল লালা জুয়ালা সহাই। তার ছিল

আরো তিন ভাই- মিতওয়াল চাঁদ, দেওয়ান চাঁদ এবং গোপী চাঁদ। এরা সবাই তাদের গোত্রের বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তাদের প্রত্যেকে অনেক চাষাবাদযোগ্য জমির মালিক ছিল। লালা জুয়ালা সহাই ছিল গাজী আহমাদের দাদা। তার তিন ছেলে। লালা গৌরাঙ্গ, লালা ভীমসীন, লালা রামচরণ। এরা তিনজনই সরকারী চাকুরী করতো। আর তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল। এদের মধ্যে লালা ভীমসীন কাশ্মীরে হরেকৃষ্ণ এন্ড কোং টিম্বার সাপ্লাই ফার্মের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন। চাকুরী সূত্রে তিনি সেখানেই থাকতেন। লালা ভীমসীন তাদের গোত্রের সর্বাধিক সম্পদশালী ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সবাই তাদেরকে সুখী পরিবাররূপে গণ্য করতো। কিন্তু এত সুখের ভিতরেও এই পরিবারে একটি অভাব ও বিষণ্নতা বিরাজ করছিল। লালা ভীম বিবাহ করার পর একে একে তার চারটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়, কিন্তু কেউই কৈশোর অতিক্রম করতে পারেনি। শিশু কালেই সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। লালাভীমের স্ত্রী এতে খুবই বিষণ্ন ও দুঃখী ছিল। পরবর্তী সময়ে কিছুদিন সন্তান হওয়া বন্ধ রইলো। সন্তানের জন্য লালা ভীমের স্ত্রী অস্থির হয়ে উঠল। ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করল। মাজারে,মন্দিরে ধর্ণা দিল, কিন্তু কোন ফল হলো না, তাদের সন্তান হলো না। এরই মাঝে একজন পন্ডিত লালাভীমকে বললো, তোমরা সারগোদা যাও, ওখানে কিরানা পাহাড়ের পাদদেশে একটি মন্দির রয়েছে, উক্ত মন্দিরের সাধুজীকে দিয়ে প্রার্থনা করাও। অবশ্যই সুফল পাবে। লালাভীম চাকুরী ক্ষেত্রে খুবই ব্যস্ত থাকে বিধায় বাড়ীতে আসার তেমন সুযোগ পায় না। তারপরও যখনই আসতো কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসব তদবির করতো। কিন্তু এতে কোন ফল না হওয়ায় পন্ডিতজীর পরামর্শ মুতাবেক কিরানার মন্দিরে যাওয়ার জন্য স্ত্রী স্বামীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

তাই লালাভীম একদিন ছুটি নিয়ে বাড়ী এসে স্ত্রীকে নিয়ে কিরানা মন্দির দর্শনে গেলো।সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে লালাভীম স্ত্রীকে নিয়ে মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত দেবতার বেদীতে দাঁড়িয়ে করজোড়ে প্রণাম করলো, মাথা নীচু করলো। প্রার্থনা করলো, 'হে পরমাত্মা! অধীনকে এমন সন্তান দাও যে বেঁচে থাকবে।' প্রতিমাগুলোর দর্শন শেষ করে লালাভীম মন্দিরের সাধুজীর কাছে গেলো। করজোড়ে আর্তি জানালো, সন্তান হয়ে বেঁচে থাকলে হাজার রুপীয়া মন্দিরে নজরানা দিব।

উনিশ-শ'-চব্বিশ ইংরেজী সনে লালাভীমের ঘরে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হলো। এ সংবাদে সারা গোত্রের লোকেরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠলো। গরীববের মধ্যে টাকা, শিন্নী বিতরণের সময় নবজাতকের দীর্ঘায়ু চাওয়া হলো। গরীবরা শিন্নী খেয়ে ও টাকা পেয়ে প্রসন্ন মনে সবাই বর দিল। এক পুরোহিতের উপদেশ মত নবজাতকের নাম রাখা হলো কৃষ্ণ লাল। সাধু বললো-শ্রী কৃষ্ণের মত বয়স পাবে, অবতার হবে।

কৃষ্ণলালের এ জন্ম বৃত্তান্ত তার মা তাকে বলেছে। কিন্তু তার মায়ের একথা জানা ছিল না যে, মানুষকে সন্তান দেয়া বা সন্তানের হায়াত দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ! তিনি চিরঞ্জীব, বিশ্বনিয়ন্তা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা। তাঁর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণেই বিশ্বজগত চলমান রয়েছে, আর সব সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী। মানুষ যখন সত্য পথ বর্জন করে এক আল্লাহর দরজা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তার ফল এই দাঁড়ায়

যে, অগণিত দরজার চৌকাঠে তার মাথা কুটতে হয় এবং সে কুফরীর গভীরে নিমজ্জিত হয়।

কৃষ্ণলালদের গ্রামের একটি মুসলিম পরিবারের সাথে তাদের খুব পারিবারিক সখ্যতা ছিল। উক্ত পরিবারের কর্তা মালিক সুলতান সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতেন। উনিশ শ' চব্বিশ সালের শুরুর দিকে তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করে বাড়ীতে চলে আসেন। সাইয়িদ মুহাম্মদ হুসাইন শাহ নামে সেই এলাকায় একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ ছিলেন। সুতরাং তিনি চাকুরী হতে অবসর নিয়ে বাড়ী এসে উক্ত বুজুর্গকে দাওয়াত করে নিজ বাড়ীতে আনলেন।এলাকার হিন্দু-মুসলিম সবাই এই বুজুর্গকে শ্রদ্ধা করতেন। কৃষ্ণলালের মা তাদের এক আত্মীয় বাড়ী যাওয়ার সময় মালিক সুলতানের বাড়ী এল এবং সেই বুজুর্গের নিকট সন্তানের জন্য দোয়া চাইল। শাহ্ সাহেব বললেন, "এ মহিলার উদরে এক পুত্র সন্তান রয়েছে, আমি তার কালিমা পাঠ করার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

উপস্থিত লোকেরা বললো, শাহ্ সাহেব এ তো একজন হিন্দু মহিলা! শাহ্ সাহেব বললেন, হতে পারে সে হিন্দু, কিন্তু তার সন্তান হিন্দু ধর্মে নাও থাকতে পারে। আমিতো তার কালিমা পাঠের আওয়াজ শুনছি।

মালিক সুলতান সাহেব বললেন, আমরা শাহ্ সাহেবের কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং নীরব রইলাম। আর ভাবতে লাগলাম, এত কট্টর মূর্তিপূজারী হিন্দু পরিবারের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে মায়ের পেটে কালিমা পড়ছে? এটা কি করে সম্ভব?

মালিক সুলতান বলেন ঃ আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, উনিশ শ' চব্বিশ সালের মাঝামাঝি লালাভীমের ছেলে ভূমিষ্ট হল এবং তার নাম রাখা হল কৃষ্ণলাল। কয়েকদিন পর আমি আমার এক বোনকে সাথে নিয়ে কৃষ্ণলালকে দেখতে এলাম। আমি বোনকে বললাম, কৃষ্ণলালকে তুমি কোলে তুলে আমার সামনে নিয়ে আস- আমি তাকে দেখবো। আমার এই বোন তখন শাহ্ সাহেবের কাছে ছিল এবং শাহ্ সাহেবের সেই অলৌকিক কথা সেও শুনেছিল। এজন্য আমার মত তার মনেও এই শিশু সম্পর্কে একটা কৌতুহল ছিল। আমরা ভাই-বোন দু'জনেই শিশুকে ভালভাবে দেখলাম, আদর করলাম এবং মনে মনে এই দোয়া করে ফিরে এলাম, হে আল্লাহ! সত্যিই যেন এই শিশু তোমার কালিমা পাঠকারী হয়।

মালিক সুলতান সাহেব স্মৃতিচারণ করে বলেন দীর্ঘ একযুগ পার হয়ে গিয়েছে, শাহ্ সাহেবের কথা আমার স্মরণই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার সেই বোন দৌড়ে আমাদের বাড়ী এসে বললো, ভাই! শাহ্ সাহেবের কথা তো সত্যই পরিণত হল। কৃষ্ণলাল তো ইসলামের কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। আমরা সবাই আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলাম, আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

কৃষ্ণলালের পর তার আরও তিনটি ভাই জন্ম গ্রহণ করে মোহনলাল, অর্জুন দাস এবং প্রেমদাস। কৃষ্ণলাল যেহেতু সকলের বড় ছিল, তাই তার প্রতি পিতা-মাতা ও গোত্রের লোকদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সবাই তাকে আদর করতো। এক কথায় বলতে গেলে সে ছিল সকলের আদরের কেন্দ্রবিন্দু। লালাভীম কাশ্মীর থেকে ছুটিতে বাড়ী আসার সময় কৃষ্ণলালের জামা-কাপড়, খেলনা-খাদ্য অনেক কিছু

নিয়ে আসতো। এভাবে কৃষ্ণলালের শৈশব ও বাল্যকাল খুবই আদর-যত্নে ও আয়াশ-বিলাসে অতিবাহিত হল।

বিদ্যালয়ে ভর্তি ঃ পাঁচ বছর বয়সেই কৃষ্ণলালকে স্কুলে ভর্তি করা হলো। লালাভীম পত্র মারফত কৃষ্ণলালকে স্কুলে ভর্তি করতে বললো। সে অনুযায়ী মিয়ানীর প্রাইমারী স্কুলেই তাকে প্রথমে ভর্তি করা হলো। কৃষ্ণলালের দাদী তাকে স্কুলে নিয়ে গেলো এবং ভর্তি করে আসলো। দাদী কৃষ্ণলালের ভর্তি ফরমে জন্ম তারিখ অনুমান করে ১লা জুন ১৯২৪ ইংরেজীর পরিবর্তে ১ লা জুন ১৯২২ ইংরেজী লিখে দিল। পরবর্তী সময়ে এ বয়স বৃদ্ধিটা কৃষ্ণলালের জন্য বিরাট উপকার বয়ে আনল।

স্কুল পরিবর্তন ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সময়টুকু কৃষ্ণলালকে মিয়ানীর ডি. বি প্রাইমারী স্কুলেই রাখা হল। পরে তাকে বুঝালকালার ডি.বি মডেল স্কুলে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করা হল।

"কৃষ্ণলাল বলেন, মিয়ানী হতে আমরা প্রায় বিশ-বাইশ জন ছাত্র বুঝালকালার মডেল স্কুলে যেতাম।এর মধ্যে আমরা চারজন ছিলাম হিন্দু, বাকীরা ছিল মুসলমান। কিন্তু আমাদের মাঝে খুব বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা ছিল। সবাই একসাথে স্কুলে যেতাম, আবার স্কুল ছুটি হলে একত্রেই সবাই ফিরে আসতাম।"

কিরানা মন্দির দর্শন ঃ লালাভীম আর তার স্ত্রীর একটা মান্নত ছিল যে, সন্তান হলে তারা সন্তানসহ পুনরায় কিরানা মন্দির দর্শন করবে এবং হাজার টাকা নজরানা দিবে।

স্ত্রী লালাভীমকে বারবার মান্নত পূরণ করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিত। মান্নত পূরণে বিলম্বিত হলে পাছে সন্তানের না কোন অকল্যাণ হয়, তার এই আশংকাও ছিল। এদিকে কৃষ্ণলালের একটু বড় হয়ে উঠারও অপেক্ষা ছিল, তাছাড়া লালাভীমের চাকুরীর ব্যস্ততা তো ছিলই।

উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সাল। কৃষ্ণলালের বয়স তখন এগার। সে পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েছে। লালাভীম মন্দির দর্শনের ছুটি নিয়ে বাড়ী এলো এবং স্ত্রীকে বললো, এবারের ছুটিতে আমরা কিরানা যাব-তুমি প্রস্তুতি নাও।

কথা অনুযায়ী একদিন লালাভীম স্ত্রী-পুত্র সহ মান্নত পূরণের জন্য কিরানা মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। মন্দিরে কালো রং এর অনেক মূর্তি ছিল। কৃষ্ণ দেখল, তার পিতা-মাতা সব মূর্তির বেদীতে গেল এবং সবগুলোর উদ্দেশ্যেই মাথানত করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো। কৃষ্ণ তার পিতার কাছাকাছি ছিল, সে দেখল পিতা-মাতার পূজা করার দৃশ্য। কৃতজ্ঞতার এসব আচার-অনুষ্ঠান শেষ করে লালাভীম মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দর্শনে গেলো। তারা পুরোহিতের পায়ের নিকটে মাথা রেখে প্রণাম করলো। পুরেহিত তাদের প্রণাম গ্রহণ করার পর তারা মাথা তুললো। লালাভীম পকেট হতে বের করে পূর্ব হতে পৃথক করে রাখা একহাজার রুপী পুরোহিতের হাতে দিয়ে তার মান্নত পূরণ করলো। এক হাজার টাকা পেয়ে সাধু খুবই প্রসন্নচিত্তে কৃষ্ণের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলোঃ ভগবানের ইচ্ছায় এই ছেলে দীর্ঘ বয়স পাবে, সম্মান পাবে। সারগোদায় কৃষ্ণলালের মামার বাড়ী ছিল। মন্দিরের দর্শন শেষ করে সেদিন তারা কৃষ্ণের মামার বাড়ী গেল এবং সেখানে রাত

যাপন করল। শ্বশুর বাড়ীর লোকদের আরো দু'একদিন বেড়ানোর অনেক অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে পরদিন লালাভীম স্ত্রী-পুত্রসহ বাড়ী চলে এলো। কৃষ্ণের স্কুল ছুটি থাকায় মন্দির দর্শনের সুযোগ হয়েছিল। ছুটি সমাপ্ত হলে কৃষ্ণলালকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করানো হলো। কৃষ্ণের পাঠ্য জীবনের প্রথম ধাপ সমাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় ধাপ শুরু হলো।

কৃষ্ণলালের পিতা-মাতা সনাতন হিন্দু ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের অনুসারী ছিল। মূর্তিপূজা, ব্যক্তিপূজাই ছিল এর মৌলিক বিষয়। এদিকে মিয়ানী গ্রামে একটি মন্দির ছিল। কিন্তু সেখানে কোন দেবতার মূর্তি ছিল না। সৌভাগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কৃষ্ণের পরিবারের লোকেরাও এই মন্দিরে যেত। মন্দিরে মূর্তি না থাকলেও তাতে একটি গ্রন্থ রাখা ছিল। গ্রামের মাত্র দু'জন অর্থাৎ একজন পুরুষ আর একজন মহিলা ঐ গ্রন্থ পাঠ করতে জানতো। আর তারাই তা পাঠ করতো। প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখে গ্রামের হিন্দু পুরুষ-মহিলা সবাই মন্দিরে উপস্থিত হলে গ্রন্থ পাঠ করা হতো। গ্রন্থ পাঠ শেষে প্রসাদ (শিন্নি) বিতরণ করা হতো। কৃষ্ণলাল বলেন, আমরা (ছোট ছেলেমেয়েরা) প্রসাদের লোভে বেশী ভীড় করতাম।

গ্রামের হিন্দুদের শাস্ত্রীয় শিক্ষায় তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য মন্দিরে যাওয়াই তারা যথেষ্ট মনে করতো এবং কয়েকটি রুসুম পালনের মধ্যেই তাদের ধর্মীয় কর্ম সীমিত হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণলালের এক বিধবা পিষি ছিল, সে নিয়মিত মন্দিরে যেত এবং মালা পড়ে থাকতো। মাঝে মধ্যে কৃষ্ণদেরকে সীতা-রামের গল্প শুনাতো।

ধর্মীয় আলোচনা ঃ

কৃষ্ণলালের বয়স যখন তের-চৌদ্দ বছর, তখন সে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলে তো হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা একত্রেই যাওয়া আসা করতো। যাওয়া আসার সময় রাস্তায় তারা বিভিন্ন আলোচনায় মাঝে মধ্যে ধর্ম বিষয়েও আলোচনা করতো। কৃষ্ণলাল যুক্তি দিয়ে বলতো, মুসলমানরা যদি সঠিক পথের অনুসারী হতো এবং আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হতো তাহলে তারা এত দরিদ্র হবে কেন? দেখ না হিন্দুরা কত সচ্ছল, শিক্ষা-দীক্ষা ও ধন-সম্পদে অগ্রসর, কত আরাম-আয়েশ তাদের। কাজেই প্রমাণিত হল হিন্দুরাই আল্লাহর প্রিয়, পছন্দনীয় এবং সত্য পথের অনুসারী।

মুসলমান ছাত্ররা বলতো, জাগতিক ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ আল্লাহর পছন্দ ও সন্তুষ্টির মাপকাঠি ও নিদর্শন নয়, এটা ইসলামী Conception । আসলে "আজল দিবসে" আল্লাহ্ যখন সব মানুষের রূহ সৃষ্টি করে একত্রিত করেছিলেন তখন যাদের রূহগুলো ঈমানের ন্যায় মহাসম্পদ চেয়েছিল তারাই পৃথিবীতে ঈমান এনে মুসলমান হয়েছেন, আর যে রূহগুলো জাগতিক অর্থসম্পদ চেয়েছে তারা অর্থ-সম্পদ পেয়েছে, আর হিন্দু রয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণলাল বলেন-মুসলমান ছাত্রদের এ জবাব শুনে আনমনেই আমার মনে বঞ্চিত ভাব সৃষ্টি হতে লাগলো। হয়তোবা সে কারণেই আমাদের অর্থ-সম্পদ বেশী। আমরা প্রভুর নিকট অর্থই চেয়েছিলাম, ঈমান আমরা চাইনি। কৃষ্ণ মনে

মনেই সংকল্প করলো "এখন থেকে আমি প্রভুর নিকট ঈমানও চাইবো।"

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত প্রথম বই পাঠ ঃ

একবার এক সহপাঠী মাওলানা উবায়দুল্লাহ কর্তৃক রচিত ইসলাম সম্পর্কিত একটি বই আমাকে পড়তে দিল। বইটির নাম তুহ্ফাতুল হিন্দ। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব পূর্বে শিখ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বইটিতে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও শিখ ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা ছিল। আমি বয়সে খুব বড় ছিলাম না, তবুও বইটি আমার মনে ধর্ম সম্পর্কে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। ধর্ম সম্পর্কে আমার মনে কৌতুহল সৃষ্টি হতে লাগলো। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় হিন্দু ধর্ম মতে সন্ধ্যা পালন করতে লাগলাম। রাত্রে নিদ্রার পূর্বে আমার মায়ের মালা হাতে নিয়ে কয়েকবার যপ্ করে নিদ্রা যেতাম। আমার মা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতেন, কিরে এই খোকা বয়সেই ধর্ম-কর্ম শুরু করেছিস? এরই মধ্যে আমি ইসলাম সম্পর্কে কয়েকখানা ছোট ছোট বই পেলাম এবং পড়েও ফেললাম। আমার সহপাঠী রেশম খান আমাকে এসব বই এনে দিত। বইগুলো পড়াতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হলো। স্কুলে আসা যাওয়ার পথে মুসলমান ছাত্রদের সাথে আমার ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আলোচনায় সকলেই আশ্চর্যান্বিত হতো।

শবে কদর ঃ

একদিন স্কুল ছুটির পর আমরা বাড়ী ফিরছিলাম। মুসলমান ছাত্ররা বললো- "আজ আমরা রাত জেগে প্রার্থনা করবো। রাতের কোন এক সময় আল্লাহর নূর ভূলোকে এসে সবকিছুকে আলোকিত করবে। তখন যে দোয়াই করা হয় তাই আল্লাহ্ কবুল করেন।"

কৃষ্ণলাল বলেনঃ বাড়ীতে আসতে আসতে আমি মনে মনে সংকল্প করলাম, আজ রাতে আমি শয়ন করব না, ঘুমাবও না। জাগ্রত থেকে এই শবে কদরে ঈমানের জন্য প্রার্থনা করবো, আর আগামী শবে কদরে প্রার্থনা করবো ধন-সম্পদের জন্য।

সন্ধ্যায় আমি মাকে বললাম-"মা আমার একটি আরজি-আজ আমি ঘরের ভিতরে শয়ন করব না, বারান্দায় শয়ন করব। বারান্দায় আমার জন্য একটি বিছানা করে দিন।"

মা কারণ জানতে চাইলেন। বারান্দায় কেন শুতে যাবে? আমি বললাম-"আজ তো শবে কদর! আমি সারা রাত জাগ্রত থাকবো। যখন মহাপ্রভুর আলো প্রকাশিত হতে দেখবো, তখন জীব-জন্তু, গাছ-পালার সাথে আমিও প্রার্থনা করবো।"

ঐ সময় আমাদের গ্রামে এমন কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, কদরের রাতের কোন এক সময় সারা বিশ্বের মহাপ্রভু (আল্লাহ্)-এর জ্যোতির বিকিরণ ঘটে। তখন এই মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি, এমনকি গাছপালাও মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। কেউ কেউ নাকি দেখতেও পায়, আর তখন মানব-দানবের মধ্য হতে যে যে প্রার্থনাই করে, তা অবশ্যই মঞ্জুর করা হয়।

মা বললেন-আরে এতো মুসলমানদের বিষয়। মুসলমানদের শবে কদর! তুমি

জেগে থেকে কি করবে?

আমি বললাম, "মা হোক শবে কদর মুসলমানদের, কিন্তু খোদা তো তাদের ও আমাদের একজনই!" আমার বার বার বলার কারণে অবশেষে মা বারান্দায়ই আমার বিছানা করে দিলেন। মা ও ভাইয়েরা যখন ঘুমিয়ে পড়লো, আমি লেপ জড়িয়ে পশ্চিমমুখী হয়ে মহাপ্রভুর জ্যোতি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

আমার অবোধ মনে এই আবেগ স্থির ছিল, যখনই সেই আলো দেখবো এবং ঘরের আঙ্গিনার গাছগুলো যখনই ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে মহাপ্রভুকে সিজদা করবে, তখনই আমি ঈমানের ভিক্ষা চাইব। তখন তো আর মুসলমান সাথীরা আমাকে একথা বলতে পারবে না যে, তুমি ঈমান হতে বঞ্চিত। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই বরকতময় রাতের দোয়া বিফলে যাবে না। আর আগামী বছর দৌলতের জন্য দোয়া করব। ফলে আমি ঈমানও লাভ করব, দৌলতও পাব। হিন্দুর চেয়েও অগ্রগামী থাকবো, মুসলমানের চেয়েও অগ্রগামী থাকবো।

কোনদিন এভাবে সারা রাত জেগে থাকিনি। ছোটদের জন্য এভাবে সারা রাত জেগে থাকা সম্ভবও নয়। তাই মনে পড়ে, খুব কষ্ট করে মধ্য রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকতে পেরেছিলাম। হঠাৎ কখন যে নিজের অজান্তে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম, একটুও মনে নেই। সম্ভবতঃ বসে বসেই লেপ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নিদ্রা ভঙ্গ হলো তখন, যখন মায়ের কণ্ঠ শুনলাম। মা বলছিলেন-কিরে কৃষ্ণ! মহাপ্রভুর জ্যোতি দেখা হল? ঘুমাবে-ই যদি তা বারান্দায় কেন, ঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমালেই পারতে।

মায়ের কণ্ঠ শুনে আমি হকচকিয়ে উঠলাম। চোখ খুলে দেখি, এদিক-সেদিক সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মা বললেন–এ আলোটাওতো প্রভুরই সৃষ্টি করা আলো।

আমি খুবই লজ্জিত হলাম। মায়ের কথার কোন জবাব দিলাম না। তবে মনে আক্ষেপ আর আফসোসের অন্ত রইল না যে, ঈমানের জন্য প্রার্থনা করার মহা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। এক বছর না গেলে তো শবে কদর আর পাব না। সুতরাং এই বছর ঈমানের দোয়া চাইব, আগামী কদরের রাতে ধন-দৌলতের প্রার্থনা করবো, হিন্দু-মুসলিম সকলের চেয়ে অগ্রগামী থাকবো-এ কল্পনা বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু যদিও আমি আমার কল্পিত জ্যোতি দেখতে পাইনি, কিন্তু তারপরও আল্লাহ তা'আলা আমার আবেগ-অনুভূতির উপর সীমাহীন দয়া ও করুণা করেছেন। আমার ঈমানের আকাংক্ষা পূরণ করেছেন। পরবর্তী কদরের রাত আসার পূর্বেই আমার অন্তর ঈমানের জ্যোতিতে আলোকিত করে দিয়েছেন। আমার অবোধ অনুভূতিতে তখন একথা প্রতীয়মান হলো যে, কেউ যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর দরবারে কিছু চায় তাহলে তাকে তিনি বঞ্চিত করেন না। এ সম্পর্কে নবীজীর বাণীও রয়েছে, আল্লাহ বলেন-"যে ব্যক্তি একান্ত নিষ্ঠার সাথে ও আন্তরিকভাবে আমার নিকট কোন নিবেদন করে, তার সেই নিবেদন ফিরত দিতে আমার লজ্জা বোধ হয়।" যদিও আমি মুখে ঈমানের দোয়া করিনি, কিন্তু আমার অন্তরে তো তার প্রত্যাশা ছিল–আল্লাহ তা'আলা তো সকলের অন্তরের খবর জানেন। তাই তিনি আমার অন্তরের আবেদনকেই প্রার্থনারূপে ধরে নিয়ে আমার জন্য ঈমানের ফয়সালা

করলেন। আল্লাহর এই অনুগ্রহের শুকরিয়া আমি কোনদিনও আদায় করে শেষ করতে পারবো না।

শবে কদরের পর দিন স্কুলে যাওয়ার পথে আমার সহপাঠী রেশম খানকে রাতের সব বৃত্তান্ত শুনালাম। রেশম খান বললোঃ আমাদের স্কুলের কাছে একজন বুযুর্গ আলেম ব্যক্তি থাকেন, তুমি একদিন তার সাথে সাক্ষাত করতে পার। তুমি যদি যেতে আগ্রহী হও তবে আমিই তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। কৃষ্ণ বললোঃ আমার পরিবারের লোকেরা যদি জানতে না পারে তাহলে আমি অবশ্যই তোমার সাথে আলেম সাহেবের নিকট যাব। সেই আলেম সাহেবের নাম ছিল মাওলানা আবদুর রউফ। কয়েকদিন পর সুযোগ মত আমরা তার নিকট গেলাম। রেশম খান আমার পরিচয় দিয়ে বলল, হুজুর! এর নাম কৃষ্ণলাল, আমার সহপাঠী ও প্রতিবেশী। ইসলামী বই-পুস্তক পড়ে কদরের রাতে জাগ্রত থেকেছে।

মাওলানা আবদুর রউফ ধর্ম সম্পর্কে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। আর আমি আমার জানামতে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলাম। মাওলানা সাহেবকে আমি বললাম ঃ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আমি প্রভুর প্রার্থনা করি এবং শোয়ার পূর্বে আট/দশবার মালাও জপি।

মাওলানা সাহেব বললেন-তুমি খুব ভাল ছেলে। তোমার কথা শুনে খুবই খুশী হলাম। তোমার ধর্মীয় অনুরাগ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি তোমাকে একথা বলবো না যে, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। তবে তোমার কল্যাণ কামনা করে একটি কথা বলবো, যদি তা পালন কর আশাকরি উপকৃত হবে। আমি বললাম-বলুন, আমি যথাসম্ভব তা পালন করবো।

মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব বলতে লাগলেন-মুসলমান আর হিন্দুদের খোদা একজনই। মুসলমানরা তাকে আল্লাহ বলে ডাকে, আর তোমরা ভগবান বলে ডাক। উভয়ের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। তিনিই প্রত্যেকের দোয়া-প্রার্থনা, বাসনা-কামনা কবুল করেন, পূরণ করেন। প্রত্যেক প্রাণীর আহারের ব্যবস্থাও তিনিই করেন। তিনি অতীব দয়াময় ও পরম করুণাময়।

মানুষ যদি রাতে নিদ্রার পূর্বে একান্তভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে, একনিষ্ঠভাবে এই বলে দোয়া করে যে, হে আমার প্রতিপালক! আমি অসহায় দৈন্য, বিবেক-বিবেচনায় খুবই দুর্বল, সত্য ও সরল পথ চেনার যোগ্যতা আমার নেই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার জন্য সত্য পথ প্রদর্শন করেন তাহলে আমি তা গ্রহণ করব। আমি নিজেকে আপনার হাওয়ালা করে দিলাম। মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব বললেন-বেটা! যদি তুমি নিয়মিতভাবে তোমার প্রতিপালকের দরবারে এভাবে দোয়া করতে থাক, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমরা অন্তর সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে দিবেন এবং তোমার জন্য সঠিক পথ খুলে দিবেন। তারপর তা গ্রহণ করা তোমার দায়িত্ব হবে। গুরুজনরা আমাদেরকে বলেছেন-মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পন করে দেয়, তখন তিনি আত্মসমর্পণকারীকে বিনষ্ট করেন না। যাচনাকারীকে আল্লাহ বঞ্চিত করেন না। মাওলানা সাহেব বললেন- এ কথার মধ্যে তো কোন ধর্মের উপর আক্রমণ নেই। কোন ধর্মের নামও উল্লেখ করা হয়নি। বেটা এই দোয়া করার পর হিন্দু ধর্মের প্রতিই যদি তোমার মনের আকর্ষণ

বৃদ্ধি পায়, তাহলে তুমি হিন্দু ধর্মেই অটল থাকবে, আর যদি অন্য কোন ধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই ধর্ম কবুল করে নিও। সত্যধর্ম পাওয়ার নিমিত্ত এই দোয়া তোমার জন্য খুবই উত্তম হবে।

এসব কথা ও আলোচনায় মাওলানা সাহেবের ওখানে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। অতঃপর আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম। মাওলানা সাহেব খুবই স্নেহ ও আদর করে বিদায় দিলেন। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে সেদিন বিলম্ব হলো। বাড়ী পৌঁছে দেখি মা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন-আজ এত দেরী করলে কেন? মাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য অন্য কথা বললাম- রাস্তায় স্কুলের কাজই করেছি। মা আশ্বস্ত হলেন, আর কিছু বললেন না।

আমি মনে মনে স্থির করে নিলাম-মাওলানা সাহেব আমাকে যে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, প্রতি রাতে নিদ্রার পূর্বে আমি অবশ্যই সেই দোয়া নিয়মিত ভাবেই করতে থাকবো। তারপর যে ধর্মের প্রতি মনে আকর্ষণ অনুভব করবো সে ধর্মই গ্রহণ করবো। আমার সংকল্প মত প্রতিরাতেই নিদ্রার পূর্বে এ দোয়া করতাম। প্রায় পনের দিন পর্যন্ত এই দোয়া করতে থাকলাম, কিন্তু দোয়ার কোন প্রভাবই অনুভূত হলো না। এটা উনিশ-শ-আটত্রিশ এর ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বার্ষিক পরীক্ষা কাছাকাছি এসে গেছে। পড়াশুনার চাপও তখন খুব বেশী। তবুও স্কুলের কাজ শেষ করে দোয়া করে তারপর নিদ্রা যেতাম। "হে প্রভু! আমার অন্তর্চক্ষু খুলে দিন, আমি যেন সত্য পথ দেখতে পাই।"

'ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে একদিন স্কুলের পড়া শেষ করে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে দোয়া করতে গিয়ে আমি একটু বেশী আবেগ আপ্লুত হয়ে গেলাম। বলতে লাগলাম, হে প্রভু! প্রায় একমাস যাবত দোয়া করছি, কিন্তু আজও দোয়ার কোন প্রভাব অনুভব করতে পারছি না।' ব্যর্থ ও বঞ্চিত হওয়ার একটি গ্লানি মনকে পীড়া দিতে লাগলো। ঐ অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়লাম। সময় তখন আনুমানিক মধ্যরাত হবে- একটি স্বপ্ন দেখলাম। কৃষ্ণলাল বলেন-আমার এক সহপাঠী লালখান। আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তাকে বললাম-চল বন্ধু! আমরা দু'জনে হজ্জ করে আসি। মক্কা মুকাররমা পৌঁছে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো। লালখান আমার সাথে যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেল। অতঃপর আমরা মিয়ানী এলাকা হতে মক্কা-মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। এদিকে আমাদের গ্রামের এক মাইল উত্তরে কয়েকটি ঝর্ণা ও বাগান রয়েছে। আমরা যখন ঐ বাগানগুলো অতিক্রম করে গেলাম, তখন সম্মুখে একজন হিন্দু সাধুকে আমাদের সামনে দিয়ে যেতে দেখলাম। উক্ত সাধু শুধুমাত্র একটি লেংটি পরিহিত, আর তার সারা দেহে ছাই মাখা রয়েছে। আমাদের সন্নিকটে পৌঁছে সাধু খুবই আদর ভরা কণ্ঠে বললো ঃ বৎসরা! কোথায় যাচ্ছ?

লালখান জবাব দিল, আমরা হজ্জ করার জন্য মক্কা মুকাররমায় যাচ্ছি।

সাধু মুচকি হাসি দিয়ে বললো-খুব ভাল কথা, আমারও সেখানে যাওয়ারই ইচ্ছা। একত্রেই যাওয়া যাবে। মক্কা পর্যন্ত আসা যাওয়ার সব পথই আমি চিনি। নিরাপদেই তোমাদেরকে পৌঁছে দিতে পারবো।"

সাধুর কথা শুনে আমরা আশ্বস্ত ও খুশী হলাম যে, একজন পথ জানা সঙ্গী পাওয়া গেল। তিনজনই রওয়ানা করলাম কা'বার উদ্দেশ্যে। আমরা দু'জন সাধুর

পিছনে পিছনে তাকে অনুসরণ করে চলতে লাগলাম।

তিন চার মাইল অগ্রসর হওয়ার পর দেখি আমরা একটি জনমানবহীন ভীতিকর অন্ধকার জঙ্গলে প্রবেশ করছি- কাঁটা বিশিষ্ট জঙ্গল, বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকা কাঁটার কারণে পথ চলা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। বনের মাঝখানে পৌঁছার পর হিংস্র জন্তু দেখা যেতে লাগলো। সিংহ, বাঘ, সাপ ইত্যাদি আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা যেন সেগুলো দেখে ভয়ে একেবারে নীরব-নিথর হয়ে গেলাম। আমাদের পাগুলো অবশ হয়ে আসছিল। সাধু আমাদের অবস্থা দেখে বলতে লাগলো-আমার কাজই হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে এসেছি। এটা মক্কা যাওয়ার পথ নয়। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। সাধু লোকটি এতটুকু বলেই আমাদের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিক-ওদিক তাকালাম, কিন্তু সাধুকে দেখা গেল না। আমরা বন্যজন্তুগুলোর ভয়ে কাঁটাযুক্ত জঙ্গলের ভিতর দিয়েই একদিকে দৌড়াতে লাগলাম। দীর্ঘসময় দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। জঙ্গলের সীমা অতিক্রম করে একটি গ্রাম দেখতে পেলাম। আমরা যখন গ্রামের নিকট পৌঁছলাম তখন সূর্য ডুবে আঁধারের ছায়া নেমে পড়েছে।

আমার এতক্ষণের সফরসঙ্গী তার বাড়ী চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ গ্রামটির বাইরে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আঁধারের গর্ভে সব বিলীন হয়ে গেল। চারদিক ঘন কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম। বাড়ী যাওয়ার জন্য পা তুলতেই কে যেন ছায়ার মত সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ভয়ে সারা দেহ ঘামে ভিজে গেল। আগন্তুকই আমাকে জিজ্ঞাসা করলঃ কে এখানে? ভয়ে ভয়ে জবাব দিলাম ঃ আমি কৃষ্ণলাল! প্রশ্নকারীকে এবার আমি চিনে ফেললাম। সে আমার বন্ধু ও সহপাঠী সাদেক খান। আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। সাদেক খানকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এমন বিদঘুটে অন্ধকারে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা যাচ্ছি–জবাব দিল সাদেক খান। কৃষ্ণলাল বললো-আমারও তো তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অন্ধকারে আমি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সকাল হলে আমি যাত্রা শুরু করবো।

মুহাম্মদ সাদেক আমার পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বললো-আরে ভাই! এখনই চলো! ইসলামের পথে এতটুকু বাধা তো কিছুই নয়! মুহাম্মদ সাদেকের এই উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে আমি তখনই রওয়ানা হতে রাজি হয়ে গেলাম। আমরা অন্ধকারে কয়েকটি কদম এগিয়েছি মাত্র, হঠাৎ দেখলাম পশ্চিমাকাশে একটি বিরাট চাঁদ। পূর্ণিমার চাঁদও সাধারণতঃ এত বড় হয় না। এ যেন এক অস্বাভাবিক ও বিশেষ ধরনের চাঁদ। চাঁদটি রাতের পৃথিবীকে এত আলোকোজ্জল করে দিয়েছিল, যেন মনে হচ্ছিল কোথাও এতটুকু অন্ধকারের চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। চাঁদের প্রখর আলোতে দূর দূরান্ত পর্যন্ত দেখা যেতে লাগলো। এমনি স্মরণীয় আলোতে আমরা আমাদের মক্কার সফর শুরু করলাম।

স্বপ্নে আমি অনুভব করলাম কিছুদূর অতিক্রম করার পর আমরা মক্কা-মুকাররমায় পৌঁছে গেলাম। হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম। খানায়ে কা'বা আমাদের চোখের সামনে ছিল। কি পবিত্র-প্রশান্ত দৃশ্য! কা'বা শরীফের দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক লোকের সামনে নীরবে বসে আছেন। অত্যন্ত

পবিত্র ও পূণ্যময় পরিবেশ। সকলের গায়ে ধবধবে সাদা পোষাক। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বসা রয়েছেন রোক্নে ইয়ামানী আর হাতীমের মধ্যখানে কা'বার দেয়াল ঘেষে। আমি দূর হতে নবীজীকে (সাঃ) দেখেই চিনে ফেললাম। মুহাম্মদ সাদেক আগে, আর আমি তার পিছনে। দু'জন অগ্রসর হচ্ছি নবীজীর (সাঃ) দিকে। মুহাম্মদ সাদেক মুসলমান। তাই সে আগে সাক্ষাৎ করবে। আমি সাক্ষাৎ করবো পরে। আমাদের মাঝে এই পরামর্শ হলো। আমি যে হিন্দু সে কথা আমার মনে রয়েছে, তা সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ এ এক বিরল সৌভাগ্য! সাহাবীদের মাঝখান দিয়ে আমরা দু'জন সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহর প্রিয় রাসূলের (সাঃ) নিকটে গিয়ে মুহাম্মদ সাদেক সালাম দিয়ে তার সাথে মুসাফাহা করলো। নবীজী (সাঃ) বসা অবস্থায়ই সাদেকের সাথে মুসাফাহা করলেন।

তারপর আমি সম্মুখে যেতেই রাহমাতুল লিল আলামীন দাঁড়িয়ে আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি এক অমুসলিম কিশোর। সেই সাথে হীন ও ক্ষুদ্র। আমাকে যখন মানবতার মহান অগ্রদূত বুকে জড়ালেন সৌভাগ্যের আনন্দে আমি আত্মহারা ও মাতোয়ারা হয়ে গেলাম। আমার দেহের কানায় কানায় আনন্দ উপচে পড়তে লাগলো। এত সৌভাগ্য তো আমার পাওনা ছিল না। সায়্যিদুল মুরসালীনের জন্য আমার অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা আমি নিবেদন করলাম। আনন্দের কান্নায় বুক ফেটে যেতে চাইলো।

তারপর নবীজী (সঃ) বসলেন, আমাকেও তাঁর পাশে বসালেন। আদর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

আমি নিবেদন করলাম ঃ মুসলমান হওয়ার জন্য! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ডান হাত তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করে আমাকে কি যেন পড়তে বললেন। আমিও তা পড়লাম। একটু পরেই তিনি বললেন ঃ এখন তুমি মুসলমান!

নবীজীর কথা শুনে আমি খুবই খুশী হলাম, কি সৌভাগ্য! আমি এখন মুসলমান! ঈমানের দৌলত আমি লাভ করেছি? তাও ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে? মক্কা মুকাররমায়? পবিত্র কাবা ঘরের পাশে? এত ভাগ্যবান আমি? কি করে কি কারণে হলাম?

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমি ও আমার সাথী মুহাম্মদ সাদেক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে এলাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন রাত্রের স্বপ্নের দৃশ্যটি যেন আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। আর একটি অজানা আনন্দ আমার মনকে পুলকিত করে রাখলো। স্বপ্নের কথা কাউকে কিছু বললাম না। নাস্তা করে, বই পুস্তক নিয়ে স্কুলে চলে গেলাম।

ছুটির পর রেশম খানকে সাথে নিয়ে মাওলনাা আবদুর রউফ সাহেবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। রাত্রের স্বপ্নের কথা সবিস্তারে মাওলানা সাহেবকে অবহিত করলাম।

আমার স্বপ্নের কথা শুনে মাওলানা সাহেব এতই খুশী হলেন যেন তার মুখমন্ডল আলোকিত দেখা যাচ্ছিল। বললেন ঃ এটা তোমার দু'আর ফল। দেখলে কিভাবে দু'আর সুফল পেলে? একটি উত্তম পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য সত্য

পথ বিকশিত করে দিয়েছেন। এই দু'আ করা বন্ধ করো না। প্রতি রাত্রে নিদ্রার পূর্বে দু'আ করতে থাক। দেখ কি হয়ে উঠে।

মাওলানা সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে বাড়ী পৌঁছে খানা খেয়ে, স্কুলের লেখা পড়া শেষ করে রাত্রে নিদ্রার পূর্বে ঐ দু'আ করে শুয়ে পড়লাম। রাতের শেষ প্রহরে পূনঃ এরূপ স্বপ্ন দেখলাম।

স্বপ্নযোগে নবীজীর (সাঃ) পূণঃ সাক্ষাত লাভ ঃ

'স্কুলে ছুটির ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমরা (মিয়ানী গ্রামের ছাত্ররা) বাড়ীর দিকে রওয়ানা করেছি মাত্র। হঠাত দেখি মিয়ানীর দিক থেকে এক দৈত্যসদৃশ্য ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দৈত্যের মত বিরাটকায় লোকটির পরিধানে একটি লেংটি ব্যতীত আর কিছুই নেই। বলতে গেলে তার সারা দেহই বিবস্ত্র। তার গায়ের রং কাকের মত কালো, মাথায় বড় শিং। লোকটির বাহু চৌদ্দ-পনের ফুট প্রশস্ত হবে। তার দেহের আকৃতি বিশাল। লোকটি আমাদের নিকট পৌঁছলে ছাত্ররা সকলে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। আমি বললাম, বন্ধুরা! এতো দেখছি দাজ্জাল! তাহলে কেয়ামত হয়ে যাবে শীঘ্রই। এই দাজ্জাল কিয়ামতেরই একটি নিদর্শন। দাজ্জাল তোমাদেরকে প্রশ্ন করবে- "তোমরা কার বান্দা"? সবাই জবাব দিবে- "আমরা আল্লাহর বান্দা"। এরই মধ্যে দাজ্জাল আমাদের নিকেটে পৌঁছে গেল। প্রথমে সে আমাদের সহপাঠী গোলাম নবীর প্রতি লক্ষ্য করে বললোঃ বলতো তুমি কার বান্দা?" সে ভয়ে ভয়ে জবাব দিলোঃ "আমি আল্লাহর বান্দা!।"

এ কথা বলার সাথে সাথে দাজ্জাল গোলাম নবীকে থাবা দিয়ে ধরে শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় দিলো, সাথে সাথে তার মৃত্যু হলো। তারপর সে আমাদের অপর হিন্দু সহপাঠী আন্দর সিংকে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলো-"এই বল, তুই কার বান্দা? আন্দর সিং বললোঃ "আমি তোমার বান্দা!" দাজ্জাল খুশী হলো। তাকে কি যেন আহার্য দিল। আমার (কৃষ্ণলাল) যতটুকু মনে পড়ে সহপাঠীদের প্রায় সকলেই দাজ্জালকে মা'বুদ বলে স্বীকার করে তার থেকে নিষ্কৃতি পেল এবং উপহার নিল। সবশেষে দাজ্জাল আমার নিকট এসে আমাকেও সেই একই প্রশ্ন করলো, আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমি আল্লাহর বান্দা।" একথা শুনে সে আমাকে এত জোরে একটি থাপ্পড় মারলো যে, আমি অন্তত দশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লাম।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। দাজ্জাল আমাকে শাসনের সুরে বললোঃ এই এদিকে আয়! আমি অগ্রসর হওয়ার জন্য পা তুললাম। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম সরদারে দোজাঁহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন-আমার কাছে আস! আমি নবীজীর (সাঃ) নিকটে গেলাম। আর ভাবতে লাগলাম, গত রাত্রেও তো আমি নবীজীকে (সাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলাম। তখন তাঁকে দেখেছি কা'বা ঘরের পাশে। আর আজ তার সাক্ষাত পেলাম বুঝালকালা আর মিয়ানীর মাঝখানে স্কুল থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে!

আজ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে খুবই স্পষ্টভাবে দেখার সৌভাগ্য হলো। নবীজী (সাঃ)-এর পরিধানে ছিল ধবধবে সাদা পোষাক। গায়ে একটি সাদা চাদর জড়ানো, মাথায় সাদা পাগড়ী। দাঁড়িগুলো একমুষ্ঠি পরিমাণ হবে। দাঁড়িগুলোর

কয়েকটি মাত্র সাদা, বাকীগুলো কালো। পরিহিত পোষাক খুবই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। নবীজী (সাঃ)- এর হাতে মেটে রং এর একটি তাস্‌বীহ।

তিনি আমাকে তার নিকট যেতে বলার সাথে সাথে আমি তাঁর নিকট চলে গেলাম। তিনি বললেন- আর কেদোঁ না। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তিনি স্বস্নেহে তাঁর হাত আমার পিঠে বুলাতে বুলাতে বললেন- দাজ্জালের কথা কখনও গ্রহণ করবে না।এখন আর সে তোমাকে কোনরূপ কষ্ট দিতে পারবে না। জাগতিক আরাম-আয়েশ ও সুখ ভোগ পরকালের তুলনায় কিছুই নয়। তুমি যদি এসব পরীক্ষায় স্থির ও দৃঢ় থাকতে পার, তাহলে পরকালে অফুরন্ত নেয়ামত পাবে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন-দাজ্জালের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করবে না। আমি তোমার সফলতার জন্য দোয়া করছি। তুমি ইন্‌শাআল্লাহ ব্যর্থ হবে না। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

এটা ছিল নবীজীর (সাঃ)-এর দ্বিতীয় কথা, যা আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছিল। তাঁর এই আদর ও স্নেহভরা কথা ও তাঁর কোমল পরশে আমার আনন্দের সীমা রইল না। আমি অভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলাম, আমার মত অধমের জন্য নবীজী (সাঃ)- এর এত দয়া, এত স্নেহ! এতে আমার মনোবল বহুগুণে বেড়ে গেল।

মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকে। সে ভাল কাজ করছে না খারাপ কাজ করছে, তা তার অজানা থাকে না। আমারও নিজের কর্ম সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ অনুভূতি ছিল এবং এখনও আছে। আমি স্বীকার করছি আমি মহাপাপী। সৎকর্ম থেকে আমি শূন্য! তবে একটি বিষয় ও একটি বিশ্বাস আমাকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছিল। আর সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সঞ্চয়, সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সঞ্চয় ও সম্পদের কারণে আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করতাম। আর তাহলো নবীজী (সাঃ) আমার সফলতার জন্য দোয়া করেছেন, তাঁর দোয়া অত্যন্ত কল্যাণময়।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর এই দোয়ার কল্যাণ আমি সারাজীবনই পেয়েছি। কোন বিষয়ে আমি ব্যর্থ ও বিফল হইনি। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ও যেকোন সংকটে নবীজীর (সাঃ) দোয়া আমাকে অনুপ্রাণিত করতো; উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাতো। মনে প্রশান্তি বিরাজ করতো। কিছুক্ষণ পর নবীজীকে (সাঃ) আর দেখতে পেলাম না। এবার দেখি দাজ্জাল আবার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে ডাকলো–এই ছেলে আমার নিকট আয়! আমি তার নিকট গেলাম। দেখলাম, যে ছেলেরা তাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করেছিল, তারা দিব্বি আয়েশ করছে। ওরা আমাকে বললো ঃ কৃষ্ণলাল! তুমিও দাজ্জালকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নাও। আয়েশে থাকবে। আমি বললামঃ শোন বন্ধুরা! পার্থিব সুখ ভোগ ক্ষণস্থায়ী। আর পরকালের সুখ হচ্ছে চিরস্থায়ী। দাজ্জালের অনুসারীরা পরকালের নাজাত ও আয়েশ থেকে বঞ্চিত হবে।তারা জান্নাতে যেতে পারবে না!

আমার এসব কথা শুনে দাজ্জাল ভীষণ চটে গেল। সে আমাকে থাপ্পড় মারার জন্য হাত তুললো মাত্র, এমনি সময় ভয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

জাগ্রত হওয়ার পরও আমার মনে ভয় ভয় ভাব রয়েই গেল। কিন্তু পূনঃ পূনঃ

একথা স্মরণ করায় যে, এটাতো ছিল স্বপ্ন, তখন ভয় দূর হলো। এরপর শায়িত অবস্থায়ই স্বপ্নের কথাগুলো শুরু হতে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করতে লাগলাম। প্রিয় নবীর (সাঃ) যিয়ারত, তাঁর সান্ত্বনা বাণী ও দোয়া আমার মনে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে লাগলো।

নিদ্রা ত্যাগ করার পর প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম শেষ করে নাস্তা খেয়ে স্কুলে চলে গেলাম। ছুটির পর রেশম খানকে নিয়ে মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেবের নিকট উপস্থিত হলাম। রাত্রের স্বপ্ন তাকে শুনালাম।

মাওলানা সাহেব বললেনঃ দেখ কৃষ্ণলাল, আমার মনে হয় আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করেছেন এবং সরল ও সত্য পথ তিনি তোমার জন্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর সেই সত্য পথ হলো ইসলামের পথ। নবীজীর (সাঃ) সাক্ষাৎ লাভ সর্বোচ্চ সৌভাগ্য। আর তুমি একে একে দু' বার সেই সৌভাগ্য লাভ করেছ। আমি বললাম- হুজুর! আল্লাহর সত্য ধর্ম সম্পর্কে স্বপ্নযোগে আমি যে নির্দেশনা পচ্ছি তাই যথেষ্ট। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের দিকে আমার মনে গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। আমি দু' একদিনের মধ্যে আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাব। মাওলানা সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমরা তার কক্ষ হতে বেরিয়ে বাড়ী চলে এলাম।

পরিবারের লোকদের আমার ইচ্ছা সম্পর্কে অবগতি লাভঃ

দ্বিতীয় দিন স্কুলে যাওয়ার পথে আমি একজন মুসলমান সহপাঠীর সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছার কথা সর্বপ্রথম ব্যক্ত করলাম। সে হিন্দু ছেলেদের নিকট একথা জানিয়ে দিল। মুহূর্তেই সেকথা আমাদের ঘরে পৌঁছে গেল। আমার পিতা তখন তার চাকুরী স্থল কাশ্মীরে ছিলেন। মা আর দাদী আমাকে ভীষণ ভর্ৎসনা শুরু করে দিলেন। আমি এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করলাম।

রাত্রে দাদী গ্রামের নেতৃস্থানীয় হিন্দুদেরকে আমাদের বাড়ীতে ডাকলেন। দাদী তাদের নিকট সবকথা জানিয়ে পরামর্শ চাইলেন। প্রায় সকলেই বললোঃ ওর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিন, মুসলমান ছাত্রদের সাথে দেখা-সাক্ষৎ, মিলা-মিশা, কথা বলা বন্ধ করে দিন। সম্ভব হলে অনতিবিলম্বে ওর পিতার নিকট কাশ্মীরে পাঠিয়ে দিন। তিনি তার তত্ত্বাবধানে রেখেই ওকে পড়াবেন। হিন্দু পন্ডিতরা এবার আমাকে ভর্ৎসনা শুরু করে দিল "তুমি কিরূপ বোকামীতে পড়লে? দেখছো না ইসলাম কেমন ধর্ম, যার অনুসারীরা সর্বদা গরীব আর অনটনে থাকছে। আমাদের থেকে ঋণ না পেলে সময় মত তারা খেতে-পরতে পারে না। দেখ না সমাজ জীবনে আমরা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্ম তাদের ধর্ম হতে ভাল। তোমার এরূপ বয়সে এ মতিভ্রম হলো কেন?"

উপস্থিত হিন্দুদের একেকজন আমাকে একেক কথা বললো। ভর্ৎসনা করলো, কেউ শাসন করলো, কেউ সতর্ক করলো। আমি তাদের সকলের কথাগুলো নীরবে শুনলাম। যখন তাদের সুর নরম হয়ে এলো, তখন আমি বললামঃ হিন্দু ছেলেরা দুষ্টুমি করে আমার সম্পর্কে এই অপবাদের কথা রটিয়েছে।

আমি দেখলাম, পরিস্থিতি অনুকূল নয়। সুতরাং কৌশল গ্রহণ না করলে আমাকে

সব হারাতে হবে। আমি উপস্থিত হিন্দুদেরকে বিশেষভাবে আমার দাদীকে শান্ত করতে চাইলাম। আমার দাদী ছিলেন গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের একজন। সবাই তাকে ভয় করতো, সমীহ করতো। দাদী আমার কথা শুনে তেড়ে উঠলেন। বললেন- যদি এমন কিছু হয় তাহলে তোমাকে আস্ত রাখবো না। দাদীকে শান্ত করলাম। এরপর সবাই আমার কথা শুনে কিছু উপদেশ দিয়ে নিজ নিজ বাড়ী চলে গেল। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে। সকাল বেলা আমি যখন স্কুলে যাব, মা আমার নিকট এসে কেঁদে ফেললেন। বাবা কৃষ্ণ! তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি কত কষ্ট করেছি, তা তুমি জান না। তুমি কিন্তু আমার বহু সাধনার ধন! কোন ভুল করে বসো না! তাহলে সমাজে আমাদের অসম্মানের সীমা থাকবে না। হিন্দুরা সবাই আমাদেরকে ঘৃণা করবে।

মাকে সান্ত্বনা দিলাম। মা আমি কখনও মন্দ কিছু করবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, শান্ত থাকুন। মা নিশ্চিন্ত হলেন, আমি স্কুলে চলে গেলাম।

স্কুল হতে বিকালে আমি মাওলনা আব্দুর রউফ সাহেবের সাথে দেখা করে বললাম- আমি আজ বাড়ী যাব এবং কাল সকালেই আপনার নিকট চলে আসবো। মাওলানা সাহেব বললেন- কাল যখন চলে আসবে তাহলে গিয়ে কি লাভ?

আমি বললাম- মাকে শেষ দেখা দেখে আসি। আর কখনও দেখা হয় কি না কে জানে? মাওলানা সাহেব বললেন- ঠিক আছে যাও। আমি বাড়ী চলে গেলাম। পরদিন ছিল শুক্রবার, ১লা মুহররম ১৩৫৭ হিজরী। এদিন সকালেই ঘুম থেকে উঠলাম। একে একে সকালের কাজ সমাধা করলাম। মন যেন একেবারে অস্থির হয়ে উঠছে। ঝড় বইছে মনে। কাউকে বুঝতে দেইনি আমার মনের অবস্থা। আম্মা নাস্তা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলাম এটাই হয়তো মায়ের হাতের শেষ নাস্তা। জীবনে আর হয়তো মমতাময়ী মায়ের হাতের তৈরী নাস্তা খাওয়া নসীব হবে না। নাস্তা খাওয়ার এক পর্যায়ে একটি অজুহাতে মায়ের পায়ে একটি চুমু খেলাম। ওহ্ সেকি প্রশান্তি! মা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন-কি করছো বাবা! বললাম, মা পেন্সিল পড়ে গিয়েছিল। কুড়াতে নীচু হলাম। তোমার পা সামনে পড়লো। তাই চুমু খেলাম। চুমু খেতে গিয়ে মায়ের পা দু' খানা জড়িয়ে ধরলাম। মনের সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। ক্ষমা চাইলাম মনে মনে। মনের গ্রন্থিগুলো বলতে লাগলো–ওগো প্রাণের মা! সম্ভবত আপনার অভাগা পুত্রের এটাই শেষ দেখা। আপনার পদ চুম্বনের এই সুবর্ণ সুযোগ আগামী জীবনে আর পাব বলে মনে হয় না। আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমি অচিরেই আপনার যে যন্ত্রণার কারণ হব, তার জন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করছি। চোখে অশ্রুর বন্যা বইতে চাচ্ছে! ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে চাচ্ছে। মনের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি, পাছে চোখের পানি মনের গোপন সংকল্পের কথা প্রকাশ না করে দেয়।

বিভিন্ন কৌশলে ছোট তিন ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে নিলাম। নিঃশব্দে তাদেরকে বিদায় জানালাম। প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা চার জন একই মায়ের সন্তান। তোমাদের প্রতি রয়েছে আমার সীমাহীন ভালবাসা। কিন্তু এক মহাসত্যের আকর্ষণে আজ আমি তোমাদের থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছি। হয়তো পৈত্রিক ঘরে তোমাদের সাথে আমার আর একত্রিত হওয়া নসীব হবে না। হয়তোবা এই বিরহ অনন্ত

কালের জন্য হয়ে যেতে পারে। তোমাদের এই বিচ্ছেদ আমার জন্য অসহনীয়। আমাকে হারিয়ে তোমরা কাঁদবে। নিশ্চয়ই কাঁদবে। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও। ওহ্ অধৈর্য! অশ্রু চোখের পাতা ছাপিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। আমার চোখে পানি এসে গেল। মা কিভাবে যেন তা দেখে ফেললেন। সুতরাং বিস্মিত ভঙ্গিতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- একি কৃষ্ণ তুমি কাদঁছো?

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম-মনে হয় রান্না ঘরের ধোঁয়ার কারণে চোখে পানি এসে থাকবে। সরলমনা মা সরল মনে বললেন, হয়তো তা-ই। বিশ্বাস করলেন ছেলের কথা। তাই আর কিছু বললেন না।

বিদায় গ্রহণঃ মায়ের কাছ থেকে স্কুলের বেতন ইত্যাদি নিলাম। স্কুলের ব্যাগ কাঁধে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে ব্যথার ঝড়, মুখ নীরব। উঠানের মাঝখানে এসে গৃহের দিকে বিদায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। মনে মনে বললাম- প্রিয় ঘর! চৌদ্দটি বছর তোমার মধ্যে থেকেছি। তোমর কক্ষ-কক্ষ, অঙ্গন-প্রাঙ্গন আমার কাছে প্রিয়। কিন্তু মহাসত্যের আকর্ষণে আজ তোমাকে আলবিদা' বলতে হচ্ছে। এমনি সমুদ্র সম আবেগ বুকে ধারণ করে স্কুলের পথে অগ্রসর হলাম। মা আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। মায়ের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করার পর আমার ধৈর্যের বাঁধ আর অটুট রইলো না। মনে হলো আমি যেন আবেগ আর অনুভূতির উত্তাল সমুদ্রে একটি ভাসমান খড়। অবারিত ফোটায় অশ্রুপাত হতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে পথ চলতে লাগলাম। অনেক সময় লাগলো গ্রাম পার হয়ে আসতে। মন চাচ্ছিল ফিরে গিয়ে আরেকটি বার মায়ের মুখখানা দেখে আসি। মা ও ভাইদের ভালোবাসা আমাকে টানছিল পিছনের দিকে, আর সত্যের আকর্ষণ আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে। কিন্তু সত্যের আকর্ষণ ছিল প্রবল। তাই পিতা-মাতা ও ভাইদের ভালোবাসার বাঁধনে আমার মনের গ্রন্থিগুলো ছিড়ে যেতে লাগলো। তবুও সত্য আমাকে টেনে নিতে লাগলো সামনের দিকে। একজন মুসলমান মহিলা পথিমধ্যে আমাকে কাঁদতে দেখে বললো-আজ বুঝি তোমার মা তোমাকে মেরেছে, তাই কাঁদছো, না? মুখে তো তার কথার জবাব দিলাম না। মন জবাব দিল, মা নয় মায়ের স্নেহ-ভালবাসা মেরেছে আমায়। রাস্তায় মন ভরে কাঁদলাম। মা-বাবা আর ভাইদের মুখগুলো চোখের সামনে ভাসছিল। একবার দেখি মায়ের চোখে পানি। আরেকবার দেখি ছোট ছোট অবোধ ভাইয়েরা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেলাম। মনে হল মা ও ভাইদের সাথে চির বিরহের রেখা টেনে এলাম। চৌদ্দ বছরের কিশোর। মায়ের কোল ছেড়ে কোথাও যাইনি। মা যে আমাকে কত আদর করতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এমন স্নেহময়ী মাকে ছেড়ে যাওয়া কি সহজ? কিন্তু সত্যের সন্ধান আমার নিকট নিশ্চিত। সত্যের আকর্ষণ প্রবলতর। নবীজী (সাঃ) স্বপ্নে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ছিলেন সেই অনুভূতি আমাকে সবকিছু ত্যাগ করতে সাহসী করে তুললো। আমি চক্ষু বন্ধ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। ভাবলাম, মা ও ভাইদের আকর্ষণ যদি আমাকে পিছনের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে আমি তো মূর্তি পূজার দিকেই ফিরে গেলাম।

হঠাৎ আমার মনে হতে লাগলো নবীজীর (সাঃ) কদম মুবারকে আশ্রয় পাওয়ার জন্য এক মা, তিন ভাই নয়, বরং শত মা, হাজার ভাই উৎসর্গ করা যায়। তখন

আমার মন শান্ত ও স্থির হতে লাগলো। আমি অন্ধকার হতে আলোর দিকে তথা কুফরী হতে ঈমানের দিকে স্থির কদমে অগ্রসর হতে লাগলাম। মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেবের বাড়ী আমাদের স্কুলের অনতি দূরেই ছিল। এদিন স্কুল শেষে আমি মাওলানা সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছলাম।

আমাকে বসতে দিয়ে মাওলানা আব্দুল রউফ সাহেব গ্রামের নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তিকে তাঁর বাড়ীতে ডেকে আনলেন। আমার পরিচয় ও সমস্ত অবস্থা তাদেরকে অবহিত করলেন। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অভিপ্রায়ের কথাও জানালেন এবং কি করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ "আমি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছি কি না" এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। আমি স্থিরভাবে জবাব দিলামঃ "আমি নিজের ইচ্ছায় এই পবিত্র ও সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে চাই।"

কেউ কেউ বললেন- এর বয়স এখনও তেমন হয়নি। সপ্তাহ দশ দিন যাওয়ার পর যখন মা-ভাইদের কথা স্মরণ হবে এবং মনে কষ্ট বোধ করবে তখন হয়তো আবার হিন্দু ধর্মে চলে যাবে। তখনতো এটা আমাদের ও আমাদের ধর্মের মান-সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমি বললাম, জনাব! আমার বয়স কম তা ঠিক, তবে আমার মন স্থির। স্বয়ং নবীজী (সাঃ) আমাকে স্বপ্নে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। পৃথিবীর অনেক কিছুই পরিবর্তন হতে পারে, আমার সংকল্পের পরিবর্তন হবে না। আমি ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম মনে করি, অন্য কোন ধর্ম এখন আর সঠিক ধর্ম নয়।" আমার কথা শুনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেই উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ করে মাওলানা সাহেবকে বললেন- আপনি নির্ভয়ে একে কালিমা পাঠ করিয়ে মুসলমান করে নিন। এ যদি ইসলাম ধর্মে অটল থাকে, তাহলে আমরা যে কোন পরিস্থিতি ও ত্যাগ স্বীকারে পিছপা হবো না। কেউ কেউ এ পরামর্শও দিলেন- "নিকটেই তো পুলিশ চৌকি রয়েছে। সেখানে গিয়ে এ. এস. আইকে বিষয়টি অবহিত করা হোক। তারপর তাকে কালিমা পাঠ করান। পুলিশ চৌকির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ছিল মালিক আমির মুহাম্মদ খান। মাওলানা সাহেব আমাকে সহ পুলিশ চৌকির দিকে রওয়ানা হলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও সাথে গেলেন।

পুলিশের এ, এস, আই আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করে জবাব দিলাম।আমার মনের দৃঢ়তা দেখে তিনি খুবই খুশী হলেন এবং বললেন-ঈমান যাদেরকে আকর্ষণ করে তারা কুফরীতে থাকতে পারে না। মাওলানা সাহেবকে উদ্দেশ্য করে পুলিশ কর্মকর্তা বললেন- আপনি ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন।

মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব আমাকে নিয়ে তার বাড়ী চলে এলেন। দুপুরের দিকে আমাকে নতুনভাবে গোসল করতে বললেন-পাক-পবিত্র পরিধেয় বস্ত্র দিলেন এবং আমি গোসল সেরে দুপুর বারটার সময় মাওলানা সাহেবের সাথে দুপুরের আহার করলাম।

এদিকে আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় প্রচারিত হয়ে গেল। তাই আমি যখন মাওলানা সাহেবের সাথে ইসলামী পোষাক

পরিধান করে জুমার নামাযে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছিলাম তখন মানুষ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগলো। মহিলারা বাড়ীর গেইট ও ঘরের ছাদে উঠে আমাকে দেখতে লাগলো। আমি যখন মাওলানা সাহেবের সাথে মসজিদে প্রবেশ করলাম, সব মুসল্লী আমাদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। জুমার নামাযের পূর্বে মাওলানা সাহেব আমাকে কালিমা তায়্যিবা পাঠ করিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। সমবেত মুসল্লীরা সমস্বরে মারহাবা মারহাবা বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন। মাওলানা সাহেবও বললেন- আমার পক্ষ হতেও তোমাকে মুবারকবাদ। মুসল্লীরা সকলে বলে উঠলেন-মুবারক!মুবারক!!

মাওলানা সাহেব মিম্বরে আরোহন করে। সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বয়ান শুরু করলেন। বললেন- ইসলামের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহর স্বত্ত্বা এক, একক ও অদ্বিতীয়। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক তিনি। তিনি পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি অদৃশ্যেরও মালিক। পৃথিবীর সবকিছুর উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশক্তিমান, পরমদাতা, দয়ালু ও করুণাময়। হায়াত-মউত তাঁরই অধিকারভূক্ত। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যই তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা অবধারিত ও অপরিহার্য করেছেন। ইচ্ছা হলে কোন মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর ইচ্ছা না হলে করবে না এরূপ স্বাধীনতা বা অধিকার কোন মানুষকেই তিনি দান করেননি, বরং সর্বকালের সকল মানুষের জন্যই তিনি তাঁর ইবাদত করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। আর মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহর একত্ববাদ ও ইবাদতের উপর নির্ভরশীল করেছেন।হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রাসূল হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।আমরা তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহর হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম, কল্যাণ-অকল্যাণ, ছাওয়াব-গুনাহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছি। প্রত্যেক মানুষের উচিৎ আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত কবুল করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করা।

আমার জীবনের প্রথম নামায আদায়ঃ

মাওলানা সাহেব কিছুক্ষণ খুবই আবেগময় ওয়াজ করলেন। মুসল্লীবৃন্দ মনোযোগ সহকারে তা শুনলেন। তারপর জুমার ২য় আযান হলো। মাওলানা সাহেব খুৎবা দিয়ে নামায আদায় করালেন। নামায শুরুর পূর্বে তিনি আমাকে বললেন- তুমিও আমাদের সাথে অনুরূপ রুকু-সিজদা করে নামায আদায় কর। পরম ভক্তি ও মনোযোগ সহকারে আমিও কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাওলানা সাহেবের উপদেশ মত নামায আদায় করলাম। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম নামায আদায়। আর তা ছিল সুরা-কিরাত ও তাসবীহ তাকবীর পাঠ বিহীন।

জুমার নামায আদায় শেষ হওয়ার পর আগত মুসল্লীবৃন্দ আমাকে মুবারকবাদ দিতে লাগলেন। সবাই আমার সাথে কোলাকোলি করতে থাকলেন। তাদের ব্যবহারে আমি অভিভূত হলাম। আমার প্রাণে নতুন অনুভূতি। প্রায় দেড় ঘন্টা পর্যন্ত মুসল্লীবৃন্দ আমার সাথে সালাম ও মু'আনাকা করলেন। তারপর আমি মাওলানা সাহেবের সাথে

তাঁর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম। সাথে অনেক লোক ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বড় একটি মিছিল। ইশা পর্যন্ত লোকজন আসতে থাকলো এবং আমার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে থাকলো। সকলেই আমাকে বললো- আজ হতে আমরা তোমার ভাই। আমি খুবই প্রীত হলাম। ইশার নামাযের পর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মাওলানা সাহেব পুনরায় পরামর্শের জন্য দাওয়াত দিলেন।

মাওলানা সাহেব এ সময় আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ডেকে আনার জন্য একজন লোক পাঠালেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের নাম ছিল মালিক মুহাম্মদ তুফাইল (বি.এ.বি.টি.এল.এল.বি)। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। আইনের খুঁটি-নাটি খুব ভাল জানতেন। কিছুক্ষণ পর বেশ কয়েকজন লোকসহ প্রধান শিক্ষক মহোদয় এলেন। প্রধান শিক্ষক মহোদয় আমার সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বুক মিলালেন, মুবারকবাদ দিলেন, আদর-স্নেহ করলেন।

প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে মাওলানা সাহেব স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আমার সম্পর্কে করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হলো বিলম্ব না করে আগামীকাল এস.ডি ও অফিস খোলার সাথে সাথে আবেদন করে এফিডেভিড করে নিতে হবে। এস.ডি ও আদালত হলো পেন্ডুদাদন খান। আমাদের অবস্থানের জায়গা থেকে বেশ দূরত্বে অবস্থিত। তাই ভোরের গাড়ীতেই পেন্ডুদাদন খান যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল।

পরামর্শে স্থির হলো আমাকে নিয়ে স্বয়ং মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব যাবেন। সাথে বিজ্ঞ ও সাহসী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আহমাদ খানও যাবেন। রাত্রেই আমরা মাওলানা সাহেবের বাড়ী হতে ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা করলাম। সেখান থেকে রেলষ্টেশন প্রায় আট-দশ মাইল দূর হবে। তাই রাতে ঘুমানো সম্ভব হলো না। মনের ক্লান্তি, দেহের ক্লান্তি আর বিনিদ্রার কারণে দেহে হালকা জ্বর বইতে লাগলো। মাওলানা সাহেব ও আহমাদ খান সাহেব আমাকে বার বার সাহস ও সান্ত্বনা দিতে থাকলেন, আদর করতে লাগলেন। ক্ষুধা পেয়েছে কিনা, কিছু খাব কিনা, বার বার জানতে চাইলেন।

সকালের নির্দিষ্ট ট্রেনেই আমরা পেন্ডুদাদন খান পৌঁছলাম। এস.ডি.ওর আদালতে আবেদন পেশ করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা হলো। উকিল আমার পক্ষে আবেদন লিখলেন। আমি সজ্ঞান ও বালিগ। আমি নিজ ইচ্ছায় ও আগ্রহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ আমাকে চাপ দেয়নি, লোভ-লালসা দেখায়নি অর্থাৎ আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কারো কোন হাত নেই। আমি নিজেই স্বেচ্ছায় এই ধর্ম গ্রহণ করছি। মহামান্য আদালতকে সেকথা আমি সবিনয়ে অবহিত করলাম। আমার নাম আমি নিজেই "গাজী আহমাদ" নির্বাচন করলাম।

আদালতে আবেদন পেশ করার এক ঘন্টার মধ্যেই আমাকে ডাকা হলো।মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব ও আমার উকিল সাহেব আমার সাথে ছিলেন।এস.ডি. ও সাহেব আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।আমি আবেদনে উল্লেখিত কথাগুলোই জবাবে বললাম। এস.ডি.ও সাহেব আমাকে কালিমা শরীফ

পাঠ করে শুনাতে বললেন। আমি কালিমা শুনালাম। এবার এস,ডি,ও সাহেব মুচকি হাসি দিয়ে বললেন- Well , Well, very good. অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমার দরখাস্তে মন্তব্য লিখে দস্তখত করে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কাগজের নকল মাওলানা সাহেব তুলে নিলেন। আমার কাজ খুবই সহজে ও অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হল। বিকালের ট্রেনে আমরা ফিরে এলাম। রাত্রে ষ্টেশনেই রইলাম এবং সকালে বুঝালকালা ফিরে এলাম।

আমার নাম রাখা সম্পর্কে মা বলেছিলেন- আমরা তোমার নাম প্রথমে তারা চাঁদ রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একজন হিন্দু পন্ডিতের নির্বাচন অনুসারে কৃষ্ণলাল রাখা হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আমার এই নামই ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর যখন নাম পরিবর্তনের প্রসঙ্গ এলো তখন মাওলানা সাহেব আমার নাম শফিকুর রহমান রাখতে চাইলেন। কিন্তু গাজী আহমাদ নামটি আমার পসন্দনীয় ছিল। তাই আমি মাওলানা সাহেবকে আমার নাম গাজী আহমাদ রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করে আমার নাম গাজী আহমাদ রাখলেন।

আমার বাড়ীর অবস্থা ঃ

আমার ইসলাম গ্রহণের দিন দুপুর বারটার সময়ই আমাদের বাড়ীতে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। মাতম শুরু হয়েছিল সংবাদ পৌঁছার সাথে সাথেই। আমার মা-ই সবচেয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।সব আত্মীয়-স্বজন ছুটে এলো আমাদের বাড়ীতে। শোক আর ক্ষোভ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আমাদের বাড়ী।আমার পিতাকে টেলিগ্রাম করে দেয়া হলো।পিতার টেলিগ্রামে কিছু অসত্য কথা বলা হলো "কৃষ্ণলালকে বুঝালকালার মুসলমানরা জবরদস্তি করে মুসলমান বানিয়ে নিয়েছে এবং এখন সে তাদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে।"

এলাকার হিন্দুরা আমাদের বাড়ীতে এসে আক্ষেপ আর ক্ষোভ প্রকাশ করে সকলেই আমার দাদীকে মাম'লা দায়ের করতে বললো। দাদী আমার পিতার বাড়ী আসা পর্যন্ত সকল পদক্ষেপ স্থগিত করে রাখলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমি অস্থায়ীভাবে মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেবের বাসায়ই তার তত্ত্বাবধানে ছিলাম।ইসলাম গ্রহণের পাঁচ দিন পর সাইকেল চালিয়ে আমি সুবেদার খান যামান সাহেবের পুকুরে গোসল করতে গেলাম। পুকুর ছিল বুঝালকালা আর মিয়ানীর মাঝামাঝি। অর্থাৎ আমাদের বাড়ীর নিকটে। আমি সুবেদার সাহেবের পুকুরে গোসল করতে গিয়েছি, এদিকে কে যেন আমার মাকে এ সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে। সাথে সাথে তিনি আমার খালাকে সাথে নিয়ে পুকুর পাড়ে ছুটে এলেন। আমি গোসল সেরে কাপড় পরিবর্তন করে দাঁড়িয়েছি মাত্র, এমন সময় ঝড়ের বেগে আমার মা এসে আমাকে ঝাপটে ধরে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন। ওহ্! সেকি কান্না! মনে হচ্ছিল মায়ের অন্তরের সমস্ত দরদ বেরিয়ে আসছে তার কান্নার স্বরে। আমার মায়ের কান্নায় পুকুর পাড়ের সকলের চোখেই পানি এল। মা অধীর হয়ে বলতে লাগলেন-বাবা! তুমি তো আমাদেরকে সমাজে হেয় ও হীন করে ছাড়লে। গোত্রের মান-সম্মান আর কি রইল? মুসলমান হয়ে তুমি কি পেলে? তোমার ভাইয়েরা রাত-দিন তোমার জন্য কাঁদছে। তাদের জন্যও দারুণ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। মা আমার হাত ধরে টানতে লাগলেন।

বললেন-আমার সাথে বাড়ী চল। এখনও সময় আছে অল্প প্রায়শ্চিত্তেই হয়ে যাবে। মায়ের সব কথা আমি নীরবে মনোযোগ সহকারে আদবের সাথে শুনলাম।মাকে তার আবেগ-অধীরতা প্রকাশ করতে একটুও বাঁধা দিলাম না। তারপর বিনয়ের সাথে বললাম-"মা আমিতো এখনও আপনার পুত্র। ধর্ম পরিবর্তন করা দ্বারা মাতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইসলাম ধর্মতো পিতা-মাতার অধিকার আদায় করার জোর তাকিদ করেছে। আমি তো সব সময়ই আপনার খেদমত করবো।"

মা আবার তাকিদ করে বললেন-তুমি এখন আমার সাথে বাড়ী চল। আমি তোমাকে রেখে বাড়ী যাব না।

আমি খুবই বিনয়ের সাথে বললাম-"মা আমি কয়েকদিন পর নিজেই আসবো। আপনার অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। সময়মত আমি নিজেই উপস্থিত হব।" মা জানালেন-আমাদের একজন আত্মীয় কর্ণেল নানক চন্দ্র ও আমার খালু দয়াল চন্দ্র এখন আমাদের বাড়ীতে রয়েছেন। দু'একদিনের মধ্যে তোমার পিতাও এসে পৌঁছবেন।

আমার কথা শুনে মা তো চলে গেলেন, তবে যেতে যেতে বুক ফাঁটিয়ে চিৎকার করতে থাকলেন। মায়ের চলে যাওয়ার পর আমি বুঝালকালার দিকে রওয়ানা হলাম। মায়ের সামনে তো আমি নিজেকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম, কিন্তু মায়ের চলে যাওয়ার পর পথিমধ্যে আমার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা আর সম্ভব হয়ে উঠলো না। মায়ের মহব্বত, মায়ের আকর্ষণ আমাকে অস্থির করে তুললো। অন্তর ফেটে কান্না এল। মায়ের কাছে থাকার চেয়ে মা হতে বিচ্ছেদ হওয়ার পর মায়ের প্রতি মনের আকর্ষণ বহুগুণ বেশী অনুভূত হতে লাগলো। কান্না যেন বিরাম নিতে চায় না। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

আমি মনের স্থিরতা ও ইসলামের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতে লাগলাম। আর এরূপ দোয়া করতে করতে 'বুঝালকালা' চলে এলাম। অনুভব করতে লাগলাম এখন মন স্থির ও শান্ত হয়েছে। মায়ের প্রতি অন্তরে আকর্ষণ আর শ্রদ্ধা-ভালবাসা বিদ্যমান আছে এবং তা থাকবেও; কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তৌফিক দানের মাধ্যমে আল্লাহর যে অসীম দয়া ও অনুগ্রহ আমি লাভ করেছি-আমার মনের দেয়ালে সে কথা স্পষ্টভাবে শিলালিপি হয়ে গিয়েছে।

মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব বললেন ঃ গাজী আহমাদ তোমার পড়াশুনা কোনভাবেই বন্ধ থাকতে পারে না। বর্তমানে আগের চেয়ে বেশী উদ্যমী ও মনোযোগী হয়ে তোমার লেখাপড়া করতে হবে। আমি চাই তোমার উচ্চ শিক্ষা। এরপর থেকে আমি স্কুলে যেতে শুরু করলাম। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সকলে মুসলমান ছিলেন। তারা ও মুসলমান ছাত্ররা আমার সাথে খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতে লাগলেন। তবে হিন্দু ছাত্ররা আমাকে এড়িয়ে চলতে থাকল। মুসলমান ছাত্ররা পৃথক পৃথক ভাবে আমার সাথে হাত মিলিয়েছে, একাত্মতা প্রকাশ করেছে। প্রধান শিক্ষক সাহেবকে সর্বাধিক অনুরাগী মনে হল। অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও সকল ছাত্রদের এই সৌহার্দ্য দেখে আমি খুবই মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হলাম।

বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাশাপাশি দ্বীনীয়াত শিক্ষাও আমি বিশেষভাবে গ্রহণ

করতে লাগলাম। তিন-চার দিনের মধ্যে নামায আদায় পদ্ধতিসহ সূরাহ, তাসবীহ ইত্যাদি পাঠ শিখে নিলাম। খুব মনোযোগ সহকারে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করতাম। নামায আদায় করতে আমার খুব ভাল লাগত। এতে মনে দারুণ শান্তি ও তৃপ্তি পেতাম। সপ্তাহ দশ দিন এমনি নীরব-ঝামেলা মুক্ত অবস্থায় কেটে গেল। এ সময়ে তেমন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটল না।

আমার এক খালু দয়াল চন্দ্র সিং রাওয়াল পিন্ডিতে উচ্চ সরকারী আমলা পদে চাকুরী করতেন। আম্মা সেদিন পুকুর ঘাটে বলে গিয়েছিলেন তিনি নাকি ইতিমধ্যেই আমাদের বাড়ী এসেছেন। উনিশে মার্চ অর্থাৎ আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তের দিন পর তিনি ও আমার দাদী দু'জন 'কুলার কাহার' পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে আঞ্চলিক পরিদর্শকের কাছে এই বলে অভিযোগ দায়ের করলেন যে, আমাদের এক ছেলেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মুসলমান বানিয়ে নিয়েছে এবং এখনো আমাদের ছেলে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। সে এখনও বালেগ হয়নি। আপনি বুঝালকালায় আগমন করে তাকে উদ্ধার করে দিন। কারণ, ছেলের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা উদ্বিগ্ন!

পুলিশ কর্মকর্তা আমার আত্মীয়দেরকে বললেন, বেলা তিন ঘটিকার সময় আপনারা বুঝালকালার পুলিশ চৌকিতে থাকবেন, আমি প্রয়োজনীয় ফোর্স নিয়ে আসব।

উনিশে মার্চ আমরা যোহরের নামায আদায় করছিলাম, মসজিদেই একজন পুলিশ এসে বলে গেলেন মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেবকে ও গাজী আহমাদকে পুলিশ চৌকিতে তলব করা হয়েছে। নামায আদায় শেষে মাওলানা সাহেব আমাকেসহ পুলিশ চৌকিতে রওয়ানা করলেন। সাথে সব মুসল্লীরাও ছিলেন। পুলিশ চৌকিতে পৌঁছে দেখি আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন সেখানে উপস্থিত। আমার পিতা আসেননি; সম্ভবতঃ তিনি বাড়ীতে পৌঁছেননি।

মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেবকে বসতে দেয়া হল। আমিও তাঁর পাশে বসলাম। সাথে আসা মুসলমানরা এদিক-সেদিক দাঁড়িয়ে রইলেন। দাদীও এসেছিলেন, তার দিকে তাকাতেই তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তিনি তার জায়গা ছেড়ে আমার কাছে এলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন–"নির্লজ্জ! এটা তুমি কি করলে? নিজের পূত-পবিত্র ধর্ম হতে ভ্রষ্ট হলে? অনুশোচনা কর। এখন আমার সাথে বাড়ী চল। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। ভয়ের কিছু নেই। এস,আই সাহেব নিরাপদে তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিবেন। তোমাকে যে ব্যক্তি ভয়-ভীতি দেখিয়েছে, জোর-জবরদস্তি করেছে, তার নাম এস,আই সাহেবকে বল।" এরপর পুলিশের এস,আই সাহেব আমাকে বললেন–তুমি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে? "জনাব! আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে ইসলামই সত্য ধর্ম, কাজেই আমি সত্য ধর্ম গ্রহণ করেছি।" আমি তার জিজ্ঞাসার জবাবে একথা বললাম।

এস,আই ঃ "তোমাকে কে এই ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে?

গাজী আহমাদ ঃ জনাব কোন ব্যক্তি আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়নি। ইসলামই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। ধর্মের কারণেই মানুষ পরকালে মুক্তি পাবে। তাই আমার মুক্তি ও নাজাতের জন্যই আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। এটা আমার

একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়।

এস,আই ঃ "পিতা-মাতাকে ছেড়ে যাওয়ার হেতু কি"?

গাজী আহমাদ ঃ "মুহতারাম! আমি কয়েকটি ইসলামী পুস্তক পড়ে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করি। এরপর আরও জানতে আগ্রহী হই এবং আরো কিছু বই-পুস্তক পড়ি। ইসলামের আচার-আচরণ, বিধি-বিধান সম্পর্কে বিবেচনা করতে থাকি। এতে আমি জানতে পেরেছি ইসলাম আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা দেয়, অন্যধর্মে একত্ববাদের শিক্ষা নেই। ইসলাম পরিপূর্ণ মানবতার অপর নাম। ইসলামের ইবাদত পদ্ধতি, আচার-আচরণ ও ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ্য আমার মনকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছে। এই ধর্মে এমন এক আকর্ষণ রয়েছে, যা সত্য সন্ধানী ও পরিণামদর্শী বিবেকবান মানুষ গ্রহণ না করে পারে না।

এস, আই ঃ "তোমার আত্মীয়রা বলেছেন– তুমি এখনো বালেগ হওনি, তাই তোমার বিবেচনা দ্বারা এতবড় সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্য তুমি এখনও হওনি। কাজেই তাদের বক্তব্য হলো, তোমাকে অবশ্যই কেউ উস্কানি দিয়েছে বা লোভ-লালসা দেখিয়েছে।

গাজী আহমাদ ঃ জনাব! আমি বারবার বলছি, আমি স্বেচ্ছায়ই ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের আকর্ষণে এ ধর্ম গ্রহণ করেছি। কেউ আমাকে কোনপ্রকার প্ররোচনা দেয়নি। আমার আত্মীয়রা যেহেতু ইসলামের মাহাত্ম্য, কল্যাণ ও পরিচয় জানেন না, তাই তারা এরূপ অভিযোগ করেছেন।

এস, আই সাহেব এবার আমার খালুকে উদ্দেশ্য করে বললেন–বলুন, এখন আমি কি করতে পারি? আপনাদের ছেলের বক্তব্য আপনাদের আবেদনের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি তো এর বক্তব্যের বিপরীতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না। আপনারা এর সব কথা তো নিজেরাই শুনলেন।

এরই মধ্যে মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব পেন্ডু দাদন খান ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের এফিডেবিড ও আনুসঙ্গিক কাগজপত্র এস,আই সাহেবের সামনে এগিয়ে দিলেন। এস,আই সাহেব আদালতের অনুমতিপত্র উচ্চস্বরে পাঠ করলেন–যা আমার আত্মীয়রাও শুনলো। এস,আই সাহেব বললেন–এ অবস্থায় আমি আপনাদের কোন সাহায্য করতে পারছি না। আমার খালু দয়াল চন্দ্র এস,আই সাহেবকে বললেন–আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এর সাথে বাইরে একান্তে একটু কথা বলতে চাই।

এস,আই সাহেব বললেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুশী মনেই আপনি তা করতে পারেন। খালু আমাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন, বলতে লাগলেন ঃ প্রিয় কৃষ্ণ লাল! তুমি তো জান আমি রাওয়াল পিন্ডিতে উঁচু পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। পুলিশ আমার ইচ্ছার পরিপন্থী কাজ করতে পারবে না। তোমার কোনপ্রকার ভয় করার কিছু নেই। তোমাকে আমি রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাব। সেখানেই ভাল একটি স্কুলে তোমাকে ভর্তি করে দেয়া হবে। স্কুলে যাতায়াত ও অবসরে বেড়াবার জন্য একটি সুন্দর প্রাইভেট কার কিনে দেয়া হবে। অনেক বড় ধনী-পরিবারে তোমার বিবাহের কথা পূর্ব হতেই স্থির করে রাখা হয়েছে। ভগবানের দোহাই, তুমি আমার কথা শোন, মান্য কর। এখন এস,আই সাহেবের নিকট বল যে, আমি আমার খালুর সাথে চলে যেতে চাই। খালু মশায় আমাকে অধীর হয়ে বুঝাতে লাগলেন। আমি

নীরবে খালুর কথা শুনছিলাম। আমার নীরবতাকে সম্ভবতঃ তিনি সম্মতি ধরে নিচ্ছিলেন। বললেন ঃ চল! ভিতরে চল, এস,আই সাহেবের সামনে শুধু বলে দাও–"আমি আমার খালুর সাথে চলে যেতে রাজী আছি।" আমি খালুকে বললাম–খালু ভুল বুঝবার অবকাশ নেই। আমি আপনার প্রত্যেকটি কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি, আপনার মনোভাব ও আবেগ উপলব্ধি করেছি। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো–মানুষকে মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে যে মহান দায়িত্ব পালন করতে সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন, তাহলো আল্লাহর তাওহীদের উপর ঈমান আনা ও তাঁর সঠিক ইবাদত-বন্দেগী করা। আপনারা সে বিষয়ে সঠিক পথ পাননি, আর আমি নিশ্চিত ভাবে পেয়েছি। তাই আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের সুখ-ভোগের কোন মূল্য নেই। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমি যে মহা সত্যের সন্ধান লাভ করেছি, তা হতে আমি কোন কিছুর বিনিময়েই ফিরে যাব না। এ ব্যাপারে আপনাদের কোন দ্বিধা থাকা উচিৎ নয়।"

আমার জবাব শুনে খালুর মুখ মলিন হয়ে গেল। তিনি নীরব হয়ে গেলেন, কোন কথা বাড়ালেন না। আমাকে নিয়ে তিনি পুলিশ কর্মকর্তার নিকট ফিরে এলেন।

আমার আত্মীয়রা উৎসাহের সাথে অপেক্ষা করছিল, আর মুসলমানরা ছিল দারুণ উৎকণ্ঠিত। খালু এস,আই সাহেবের সম্মুখে বললেন-একে আমি বুঝাতে বিফল হয়েছি। ইসলাম ধর্মের উপরই সে অটল থাকবে বলে মনে হয়।

খালুর কথা শুনে দাদী চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, কৃষ্ণ! আমাদের প্রতি দয়া কর! তোমার মা ও তোমার ভাইয়েরা সারা দিন কেঁদে কেঁদে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তোমাকে না পেলে তারা হয়তো মরেই যাবে। বাড়ীতে রান্না নেই, খাওয়া নেই, হাসি নেই, আনন্দ নেই। সব তোমার কারণে শেষ হয়েছে। ঠিক আছে, তুমি যদি মুসলমানই থাকতে চাও থাক, বাড়ীতে নিজের ভাইদের সাথে থাক। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। দু'চার দিনের মধ্যে হয়তো তোমার পিতা বাড়ী এসে পৌঁছবে, তোমাকে বাড়ী না পেলে তার অবস্থা কি হবে তুমি ভেবে দেখেছ? দাদীর এমনি বিলাপ আর কান্না শুনে উপস্থিত সকলেই প্রভাবান্বিত হল, এমনকি মুসলমানদের অন্তর পর্যন্ত গলে গেল। এস,আই সাহেব চোখ মুছলেন। মা আর ভাইদের জন্য আমার মনেও অস্থিরতা কম ছিল না। কিন্তু আমি তা প্রকাশ হতে দেইনি। কারণ, তাতে আমার বিচ্যুতির আশংকা ছিল প্রবল।

দাদীকে সান্তনা দিয়ে বললাম–দাদী সবকিছুই আমি বুঝি। আমি মা ও ভাইদের ত্যাগ করব না। আপনি আজ বাড়ী যান। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই একবার বাড়ী গিয়ে সকলের সাথে দেখা করে আসবো। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। মা এবং ভাইদেরকে শান্ত হতে বলুন। বাস্তবতা ও সত্যকে সবকিছুর উপর স্থান দিতে পারলে, সত্যকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারলে কষ্টও কম হবে, জীবনও সমৃদ্ধ হবে।

এস,আই সাহেব আমার আত্মীয়দেরকে বললেন–এ অবস্থায় আমি আপনাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারছি না। যদি আপনারা আরো কিছু করতে চান তাহলে ভুন আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করুন। সেখানে জয় সিং সাহেব অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট।

তিনি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি হয়তো আপনাদের জন্য কিছু করতে পারেন। আমি মনে করেছিলাম বিষয়টি বোধ হয় এখানেই শেষ হবে। আমার আত্মীয়রা হয়তো আর এগুবে না। কিন্তু বিধি বাম! খালু এস,আই সাহেবকে নতুন প্রস্তাব দিলেন–ঠিক আছে বাচ্চা আপনার হেফাজতে থাকুক। কাল সকালে আপনি একে ভুন আদালতে নিয়ে আসুন। আমরা সেখানে সময়মত পৌঁছবো এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুই করব।

খালুর কথায় আমি আঁতকে উঠলাম। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম। আল্লাহ ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। ঈমানের উপর অটল রাখুন। এস,আই সাহেব আমাকে হুকুম করলেন, আজ রাত তোমাকে এ পুলিশ চৌকিতে থাকতে হবে এবং কাল আমার সাথে ভুন যেতে হবে।

বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে কয়েকজন বললেন–আমাদের সাথে ওকে দিয়ে দিন। সকালে আমরা আমাদের দায়িত্বেই তাকে আপনার নিকট পৌঁছে দিব। কিন্তু এস,আই সাহেব রাজী হলেন না। তাই মুসলমানরা আমার খাবার, বিছানাপত্র চৌকিতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমি পুলিশ হেফাজতেই রাত অতিবাহিত করলাম। মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব পুলিশ চৌকি হতে বাসায় গিয়ে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করলেন। মাওলানা সাহেব বললেন–ভুন এলাকা হিন্দু ও শিখ অধ্যুষিত। উপরন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মুসলমান নয়, শিখ ধর্মাবলম্বী। গাজী আহমাদের কোন সমস্যা হতে পারে অথবা একাকী পেয়ে তার আত্মীয়রা তাকে ফুসলিয়ে বা চাপ দিয়ে তাদের সাথে নিয়ে যেতে পারে। তাই তার হিম্মত ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য আমাদের কিছু লোকের ভুন যাওয়া উচিৎ। এ কথায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক ভুন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং মধ্য রাতেই তারা পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন যাতায়াত ব্যবস্থা খুব একটা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। সল্ট বেন্জ ট্রান্সপোর্ট কোং এর একটি বাস প্রতিদিন মিয়ানী হতে চাকওয়াল পর্যন্ত যাতায়াত করত। সকালে যেত বিকালে ফিরে আসত। পথেই ছিল ভুন ষ্টেশন।

সকাল বেলা মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব, সুফী জান মুহাম্মদ সাহেব আর আমি পুলিশ প্রহরায় বুঝালকালার বাস ষ্টেশনে এসে বাসে উঠলাম এবং নয়টায় ভুন ষ্টেশনে পৌঁছলাম। আমরা বাস থেকে নেমে দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক লাঠি আর তরবারী হাতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এস,আই সাহেব নিকটে এসে দেখলেন, তারা বুঝালকালার লোক। তিনি মাওলানা সাহেবকে বললেন–এরা এখানে এই তরবারী নিয়ে কেন দাঁড়িয়ে আছে? নিশ্চয় এদেরকে আপনি এখানে আসতে বলেছেন। মাওলানা সাহেবকে লক্ষ্য করে এস,আই সাহেব আরো বললেন–যদি এখানে কোন অঘটন ঘটে বা দাঙ্গা হয় তাহলে এসব দায়-দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে। মাওলানা সাহেব বললেন-আমি এদেরকে আসতে বাধ্য করিনি। এরা নিজেদের সুধারণাবশতঃ স্বেচ্ছায়ই এসেছে।

গাজী আহমাদ বলেন–আমরা বাস থেকে নেমে আদালতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমার দাদী, খালুসহ আরও কয়েকজন আত্মীয় একই বাসে ভুন এসেছেন। আমি বাসে এস,আই সাহেবের সাথে সামনের ছিটে বসেছিলাম, আর তারা বসে

ছিলেন পিছনের ছিটে। তাই বাসের মধ্যে তাদের সাথে কোন কথা হয়নি।

ভুনের আদালত ঃ

আদালতে পৌছার পর আমাদেরকে বেশীক্ষণ বিলম্ব করতে হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়। লোকজন কিভাবে যে সংবাদ পেয়েছে, জানি না। আমাদের সেখানে পৌছার পর অল্প সময়ের মধ্যেই এলাকার অনেক হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের লোক আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হল। তাদের মধ্যে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট জয় সিং সাহেবের অনেক আত্মীয়-স্বজনও ছিল। মুসলমানও এসেছিলেন অনেক। আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট জয় সিং সাহেব আদালতে এসে এরূপ জনাকীর্ণ অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন বিচার কক্ষের নিকট না আসে। আমার আত্মীয়রা পূর্বেই আরজি পেশ করে দিয়েছিলেন। তাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে উপস্থিত করার জন্য এস,আইকে হুকুম দিলেন। অতএব, আমাকে উপস্থিত করা হল। আদালত কক্ষের অভ্যন্তরে হিন্দু ও শিখদেরকে দেখতে পেলাম। তারা আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

জয় সিং সাহেব আমাকে বললেন, বেটা! আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব, তুমি তার সত্য সত্য উত্তর দিবে। এখানে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

ম্যাজিষ্ট্রেট ঃ প্রথমে বল, এত ছোট বয়সে পিতামাতার ধর্ম তুমি কেন ত্যাগ করলে?

গাজী আহমাদ ঃ জনাব, আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্মই আমার কাছে সঠিক ও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে, তাই আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট ঃ কি কারণে তোমার নিকট ইসলাম ধর্ম সঠিক বলে প্রতীয়মান হল?

গাজী আহমাদ ঃ ধর্মের মূল কথা হল আল্লাহর একত্ববাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, আর কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যেই উক্ত বিশ্বাস সংরক্ষণ করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মে আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে বহুত্ববাদ প্রবর্তিত হয়েছে, যা সম্পূর্ণ শিরক ও ধর্মের পরিপন্থী। তাছাড়া ইসলামের আদর্শ, আচার-আচরণ, বিধি-বিধান অন্যান্য ধর্মের তুলনায় উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত। তাই ইসলামের অনুপম আদর্শ ও শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমার জবাব শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আর কোন তাত্ত্বিক প্রশ্ন না করে বাহুল্য কথার অবতারণা করলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ঃ মনে রেখো, এ স্বল্প সংখ্যক মুসলমান যারা আজ তোমার সাথে এসেছে, অল্প দিনের মধ্যেই এরা তোমাকে ছেড়ে যাবে। এরপর মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ছাড়া তোমার কোন উপায় থাকবে না। আমি তোমার মত উৎসাহী অনেক মুসলমানকে ভিক্ষা করতে দেখেছি। আমি বলছি, তোমার পিতা-মাতাকে ছেড়ে যেও না। এটাই তোমার জন্য শ্রেয় হবে। তোমার পিতা-মাতা, ভাই ও আত্মীয়রা তোমার জন্য অস্থির হয়ে আছে। মাকে কষ্ট দেয়া জঘন্য পাপ। শোন, আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকেই তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, পিতা-মাতার নিকট না গেলে তুমি অনেক অপদস্ত হবে। পরিণতি সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, তুমি

ততটুকু জান না। এসব মুসলমান তোমার কোন কাজে আসবে না। তোমার সংকটের সময় এদের কাউকে কাছে খোঁজে পাবে না।

মোটকথা, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আদালতের ভাষায় কথা না বলে একজন হিন্দু পন্ডিতের ভূমিকা গ্রহণ করে উপদেশের এক বক্তৃতা শুনিয়ে দিলেন। আমি তো নীরবেই তার কথা শুনছিলাম। অনেকেই মনে করছিল, আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উপদেশে হয়তো প্রভাবিত হয়েছি। আমার দাদী আমার পার্শ্বেই দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকেই বলে উঠলেন-জনাব! কৃষ্ণলাল আস্তে করে বলে দিয়েছে, আমি এখন দাদীর সাথে চলে যেতে রাজী। বাইরে অপেক্ষমান মুসলমানদের নিকট একথা যেন বজ্রাঘাতের মত মনে হল।

আমি বললাম ঃ জনাব! আমার দাদী একথা নিজের থেকেই বলেছেন। আমি এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিনি। আমি যে ফয়সালা করেছি ভেবে চিন্তেই করেছি। মুসলমানরা সাথে থাকবে, না আমাকে ত্যাগ করে ছেড়ে যাবে, সেটা তাদের ব্যাপার। আমার ফয়সালার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো মুসলমানদের উপর ঈমান আনিনি। আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর। আর আমার এব্যাপারেও পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে যে, আল্লাহ আমার সাথে থাকবেন, তিনি আমাকে সাহায্য ও অনুগ্রহ করবেন। আমার কথা শুনে মনে হল মুসলমানদের দেহে যেন প্রাণ ফিরে এল। আর দাদী কাঁদতে শুরু করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করলেন ঃ জনাব! এই ছেলে যদি আমাদের সাথে না যায়, তাহলে একে মুসলমানদের সাথেও যেতে দিবেন না, বরং তাকে জেলখানায় থাকার ব্যবস্থা করে দিন।

জয় সিং সাহেব বললেনঃ আম্মা! আপনাদের ছেলে অনেক অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আপনারাই তো তার কথা শুনলেন। আমি একটি কথা বললে সে তিনটি কথা শুনায়। মনে হয়, যেন সে ইসলামের মহাপন্ডিত হয়ে গিয়েছে। তার এ অবস্থায় আদালতের ফয়সালায় আপনাদের অন্তর জুড়াবার মত কিছু করতে পারছি না।

এরই মাঝে আমার আত্মীয়দের মধ্য হতে কে যেন বলে উঠল, জনাব! আমাদের ছেলে এখনও নাবালেগ। হিন্দুস্তান দন্ডবিধিতে সে এখনও পৈত্রিক ধর্ম ছেড়ে যাওয়ার যোগ্য হয়নি। তার মেডিক্যাল পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হোক।

সম্ভবতঃ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নতুন কৌশল অবহিত হলেন। ঠোটের উপর দাঁত চেপে ধরে মাথা নত করে আবেদনের উপর কি যেন লেখতে লাগলেন। তারপর এস,আই কে বললেন ঃ একে চাকওয়ালের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা করে রিপোর্টসহ এস,ডি,ওর আদালতে হাজির কর। হয়ত নতুন ফয়সালা আসতে পারে।

গাজী আহমাদ ঃ আমি দৈহিক ও মানসিকভাবে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। পুলিশ কর্মকর্তা আমাকে চাকওয়ালের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আমার দাদী ও অন্যান্য আত্মীয়রাও সাথে গেলেন। মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব এবং আরো বেশ কয়েকজন মুসলমানও সাথে গেলেন।

হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন মুসলমান। তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেন না। যথা নিয়মে পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিলেন "গাজী আহমাদ বালেগ হয়ে গিয়েছে"।

সার্টিফিকেট পাওয়ার পর আমাকে এস,ডি,ওর আদালতে উপস্থিত করা হল। কিন্তু এস,ডি,ও সাহেব প্রাইভেট গাড়ীতে 'কুলার কাহার' চলে যাওয়ায় আদালত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই এস,আই, সাহেব বিলম্ব না করে বাসযোগে আমাদেরকে নিয়ে কুলার কাহার রওয়ানা হলেন, যাতে সেখানে এস,ডি,ও সাহেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আমাদের বাস ভুন অতিক্রম করার সময় জানা গেল এস,ডি,ও সাহেবের গাড়ী আসছে। একথা শুনে এস,আই সাহেব বাস থামাবার নির্দেশ দিয়ে তিনি আমাকে নিয়ে বাস হতে নীচে অবতরণ করে রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলেন। এস,ডি,ও সাহেবের গাড়ী আসার সাথে সাথে এস,আই, সাহেব পুলিশী কায়দায় সালাম দিয়ে গাড়ী থামাবার ইশারা করা মাত্রই গাড়ী থেমে গেল। এস,আই সাহেব আমার বিষয়ে সব কথা এস,ডিও সাহেবকে অবহিত করলেন। এরই মধ্যে গাড়ী হতে আমার দাদীও নীচে নেমে এলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেনঃ সাহেব! মুসলমানরা আমাদের উপর জুলুম করেছে। আমাদের এ ছেলেকে তারা ফুসলিয়ে মুসলমান বানিয়ে এখন তারা তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আপনি আমাদের ছেলে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিন। এস,ডিও সাহেব আমাকে আমার অবস্থা জানাতে বললেন ঃ আমি আমার মনের কথা পূর্বে যেভাবে বলেছি, সেভাবে এস,ডি,ও সাহেবের নিকট বললাম! ভুনে এস,ডি,ও সাহেবের একটি ভ্রাম্যমান আদালত বসে গেল। আমি আমার মেডিক্যাল রিপোর্টও দেখালাম।

এস,ডি,ও সাহেব আমার দাদীকে বললেনঃ এই মুকদ্দমার ফয়সালা নির্ভর করে এই ছেলের কথার উপর। তার কথা তো আপনাদের দাবীর বিপক্ষে। কাজেই আমি তো তার বক্তব্যের বিপক্ষে রায় দিতে পারি না। আপনারা উচ্চ আদালতে যান। এ ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে বলে আমার মনে হয় না। একথা বলে এস,ডি,ও সাহেব তার গাড়ীতে উঠে বসলেন এবং গাড়ী ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

আমরা পুনরায় বাসে উঠে বসলাম। কুলার কাহার গিয়ে দেখলাম, অনেক লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। সংবাদ জানতে পেরে তারা আনন্দিত হলেন। আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন। সাথীদেরকে চা পান করালেন। আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। এসব দেখে আমার আত্মীয়রা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কুলার কাহার হতে বাস বুঝালকালার দিকে রওয়ানা হল। রাস্তায় মিয়ানী ষ্টেশন। মিয়ানী আসার পর দাদী ও অন্যান্য আত্মীয়রা নেমে গেলেন। আমরা বাসেই বসে রইলাম। বুঝালকালায় বাস পৌঁছার পর আমরা সেখানে নামলাম। বুঝালকালার বাস ষ্টেশনে শতশত লোক আমাদের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। সবাই আমাকে দেখে আনন্দে ফেটে পড়লেন। শ্লোগান দিতে লাগলেন। বাস ষ্টেশন হতে মাওলানা সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাকে একটি ঘোড়ায় চড়ানো হল। মহিলারা বাড়ীর গেইটে দুধ-আর শরবতের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ কেউ ফুলও ছিটিয়ে দিলেন। বিভিন্ন পথ ঘুরে আনন্দ মিছিল সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে পৌছলো। দু'দিন পূর্বে যোহরের নামায আদায় করতে গেলে এখান হতেই পুলিশ চৌকিতে আমাকে ডেকে নেয়া হয়।

তারপর ম্যাজিস্ট্রেট ও এস,ডি,ও আদালত ঘুরে দু'দিন ক্লান্তিতে কাটিয়ে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে বাড়ী এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

এরপর কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। এ সময়ই আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটি ছিল এমন, যেন আমি একটি ঘরে বসে আছি। আর সকল মানুষ দলে দলে একটি ময়দানে সমবেত হচ্ছে। শুনতে পেলাম কিয়ামত শুরু হয়ে গিয়েছে। আমিও সেই ময়দানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সূর্যের তাপ ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রচন্ড হয়ে উঠল। এক খন্ড মেঘ আমার মাথার উপর এসে আমাকে ছায়া দান করতে লাগল। তারপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হতে লাগল। আর তখনি আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল।

সকাল বেলা ফজরের নামায শেষে মাওলানা সাহেবকে স্বপ্নের কথা শুনালে তিনি বললেন ঃ আরো কোন পরীক্ষা তোমার উপর আসতে পারে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে তাতে তুমি সফলকাম ও উর্ত্তীণ হবে।

গাজী আহমাদ বলেনঃ আমি এবার নিয়মিত স্কুলে যেতে শুরু করলাম। তবে আমি এ বিদ্যালয়ে থাকার কারণে প্রধান শিক্ষক সাহেব আশংকা করতে লাগলেন, যে কোন সময় তাদের উপর কোনরূপ অনুসন্ধান চালানো হতে পারে। এজন্য তারা খুবই সতর্কতা অবলম্বন করলেন।

পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ঃ

প্রধান শিক্ষক সাহেব অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা লিখে সংবাদ সংস্থায় পাঠিয়ে দিলেন। ৯ই এপ্রিল ১৯৩৮ইং লাহোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইহ্সানে তা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

একজন নও মুসলিমের ঘোষণা ঃ

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ঘোষণা করছি যে, আমি বিগত একমাস পূর্বে স্বেচ্ছায় পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। বুঝালকালার প্রখ্যাত আলেম ও মসজিদের খতীব জনাব মাওলানা আবদুর রউফ সাহেবের হাতে হাত দিয়ে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমার ইসলামী নাম গাজী আহমাদ। হিন্দু থাকাকালে আমার নাম ছিল কৃষ্ণ লাল। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ কোনপ্রকার প্ররোচনা দেয়নি অথবা ভয়ভীতি প্রদান করেনি বা লোভ-লালসা দেখায়নি। ইসলাম ধর্মের সত্যতা, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই আমি এই ধর্ম গ্রহণ করেছি। বিগত দুই তিন বছর যাবত আমি বিভিন্ন ইসলামিক বই-পুস্তক পাঠ করে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হয়ে মুসলিম সমাজে তার ব্যবহারিক আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছি। পর্যায়ক্রমে তিনটি আদালতে আমি এর পক্ষে অনুমতি ও অনুমোদন গ্রহণ করেছি। আমি সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন ও পরিণত বয়সের। সকল মুসলমানের নিকট আমি দোয়া প্রার্থী।

এরই মধ্যে আমার বার্ষিক পরীক্ষা। আমি অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়ে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলাম।

পিতার আগমন ঃ

এপ্রিলের মাঝামাঝি আমার পিতা বাড়ী এলেন। সব বিষয় অবহিত হয়ে তিনি গ্রামের সকল প্রভাবশালী হিন্দুদের আমাদের বাড়ী ডাকলেন। বর্তমান অবস্থায় তার কি করণীয, সে সম্পর্কে সকলের পরামর্শ চাইলেন। কেউ কেউ উস্কানিমূলক ব্যক্তব্য দিয়ে বলল "আইনগত ব্যবস্থা গিয়ে জেতা অসম্ভব। কারণ, তোমার ছেলে তোমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে ও পত্রিকায় বিবৃতি ও বক্তব্য দিয়েছে। ভবিষ্যতে সে তাই দিবে বলে মনে হয়। এমন ছেলে সারা গোত্রের জন্য কলংক। তাই এ মুহূর্তে করণীয় একটাই–তাকে কোন প্রকারে বুঝালকালা হতে বাইরে অন্য কোন এলাকায় নিয়ে হত্যা করে ফেল। এতে তোমার অবশিষ্ট সম্মানটুকু অন্ততঃ রক্ষা পাবে। অন্যথায় তোমার অন্য ছেলেদেরকেও তুমি রক্ষা করতে পারবে না। তোমাদের সাথে কেউ আত্মীয়তাও করবে না। নিজের ধর্ম ও মান-সম্মান রক্ষার জন্য তোমাকে এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

আমার পিতা বললেন ঃ এটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়াবহ। এতে বুঝালের 'বদমাইশ মুসলমানরা' ক্ষেপে যাবে। তাদের মুকাবিলা করা তখন কঠিন হয়ে পড়বে।

অপর উপদেশ দাতা বললঃ আমার প্রস্তাব শোন, এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না। তুমি তোমার ছেলের সাথে সন্ধি করে নাও। সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাও, যাতে সে তোমার বাসায় আসা যাওয়া করতে থাকে। যখন সে স্বাভাবিক ভাবে আসা যাওয়া করতে থাকবে তখন একদিন সুযোগ মত খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে দিবে। তাতে সবকিছুর অবসান ঘটবে। আর নিজেদের উদ্দেশ্যও সফল হবে।

আলোচনা যেহেতু আমাদের ঘরেই হচ্ছিল, তাই মা আলোচনা শুনতে পেলেন। মায়ের অন্তর কেঁপে উঠল। কোন মা তার ছেলেকে হত্যা করা কখনও বরদাশ্‌ত করতে পারেন না। তাই আমার মা সকাল বেলায়ই গোলাম মুহাম্মদ নামক আমাদের এক মুসলমান প্রতিবেশীকে গোপনে ডেকে তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলল, তুমি এখনই বুঝালকালা গিয়ে আমার ছেলেকে বলে আস, যতক্ষণ আমি তাকে নিজে না ডাকব, ততক্ষণ যেন সে এই বাড়ীতে না আসে এবং আমার হাতের খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন হিন্দুর হাতের খাদ্য যেন গ্রহণ না করে। গোলাম মুহাম্মদ খোঁজে খোঁজে মাওলানা সাহেবের বাড়ী গিয়ে আমার সাথে দেখা করে মায়ের পয়গাম পৌঁছাল। আমি অনুমান করে নিলাম, হয়তবা আমার হত্যার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকতে পারে। নিজের আজান্তেই কৃতজ্ঞতার কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং স্বতস্ফুর্তভাবেই কথাগুলো বেরিয়ে এল, আল্লাহ এমন মমতাময়ী মায়ের হিদায়াতের একটি পথ তুমি করে দাও, যাতে তার ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতই কল্যাণময় হয়।

ঝিলাম জেলা জজের আদালতে মামলা দায়ের ঃ

আমাদের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় কোন কোন প্রভাবশালী হিন্দু এ

পরামর্শও দিয়েছিল যে, জেলা আদালতে জবরদস্তি বন্দী করে রাখার জন্য মামলা দায়ের করা হোক। সে পরামর্শ অনুযায়ী পরদিন আমার পিতা ঝিলাম গিয়ে জেলা জজের আদালতে এই বলে মামলা ঠুকে দিলেন যে, আমার নাবালেগ ছেলেকে জোর-জবরদস্তি আটক করে রাখা হয়েছে। এলাকায় মুসলমান সংখ্যাগুরু আর আমরা সংখ্যালঘু, তাই তাদের দখল হতে ছেলেকে আমরা উদ্ধার করতে পারছি না। এব্যাপারে তিনি বুঝালকালা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব, সুবেদার (অবঃ) খান জামান সাহেব ও রেশম খানকে বিবাদী করে আরজি পেশ করলেন যে, আমার ছেলেকে প্রভাবিত করে মুসলমান করার ক্ষেত্রে এরা বিশেষভাবে জড়িত।

আমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ ঃ

মামলা দায়ের করে আব্বা বাড়ী চলে এলেন। কাউকে মামলা দায়েরের কথা জানতে দিলেন না, সম্পূর্ণ গোপন করে রাখলেন। তৃতীয় বা চতুর্থ দিন আব্বা বুঝালকালায় এলেন এবং মাওলানা আবদুর রউফ সাহেবের বাসায় পৌঁছলেন। আমি তখন বাসায় ছিলাম না, এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাকে ডেকে আনা হল।

আমি মাওলানা সাহেবের বাড়ী পৌঁছে দেখলাম, আমার আব্বা একটি চেয়ারে বসে আছেন। বাড়ীতে অনেক লোকজন। আব্বা তাদের সাথে হাসি খুশী কথোপকথনে লিপ্ত।

আমি আসতেই আব্বা উঠে আমাকে গলায় জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। আমার বুকে অস্বাভাবিক স্পন্দন হতে লাগল। আমি আব্বার নিকটেই বসলাম। তার মুখ-মন্ডল ছিল বিষণ্ন। তবে স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা করছেন বলে মনে হচ্ছিল। তার চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। পিতৃস্নেহ বিগলিত হয়ে চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে হয়তো। আমার অন্তরও মোচড় দিয়ে উঠল। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ তো আমার পরিবার ও আমার গোত্রের জন্য একটি বিপ্লব ও একটি আলোড়ন ছিল। গোত্রের আনন্দ-বিষাদে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সমাজবাদীদের প্রচন্ড চাপ ছিল আমার পরিবারের উপর। সে সময় পরিবারের কারো মুখে হাসি ছিল না। বিষাদ-ব্যথা আর ক্ষোভ ছিল সকলের মনে। বিদ্বেষও ছিল হিন্দু সমাজের অনেকের মনে। আমি স্বীকার করছি, আমার কারণেই পরিবার আর গোত্রের সকলের এই যাতনা, যন্ত্রণা। কিন্তু আমি ছিলাম মনের অধীন। আর আমার মন ছিল ইসলাম ধর্মের সত্যতা ও আদর্শের আকর্ষণের অধীন। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বপ্নে পাওয়া স্নেহ ও সান্নিধ্যের অধীন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমার মনের আবেগ-অনুভূতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। পরম সত্য বলেই আমি তা গ্রহণ করেছি।

আমি পরম সত্য হিসেবে ইসলামকে জীবন বিধানরূপে গ্রহণ করেছি। এ সত্য জীবনের আলো। এ আলো ব্যতীত জীবন অন্ধকার। এ সত্য ব্যতীত জীবন মূল্যহীন। তাই ইসলামের আকর্ষণ আমার অন্তরে প্রবলতর। পিতার আকর্ষণও অপরিসীম, কিন্তু ইসলাম বিসর্জন দেয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সম্ভবতঃ কারণ আর বলতে পারব না। তবে সম্ভব যে নয়, সে কথা অকাট্য ও নিশ্চিত।

আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শিরা-উপশিরায় ইসলাম প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। সবকিছু যেন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি।

আমার পিতা আমাকে বললেন–"বেটা! তুমি তোমার ধর্ম পরিবর্তন করেছ–এটা তো দোষের কিছু নয়। সম্ভবতঃ ইসলামের কোন বিষয় তোমার কাছে ভাল প্রমাণিত হয়েছে। আমি এতে আনন্দিত যে, তুমি যা সত্য মনে করেছ তা গ্রহণ করেছ। কিন্তু তুমি বড় একটি ভুল করেছ, তা হচ্ছে এই যে, তুমি বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ। ভাইদের মধ্যে তুমি বড়, তোমার মা মহিলা মানুষ। তোমার ছোট ছোট ভাইদের দেখা শোনা আর পারিবারিক কাজে তুমি তোমার মাকে সহযোগিতা করতে। এটা তুমি বর্জন করে দিয়েছ। তোমার অবর্তমানে বাড়ী নিরানন্দ হয়ে গিয়েছে। আমি খুব একটা ছুটি পাই না। এবারও খুব কষ্ট করে ছুটি পেয়েছি। তুমি বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে না দিলে আমার আসার প্রয়োজন হতো না। কাশ্মীর অনেক দূর। যাতায়াত যেমন ঝামেলাপূর্ণ, তেমন ব্যয়বহুলও।

যাক, কয়েক দিন এখানে থেকে বাড়ী চলে এসো। বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে থাক। তোমার ধর্ম তুমি পালন কর। কেউ বাঁধা দিবে না। তবে স্কুলের লেখাপড়া বন্ধ করো না। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে যাবে। এমনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আব্বা আমাকে পিতৃসুলভ আদেশ-উপদেশ দিতে থাকলেন। উপস্থিত সকলেই আমার পিতার কথা শুনে আমার চেয়ে বেশী খুশী ও প্রভাবিত হয়েছে।

আমার আব্বা বললেন–"যদি টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে টাকা রেখে দাও।" আমি বললাম "না টাকা আছে।" তারপর বললেন–"অন্যকিছু প্রয়োজন হলে বাসা থেকে আনিয়ে নিও। অহেতুক কারো কাছে হাত পাততে যেও না।"

এসব কথা বলার পর আব্বা উঠে দাঁড়ালেন। উপস্থিত মুসলমানদের সাথে বিদায়ী হাত মিলালেন। তিনি চলে যাওয়ার পর সবাই তার ব্যবহারের প্রশংসা করলেন। মাওলানা সাহেবও বললেন–"গাজী আহমাদের পিতা সত্যিই বড় মনের মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমার পিতা চলে গেলেন। সবাই মনে করলেন আমার আর কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। কিন্তু আমি নিজে আশংকা মুক্ত হইনি। এরই মধ্যে আমার পিতা আরও একটি কাজ করেছেন, তা হলো শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি আবেদন করেছেন যে, "আমার ছেলে 'বুঝাল কালা' উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিল, বিদ্যালয়ের সকল স্টাফই মুসলমান। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ আমার ছেলেকে ফুসলিয়ে মুসলমান করে নিয়েছে। অনুগ্রহ করে এর সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অন্যথায় অন্যান্য হিন্দু ছাত্ররা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে পারে।" ডিভিশনাল ইন্সপেক্টরকে লেখা এই আবেদনের দ্রুত এ্যাকশন নেয়া হলো। ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর দ্রুত তদন্ত করার নির্দেশ দিলেন। ডিষ্ট্রিকট ইন্সপেক্টরের নাম ছিল কুরায়শী মুহাম্মদ সাদেক।

কুরায়শী সাহেব স্কুল ছুটির পর স্কুলে এসে পৌঁছলেন। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দকে স্কুলে তলব করা হলো। বিকাল চারটার সময় পিয়ন এসে আমাকেও ডেকে নিয়ে গেল।

আমি পৌঁছার পর ডি.আই সাহেব আমার সাথে বুক মিলালেন। পাশে রাখা চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন। কাগজপত্র বের করে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু

করলেন।

আমার বর্তমান নাম, সাবেক নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, ক্লাশ সবই জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্ন মোতাবিক আমিও জবাব দিলাম। (উভয়ের কথোপকথন)

কুরায়শী ঃ বর্তমানে তুমি কোথায়? কার তত্ত্বাবধানে রয়েছ?

গাজী আহমাদ ঃ মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় আছি।

কুরায়শী ঃ আচ্ছা, তুমি আমাকে একথা বল যে, কোন শিক্ষক ক্লাশে বা অন্য কোথাও তোমাকে একথা বলেছে যে, ইসলাম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম?

গাজী আহমাদ ঃ জনাব! কোন শিক্ষক আমাকে একথা বলেননি এবং তারা কোন প্রকার উৎসাহও দেননি।

কুরায়শী ঃ যদি কোন শিক্ষক তোমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু না বলে থাকেন অথবা তারা কোন উপদেশ বা উৎসাহ না দিয়ে থাকেন তাহলে তুমি মুসলমান কি করে হলে?

গাজী আহমাদ ঃ জনাব! আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় কিছু কিছু বই-পুস্তক পাঠ করে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেছি। তাতে ইসলামের প্রতি আমার কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আমি আল্লাহর নিকট সত্য ধর্ম লাভের দোয়া করতে থাকি। আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমি পর পর দু' বার স্বপ্নে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জিয়ারত লাভ করেছি। তিনি আমাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন, এটাই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং তিনি আমাকে এ ধর্ম গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোন শিক্ষক বা অন্য কারো কোন হাত নেই।

কুরায়শী ঃ তুমি ইসলাম ধর্মে এমন কি বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য দেখলে, যা হিন্দু ধর্মে নেই?

গাজী আহমদ ঃ জনাব! আমি তো একজন নও মুসলিম, বিস্তারিত আমার জানা নেই। তবে এতটুকু জেনেছি, ইসলামের অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর তাওহীদ। অন্য কোন ধর্ম আল্লাহর তাওহীদ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু ধর্মে তো নিজ হাতেই মা'বুদ বানানো হয় এবং তার সামনে মাথা নীচু করতে হয়। আর ইসলাম ধর্মে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথা নীচু করা বৈধ নয়।

কুরায়শী ঃ বেটা! এমন ত্রুটি তো মুসলমনাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। অলি-আওলিয়াদের মাজারে মানুষদেরকে আমি নিজে সিজদা করতে দেখেছি।

গাজী আহমাদ ঃ জনাব! এটা তো ইসলামের নির্দেশ নয়; বরং বিপথগামী লোকদের কাজ!

কুরায়শী সাহেব খুবই খুশী প্রকাশ করে বললেন ঃ নামায আদয় করতে শিখেছ?

আমি বললাম ঃ নামায আদায় করতে তো শিখেছি, তবে সকল মাসআলা-মাসাইল পর্যায়ক্রমে শিখছি। কোন্ ওয়াক্তের নামায কত রাকাত, কি কি তা বললাম।

কুরায়শী সাহেব আমার মজবুত ঈমান ও দৃঢ়তার জন্য দোয়া করলেন এবং আমার জবানবন্দি গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর আমি বাইরে এলে অপেক্ষমান লোকেরা

ও শিক্ষক মন্ডলী আমাকে মুবারকবাদ দিলেন। আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন।

পরদিন সকালে স্কুলে এসে শুনি কুরায়শী সাহেব এখনও আছেন। তাই তার সাথে দেখা করলাম। এরপর কুরায়শী সাহেব চলে গেলেন। আমার উপর কুরায়শী সাহেবের একটি বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। তাহলো পরবর্তী সময়ে পাঠ্য জীবন শেষ হওয়ার পর আমার কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চাকুরী প্রাপ্তির মাধ্যমে। সেই চাকুরীটা পাওয়ার ক্ষেত্রে কুরায়শী সাহেবের খুবই অনুগ্রহ ও অবদান ছিল।

একটি ভীতিকর স্বপ্ন ঃ

তিন চার দিন পর এক রাতে স্বপ্নে দেখি আমার পিতা, দাদী আরো কয়েকজন আত্মীয় একটি বিরাট দরজার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাকে জোরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বলছি–"হে মুসলমানরা! আমাকে হিন্দুরা জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে"। এই টানা-হেচড়ার মধ্যে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সকালে মাওলানা সাহেবকে স্বপ্নের কথা বললাম! আমার কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ ভাল করুন; অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। সম্ভবত আবার কোন পরীক্ষায় পতিত হও কিনা, আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর উপর ভরসা কর। মন থেকে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে দাও।

ঝিলাম আদালতের সমন ঃ

এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে ঝিলাম আদালত হতে একজন পেয়াদা এসে প্রধান শিক্ষক মালিক মুহাম্মদ তোফায়েল, মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব, সুবেদার খান যামান সাহেব ও রেশম খানকে ঝিলাম আদালতের সমন পৌঁছালেন যে, অমুক তারিখে নও-মুসলিমসহ আদালতে উপস্থিত হও। প্রধান শিক্ষক ব্যতীত অন্যরা সমন গ্রহণ করে দস্তখত করে দিলেন। সেদিন রাত্রে আমার পিতার সম্মুখে যারা ছিলেন, তার কথা যারা শুনেছেন, তারা আশ্চর্যান্বিত ও হতভম্ব হয়ে গেলেন–তারা বলতে লাগলেন-তিনি বলে গেলেন কি, আর করলেন কি? বাড়ীতে যাওয়ার দাওয়াতও দিলেন, আবার আদালতে মামলাও ঠুকলেন। আমি সবাইকে সান্ত্বনা দিলাম, আপনারা দোয়া করতে থাকুন, আল্লাহর যা মনজুর তাই হবে।

নির্দিষ্ট দিনে আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য মাওলানা সাহেব, সুবেদার সাহেব, রেশম খান আর আমি রওয়ানা করলাম। বুঝাল কালা থেকে আমরা বাসে উঠলাম, মিয়ানী থেকে আমার পিতা ও কয়েকজন আত্মীয় উঠলেন। কুলারকাহার বাস ষ্টেশনে এসে বাস থামার পর আব্বা আমাকে তার নিকট যেতে ডাকলেন। আমাকে অনুচ্চস্বরে তিনি বললেন–দেখ! ঝিলাম গিয়ে আমার ইজ্জতের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে। শেষ কথা হলো আমি তোমার পিতা। কে আছে, যে আমার চেয়ে বেশী তোমার কল্যাণকামী হতে পারে? এই মুসলমানদের সাহায্য-সহানুভূতি অল্প দিনের। পরে তুমি অপদস্থ হবে। ভিক্ষা করে চলতে হবে। তখন আমরা তোমার দিকে ফিরেও তাকাব না। তাই সময় থাকতে বুঝতে চেষ্টা কর। আদালতে গিয়ে আমাদের পক্ষে বয়ান দিবে। আর আমি যে কয়জন মুসলমানের নামে মামলা

করেছি, তাদের নাম উচ্চারণ করে বলবে যে, এরা আমাকে ধোকা দিয়ে মুসলমান করে নিয়েছে। আর বর্তমানে তারা আমাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। তাহলে তাদের শাস্তি হয়ে যাবে এবং অন্য মুসলমানরাও আর কোন দিন এমন কাজ করতে সাহসী হবে না। জজ সাহেব যদিও মুসলমান, কিন্তু তাকে আমরা ম্যানেজ করেছি। তিনি আমাদেরকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি অনেক টাকাও খরচ করে ফেলেছি। পরে আরও সবিস্তার জানতে পারবে।

আমি বললাম–"মামলা-মুকদ্দমায় না যাওয়াই ভাল ছিল। অকারণেই টাকা খরচ করলেন। আমি যে ফয়সালা করেছি, জেনে-বুঝে ও ভেবে-চিন্তেই করেছি। প্রকৃতপক্ষে জীবন, জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে আপনাদের ধারণা সঠিক নয়। আমি যে সত্য গ্রহণ করেছি, এই সত্য পরিত্যাগ করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। মুসলমানরা আমার থেকে সরে যাক, আর আপনারা আমার উপর হতে মুখ সরিয়ে নেন অথবা আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি কোন অবস্থাতেই আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবো না, করতে পারবো না।"

আব্বাজান! মানুষ বালেগ হওয়ার পর অনেকগুলো বিষয়ে দায়িত্ববান হয়ে যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ধর্ম। আমি কোন লোভে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি। বাড়ীতে কোন কিছুর অভাব ছিল না। আমি কোন মানুষের কথায় প্রভাবিতও হইনি। অন্যথায় আদালতে বয়ান দিয়ে আমি আপনার কাছে চলে যেতাম। আপনি আমার পিতা, আমি আপনাকে সেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে আপনার নির্দেশ পালন করতে আমি অক্ষম। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার কথা শুনে আব্বা নীরব হয়ে গেলেন। আমি আমার জায়গায় ফিরে গিয়ে বসলাম। চাকওয়াল গিয়ে বাস পরিবর্তন করতে হলো এবং দুপুরের দিকে আমরা ঝিলাম পৌঁছলাম।

বুঝাল কালা হতে আমার সাথে অনেক মুসলমান ঝিলাম যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাওলানা সাহেব তাদের বারণ করে বললেন–অনেক দূরের পথ, খরচ হবে প্রচুর। স্থানীয়ভাবে কাজও আছে। তাই তারা রয়ে গেলেন।

ঝিলামে আমরা এক মৌলভী সাহেবের বাড়ীতে রইলাম। মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব মৌলভী সাহেবকে সব বিষয় অবহিত করলেন। রাত্রে মৌলভী সাহেব আমাদেরকে জজ সাহেবের মহুরীর সাথে সাক্ষাত করালেন। তার সাথে কথা বলে মনে হল আদালতের অবস্থা আমাদের অনুকূলে নয়। তার মুড়ও ভাল ছিল না। মনে হয় আমার পিতা বা ঝিলামের হিন্দুরা আমাদের পূর্বেই তাদের সাথে দেখা করে 'ম্যানেজ' করে রেখেছে।

ফজরের নামায আদায়ের পর আমরা একজন উকিলের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাদের কথা শুনে বললেন–"চিন্তার কিছু নেই, আমি সব কিছু ঠিকঠাক করে নিব।" আমরা সময়মত আদালতে গেলাম, অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু উকিল সাহেবকে খুঁজেই পেলাম না। পরে আরেকজন উকিল ধরে আদালতে হাজিরা দিলাম।

আদালতের কার্যক্রম ঃ

আদালতের কার্যক্রম শুরু হল। আমার পিতার সাথে ঝিলামের তিন চারজন হিন্দু ছিল। আব্বা আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে বললেন–"বেটা! এখন আমার ইজ্জতের প্রশ্ন! এ সময়ও যদি তুমি আমার পক্ষে না আস, তাহলে আমার অসম্মানের সীমা থাকবে না। মিয়ানীতে আমাদের থাকাই সম্ভব হবে না। তুমি যদি কাউকে ভয় পাও জজ সাহেবের নিকট তার নাম বল। তিনি আজই তাকে জেলে পাঠিয়ে দিবেন। তুমি আমার কাছে যা চাবে আমি তোমাকে তাই দিব। জজ সাহেবের নিকট শুধু এতটুকু বলে দাও জনাব! আমি আমার পিতার সঙ্গে থাকতে চাই।"

পিতার কথার সরাসরি জবাব দিলাম না। মনে নতুন কথা আসলো। সময়ের বিবর্তন আর অবস্থার ভিন্নতার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। আল্লাহর পথে থাকার জন্য কত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হচ্ছে। রুজীর পেরেশানী, জীবন-যাপনের উপকরণ, পিতা-মাতা ও ভাইদের ভালবাসা, পারিবারিক সম্পর্ক, হাজারো বিষয়ের আকর্ষণ! এতসব অতিক্রম করে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়া কত দূরূহ বিষয়ই না হচ্ছে। এ সবগুলোকে জীবনে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রয়োজন সাব্যস্ত করতে না পারলে বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়।

আমার পিতা তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেন। তিনি অসহায় তার ভ্রান্তির অতল গহবরে। কিন্তু আমিতো অপারগ প্রতীয়মান আদর্শে। আমারও পিতার অসহায় অবস্থায় তার প্রতি করুণা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু তার কথা গ্রহণ করা যায় না। আমার পিতা-মাতার আকর্ষণ ছিল কেবল তাদের ছেলের প্রতি। আর আমার আকর্ষণ ছিল দু'টি জিনিসের প্রতি। একটি হচ্ছে আমার মাতা-পিতা অপরটি হচ্ছে-আমার দ্বীন। আমার পিতা-মাতা আমাকে যেদিকে টানছিলো আমার দ্বীন টানছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। দু'দিকের টানে আমার অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী দুঃসহ।

আমার পিতা আমার পার্শ্বে দাঁড়ানো। বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন কল্পনা আমার মনে তোলপাড় করছে। হঠাৎ আরেকজন পিতার কথা মনে পড়লো। তার নাম লোকমান হাকীম। পবিত্র কুরআনে তার কথা উল্লেখ রয়েছে। লোকমান হাকীম তার পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন–"হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না, নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।"

"হে বৎস! তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন, আমারই ইবাদত করো ও পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করো। আর পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মানবে না। তবে জাগতিক বিষয়ে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদাচরণ করো।"

এ হলেন আদর্শ পিতা, যিনি তার পুত্রকে এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেন, শরীক করতে নিষেধ করেন–আর আমার পিতা? সম্পূর্ণ বিপরীত–এক আল্লাহর ইবাদত করতে নিষেধ করছেন। শরীক করতে আদেশ দিচ্ছেন।

পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত লোকমান হাকীমের কৃত এই উপদেশ বাণী আমার

মনের দ্বিধা দূর করে দিল। আল্লাহর তাওহীদের তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা পূর্বের চেয়ে আরো বেশী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো আমার দ্বিধাগ্রস্ত মনে। সাথে সাথে আমি আমার পিতাকে জবাব দিলাম–আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপনার ছেলে অক্ষম, অপারগ। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিরুপায়, অসহায়।

জজ সাহেব তার মহুরীকে দিয়ে কি যেন লেখাচ্ছিলেন। অবসর হতেই আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন–"আরে বেটা তুমিই কি মুসলমান হয়েছ?" আমি বললাম–জ্বী, হ্যাঁ।

জজ সাহেব ঃ নাম কি তোমার? কোন ক্লাশে পড়? কোন স্কুলে পড়?

আমি প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিলাম।

জজ সাহেব ঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে তোমাকে কে বলেছে?

গাজী আহমাদ ঃ জনাব! কেউ বলেনি। আমি নিজ ইচ্ছায়ই মুসলমান হয়েছি।

জজ সাহেব ঃ (আমার পিতার দিকে ইশারা করে) এই ব্যক্তি কি তোমার পিতা?

গাজী আহমাদ ঃ জ্বী, হ্যাঁ। তিনি আমার পিতা।

জজ সাহেব ঃ তুমি তোমার পিতার সাথে যেতে চাও?

গাজী আহমাদ ঃ না, অবশ্যই না।

জজ সাহেব ঃ মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কেউ কি তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করেছে? যদি কেউ তা করে থাকে তাহলে তার নাম বল। তাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দিব!

গাজী আহমাদ ঃ না জনাব! আমার ইসলাম গ্রহণের জন্য কেউ পরামর্শও দেয়নি, উৎসাহও দেয়নি, আর কোনপ্রকার চাপও প্রয়োগ করেনি।

জজ সাহেব হঠাৎ সকলকে আদালত কক্ষের বাইরে যেতে নির্দেশ দিলেন। সবাই যেতে উদ্যত হলে আমাকে ও আমার পিতাকে ইশারা দিয়ে থাকতে বললেন। স্থানীয় কয়েকজন হিন্দুও রয়ে গেল।

আদালত কক্ষে এখন জজ সাহেব আমি, আমার পিতা, আর তিন চার জন স্থানীয় হিন্দু ব্যতীত আর কেউ নেই।

জজ সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন–এই ছেলে শোন! তুমি এখনও নাবালেগ। বালেগ হওয়া পর্যন্ত তোমাকে তোমার পিতার নিকটই থাকতে হবে। আমি বললাম–জনাব! আমি নাবালেগ নই। আমি বালেগ ও সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন। আমার নিকট মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও রয়েছে। প্রয়োজনে আপনিও মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে পারেন। জজ সাহেবের কপালে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো। মহুরীর নিকট একটি খালি চেয়ার ছিল, আমাকে তাতে বসতে বলা হলো। আমি বসলাম। আমার আব্বার সাথে ঝিলামের যে কয়জন হিন্দু আদালত কক্ষে উপস্থিত ছিল তাদের একজন আমার জামানত গ্রহণ করলো। জজ সাহেব এক তরফা রায় দিলেন। "আমাকে আমার পিতার সাথে যেতে হবে।" আমি সাথে সাথে বলে উঠলাম–না, আমি যাব না। জজ সাহেব আমার আব্বাকে হুকুম দিলেন–একে ধরে নিয়ে যান! সাথে সাথে পার্শ্বের একজন হিন্দু আমার দুই হাত ধরলো। আরেক জন আমার দেহ ধরলো। আরেক জন আমার দেহ তল্লাশী করলো। আমার পকেটে একটি ছোট চাকু ছিল তা নিয়ে নেয়া হল।

আমি হিন্দুদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে দৌড়ে বাইরে যেতে চাইলাম, কিন্তু সম্ভব হলো না। ততক্ষণে সব হিন্দুরা আমাকে ধরে শূন্যে তুলে ফেললো। আমি হাত পা ছুড়তে লাগলাম, আর চিৎকার করতে লাগলাম, হে মুসলমানরা! এই হিন্দুরা আমায় জবরদস্তি করে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে তারা প্রাণে মেরে ফেলবে। আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!

কিন্তু আদালতের রায় কেউ লঙ্ঘন করে আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসতে সাহস করল না। মাওলানা সাহেবও সুবেদার সাহেব দূরে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

আদালত কক্ষের দরজার সাথেই একটি গাড়ী দাঁড়ানো ছিল। আমাকে শূন্যে তুলেই হিন্দুরা ঐ গাড়ীতে এনে নিক্ষেপ করলো। দুই পার্শ্বে তারা বসলো, সাথে সাথে ড্রাইবার গাড়ী ছেড়ে দিল। ঝিলাম নদীর তীরে একটি দোতলা বাড়ীর সম্মুখে এসে গাড়ী থামলো। আমাকে টেনে হেচড়ে নামিয়ে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমি বুঝতে পারলাম না জজ সাহেব কি করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারলেন। একজন মুসলমান হয়ে কি করে তিনি একজন নওমুসলিমকে হিন্দু ধর্মে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারলেন। আদালত তো সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে। তিনি কি করলেন। আদালত অবিচার করলে সুবিচার কোথায় পাওয়া যাবে? এর পূর্বে শিখ ম্যাজিষ্ট্রেটও যা করেননি, জজ সাহেব মুসলমান হয়ে তা করতে পারলেন। আমার পিতাও সাথে ছিলেন। এরই মধ্যে বেশ কিছু হিন্দু জড়ো হলো। আমি তো অনবরত কাঁদছিলাম। কিছু নাস্তা পানি আনা হলো, কিন্তু তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতেই থাকলাম। পরিবেশটা কিয়ামতের মতই লাগছিল। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতেও কিছু খাওয়া হলো না।

আমার মায়ের উপস্থিতি ঃ

এভাবেই আমি গৃহবন্দী হয়ে গেলাম। দু'দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তৃতীয় দিন দেখলাম, আমার এক ছোট ভাইকে নিয়ে মা এসে উপস্থিত হলেন। আমার পিতার টেলিগ্রাম পেয়ে মা ঝিলাম এলেন।

মা আমার কক্ষে প্রবেশ করেই কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন ঃ আদালতের আগামী হাজিরায় যদি তুমি আমাদের পক্ষে বয়ান না দাও, তাহলে আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না। তোমাকে ছাড়া আমি ঐ বাড়ীতে থাকতে পারি না। আমি বিষ পান করবো অথবা ঝিলাম নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরবো। তোমার কারণে সারা গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেছে। তুমি যদি মিয়ানী না যাও, তাহলে আমাদের আর ওখানে থাকা সম্ভব হবে না। বুঝাল স্কুলে তোমার ছোট ভাইয়েরা যেতে পারছে না– হিন্দু ছাত্ররা ঠাট্টা করে। তুমি যেদিন থেকে আমাদের ছেড়ে এসেছ, ভগবান সাক্ষী সেদিন থেকে আমাদের সুখ-শান্তি বিদায় হয়ে গিয়েছে। তোমার শোকে রাত্রে কাঁদতে কাঁদতে নিদ্রা যাই, আর সকালে নিদ্রা ভাঙ্গার পর তোমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ভগবানের সমীপে ফরিয়াদ করতে করতে শয্যা ত্যাগ করি।

মায়ের এই কথাগুলো বর্শার ন্যায় আমার অন্তরকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল। কিন্তু

সাথে সাথে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর পূত-পবিত্র চেহারা মুবারক আমার অন্তর দৃষ্টিতে ভেসে উঠলো! তাঁর অমীয় উপদেশ আমার কানে নতুন করে ধ্বনিত হতে লাগলো। তাতে শত কষ্টে সান্তনা বোধ হলো। নবীজীর (সাঃ) আশ্বাস বাণী "তুমি সফল হবে" তা অন্তরে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হলো। মনে হলো আমার যাতনা ক্লিষ্ট মনে যেন দ্বিধা না আসে, সেজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করলাম। আল্লাহ যাকে ঈমানের পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করেন সে কখনও বিচ্যুত হয় না। অন্য কথায় আল্লাহ যাকে নিজের করে নেন, সে অপরের হতে পারে না। আমার মা প্রতিদিন এভাবে এবং এসব কথাই বলতে থাকতেন। আর আমি নীরব থাকতাম। পিতা মাতা সাথে ছিলেন তা সত্ত্বেও মনে হতো আমি হাশরের মাঠে রয়েছি। এ সময়ে আমার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখা হতো। দু'জন লোকের প্রহরা ছিল। তারা আমাকে চোখে চোখে রাখতো। বাড়ীর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগই আমার ছিল না।

কয়েকদিন পর আমি আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম দয়া করে বলুন তো আপনার মামলার অবস্থা কি? আব্বা বললেন–আমাদের দ্বিতীয় দিনের হাজিরা দেয়ার জন্য দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। দশম দিন আমাদের আবার হাজির হতে হবে। তুমি যদি সেদিন আমাদের পক্ষে বক্তব্য দাও তাহলে আমরা মামলায় জিতে যাব, আর যদি বিপক্ষেও বক্তব্য দাও তবুও রায় আমাদের অনুকূলেই আসবে। এবার তুমি মুসলমানদেরকে ভুলে যাও। তারা আর তোমার চেহারাও দেখতে পাবে না। আদালত দশ দিনের জন্য তোমাকে আমাদের হাওয়ালা করে দিয়েছে।

আল্লাহর কাছে দোয়া ঃ

আব্বার কথা শুনে আমার মন অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো। ভয়ে চিন্তা করার শক্তিটুকুও লোপ পেয়ে গেল। মুখে কিছুই বললাম না। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলাম ঃ "হে আল্লাহ! এই আজাব হতে একমাত্র আপনিই আমাকে নাজাত দিতে পারেন। হে প্রভু! আমি দুর্বল, সুতরাং বড় রকমের পরীক্ষা দেওয়া আমার জন্য দুরূহ। হে আল্লাহ! তিন চার দিন হলো এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে পারছি না, সুযোগও পাচ্ছি না। নামাযের সময় হলে রুকু-সিজদা ব্যতীত শুধু ধ্যানের মাধ্যমে আপনাকে স্মরণ করছি। হে আল্লাহ! এই স্মরণের মাধ্যমে আপনার সাথের সম্পর্কটুকু অটুট রাখুন। আমাকে মুসলমানদের কাছে চলে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিন।

পরবর্তী হাজিরা পর্যন্ত আমার পিতা ঝিলামেই অবস্থান করলেন। আমাকে যে দোতলা বাড়ীতে এনে উঠানো হয়েছিল, চার দিন পর অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল, যা আমার আত্মীয়দের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। ঝিলাম নদীর পার্শ্বে একটি মন্দির। দূর থেকে আগত দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের নিকটে ভাল একটি অতিথীশালা রয়েছে। এ অতিথীশালায় আমাকে স্থানান্তর করা হল।

আমার পিতা একদিন আমাকে বললেন, চল বাজার থেকে ঘুরে আসি। তিন জন হিন্দু আমাদের সাথে ছিল। আমরা সকলেই একটি টাংগায় (ঘোড়ার গাড়ী) উঠে বসলাম, ঘোড়া ছুটলো চালকের নির্দেশে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে আল্লাহ

জানেন। বেশ কিছুক্ষণ পর টাংগা একটি অফিসের সম্মুখে এসে থামলো। অফিসের ভিতরে আমরা প্রবেশ করলাম। একজন ইংরেজ বসা ছিল সেখানে। সে একটা কাগজের মধ্যে কি যেন লিখে আমার পিতাকে দিল। আর তিনি কাগজটা পকেটে রেখে পকেট হতে কিছু টাকা বের করে তার হাতে দিলেন। সম্ভবত নজরানা। আমার আব্বাই বললেন, এ ইংরেজ হলো জিলা স্বাস্থ্য অফিসার, অনেক বড় ডাক্তার। তিনি লিখে দিলেন তুমি এখনও নাবালেগ। এরপরও যদি তুমি জজ সাহেবের আদালতে আমার সাথে যেতে অস্বীকার কর, তাহলে আইন অনুযায়ী তোমাকে আইনের হেফাজতে রাখা হবে। আইনের হেফাজত হল জেলখানার একটি স্থান। সেটাকে জেলই বলে। আমরাও সেখানে থাকবো না, মুসলমানরাও থাকবে না। সেখানে তোমাকে ধুকে ধুকে তিলে তিলে মরতে হবে। আমি ঘাবড়ে গেলাম। হে আল্লাহ! আমি কি করবো। জেলেই তো থাকতে হবে। আল্লাহ কোন পথ আপনি বের করে দিন। আর আমার মা তো প্রত্যেক দিন কাঁদতেন, আর বুঝাতেন। মনে মনে কেবল দোয়া করতে থাকলাম।

আদালতের দ্বিতীয় হাজিরার একদিন পূর্বে সকাল বেলা ৪/৫ জন মোটা-তাগড়া হিন্দু আমার নিকট এলো। আব্বা আমাকে বললেন, প্রস্তুত হও বাইরে যেতে হবে। তারা আগে পিছে আমি মধ্যখানে চললাম বাইরে অজানা উদ্দেশ্যে, অজানা গন্তব্যে। আজও টাংগায় চললাম। টাংগা আজ আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে থামলো। আমি আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম আজ আদালতে আসলেন কেন? আমাদের হাজিরাতো আগামীকাল!

আমার আব্বা প্রায় শান্ত ও স্থির প্রকৃতির লোক। সহসা রেগে উঠেন না, ক্ষুব্ধও হন না। কঠোর কাজও নরমভাবেই সমাধা করতে পারেন। জবাব দিলেন, আমাদের হাজিরা আগামীকালই, তবে আজ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে জজের কাছে আসতে হল। চল, আগে চল, আমরা জজ সাহেবের আদালত কক্ষে গেলাম। জজ সাহেব পূর্ব হতে তার বিচারাসনে উপস্থিত ছিলেন। জজ সাহেব আজ আমাকে কোন প্রশ্নও করলেন না, কিছু বলতে সুযোগও দিলেন না। একতরফা ভাবে আমার আব্বাকে লক্ষ্য করে বললেন, ছেলেটি দুই বছর আপনার হেফাজতে থাকবে। তারপর তার যেখানে ইচ্ছা যাবে। আপনি জামানতের কাগজ-পত্র প্রস্তুত করে দিন।

তখন আমার বুঝতে বাকি রইলো না যে তারিখের একদিন পূর্বেই তারা তাদের অনুকূলে রায় করিয়ে নিলেন। পাছে তারিখের দিন মুসলমান উকিলরা ও মুসলমান জনসাধারণ ব্যাপকভাবে আদালতে উপস্থিত হয়। সে কারণে একদিন পূর্বেই তারা এই চতুরতা করলো। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করলো মাত্র কয়েকটি টাকার জন্য আপনি ইনসাফকে এভাবে হত্যা করলেন। হত্যা করলেন একটি ঈমানের অংকুরকে। অথচ আপনিও নাকি একজন মুসলমান! কিন্তু তাকে কিছু বলতে ঘৃণা হলো। ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম জজ সাহেবের দিকে।

লোকটি জজ-বিচারক। সুবিচার তার পদদলিত হচ্ছে। ইসলাম তার কাছে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে! ইসলামের নবী বলেছেন, হে আলী! কোন ব্যক্তি যদি তোমার কারণে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে প্রস্তুত হয়, এর মোকাবিলায় সারা পৃথিবীর রাজত্বও তুমি গ্রহণ করো না। অথচ এ লোকটি কয়েকটি টাকার

বিনিময়ে ইসলাম বিক্রয় করে দিল। আদালতের রায় মাথায় বহন করে আমরা মন্দিরের অতিথিশালায় এলাম। মা বাড়ি যাওয়ার জন্য তার সামানপত্র গুছিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বাড়ি চলে যাবেন, আব্বা মাকে ও আমার ছোট ভাইকে বাসে তুলে দিবেন, তারা চলে যাবেন।

মায়ের উপদেশ ঃ

মা যাওয়ার সময় তার আচল দ্বারা চোখ মুছতেছিলেন আর বলতেছিলেনঃ বেটা, তোমাকে ভগবানের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে গেলাম! অশুরের দিকে তাকিয়ে তোমার পিতার সব কথা মান্য করে চলবে। তাকে সব বিষয়ে খুশি রাখতে সচেষ্ট থাকবে। আমার এই অশ্রুজলের কদর করো। সারাজীবনই তোমার অনুগৃহী হয়ে থাকবো।

মা তার হাত জোড় করে দিলেন। আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। মা আপনি এমন করবেন না। আপনি আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করবেন না। আপনার জুতা মাথায় রাখতে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। আপনি আপনার কথা ব্যক্ত করলেন, আমার অক্ষমতার বিষয়ে একটুও বিবেচনা করলেন না। আপনি অনেক কিছুর সাক্ষী। আমি শুধু মনের ইচ্ছা বা কল্পনা পূরণে একাজ করিনি। আপনার ও আমার সৃষ্টিকর্তার কৃপায় ও ইচ্ছায় আমি একাজ করেছি। অন্যথায় এত ছোট্ট বয়সে এত বড় কাজ আমার দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হতো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনার ছেলে, আমি একথা ভুলবো না, আপনিও ভুলবেন না। আমি এক অজানা ও কিনারাহীন সমুদ্র পাড়ি দিতে যাচ্ছি। এটা ছিল মায়ের কাছে শেষ নিবেদন। বাস স্টার্ট দিল এবং তারা চলে গেলেন।

আমাদের থাকার জায়গায় এসে দেখি আব্বাও তার সামানপত্র গোছগাছ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? আব্বা কোন জবাব দিলেন না। আব্বার মুখে কঠোরতার লক্ষণ ফুটে উঠলো। আমি হয়রান হয়ে গেলাম, পরবর্তী গন্তব্য যে কোথায় তা আমাকে জানানো হচ্ছে না। অজানা আতংকে মনটা কেঁপে উঠলো। আল্লাহর উপর ভরসা করে মনে সান্তনা গ্রহণ করলাম। মাকে বাসে তুলে বিদায় করে দিয়ে আসার পর মনে হচ্ছিল, আমার সকল অনুভূতি লোপ পেয়ে গিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হয়ে গেলাম। হঠাৎ একটি গায়েবী শব্দ শুনতে পেলাম। ধৈর্য ধারণ করে স্থির থাকা মুসলমানদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য। রাহমাতুল্লিল আলামীনের এই বাণী কি তোমার পথ নির্দেশের জন্য যথেষ্ট নয়? আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় না হই। মনে অশান্তির ঝড় বইতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে মনের দোদুল্যতা স্থির হল! কি অমীয় বাণী শুনলাম। অন্তরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল "রাহমাতুললিল আলামীনের পদতলে স্থান পাওয়ার জন্য আমি জীবনের সবকিছুকে উৎসর্গ করতে পারবো।" আমার মন এত স্থির ও এত শান্ত হলো যে, এক মা ও এক বাবা নয়; শত শত মাতা, শত শত পিতাও নবীজীর (সাঃ) জন্য আমি উৎসর্গ করতে পারবো।

লাহোর যাত্রা ঃ

শয়ন কক্ষে আমার পিতা ও এক চাচা সামানপত্র গোছগাছ করছিলেন। আমি আব্বাকে বললাম, আমরা কোথায় যাব? আব্বা বললেন, লাহোর। তোমাকে লাহোরে তোমার চাচার বাসায় রেখে যাব। তুমি এখন থেকে সেখানেই লেখাপড়া করবে। তোমাকে সেখানে রেখে আমি কাশ্মীর চলে যাব। আমি মনে মনে খুশী হলাম। সুযোগ বুঝে আমি লাহোর হতে পালাব এবং বুঝালের মুসলমানদের নিকট চলে যাব। আমরা প্রস্তুত হয়ে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে লাহোরের বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমরা দাঁড়িয়েই ছিলাম, হঠাৎ মুহাম্মদ সাদেক আমার নিকট ছুটে এসে বললো, মাওলানা সাহেব তোমাকে ডাকছেন। মাওলানা সাহেবের কথা শুনে আমার দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো। আমিও চলে গেলাম। মাওলানা সাহেব ও সূফী জান মুহাম্মদ সাহেব বাস স্ট্যান্ডের অদূরে একটি হোটেলে বসা ছিলেন। সেখান থেকেই তারা আমাকে দেখতে পেয়ে মুহাম্মদ সাদেককে পাঠালেন আমাকে ডেকে নিতে। প্রথম দিন ঝিলামের আদালতে হাজিরার পর হতে মাওলানা সাহেবের সাথে আমার আর দেখা হয়নি। আমাকে যখন হিন্দুরা জোরপূর্বক গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেল তখন মাওলানা সাহেব ও অন্যান্য মুসলমানরা তা স্বচক্ষেই দেখেছেন। এরপর তারা জানতে পারেননি আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই তারা বিফল ও নিরাশ হয়ে বুঝালকালায় চলে গেলেন। বুঝালকালার মুসলমানরা জানতে পারলো গাজী আহমাদকে হিন্দুরা জোর করে নিয়ে গিয়েছে। মাওলানা সাহেব জেনে গিয়েছিলেন আদালতের পরবর্তী তারিখের কথা। তাই তিনি বললেন, দশদিন পর পুনরায় হাজিরা, জজ সাহেব যদি সেদিনও গাজী আহমাদকে তার পিতার হাতে সোপর্দ করে দেন তাহলে তার অবস্থা যে কি হবে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। বুঝালের মুসলমানরা এ সংবাদ জেনে খুবই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলেন। তারা মাওলানা সাহেবকে বললেন, আপনিতো আমাদেরকে ঝিলাম যেতে বিরত রাখলেন। আমরা সেখানে থাকলে আমাদের প্রাণের বিনিময়ে হলেও গাজী আহম্মাদকে হেফাজত করতাম। লোকেরা উত্তেজনার সাথে বললেন, আগামী হাজিরার দিন আমরা অবশ্যই ঝিলাম যাব, আপনি বাঁধা দিবেন না। মাওলানা সাহেব বললেন, ঠিক আছে।

এটা ছিল আদালতের নবম দিনের কথা। যেদিন ঝিলামের বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো অবস্থায় মাওলানা সাহেব আমাকে দেখে ফেললেন। মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব সূফী জান মুহাম্মদ সাহেব ও মুহাম্মদ সাদেককে নিয়ে আগের দিনই ঝিলাম চলে এলেন। মামলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও পরামর্শ করার জন্য। তারা বাস থেকে নেমে বিকেল বেলা একটি হোটেলে বসা ছিলেন। আর আমরা চলে যাওয়ার জন্য লাহোরের বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি মাওলানা সাহেবের সাথে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করছিলাম, এমনি সময় আমার চাচা আমার দিকে দৌড়ে এল। মাওলানা সাহেবের সাথে তেমন কোন আলোচনাও করতে পারলাম না। মাওলানা সাহেব বললেন, মনে হয় তোমার কোন আত্মীয় এদিকে আসছে। তুমি চলে যাও পরে সুযোগ পেলে এসো। মাওলানা সাহেব জানতে পারলেন না, অবস্থার কি ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমার পিতা শিক্ষিত ও খুবই চতুর। হিন্দু উকিলদের সাথে

পরামর্শ করে জজ সাহেবকে রাজী করে তারিখের একদিন পূর্বেই তারা তাদের পক্ষে রায় করিয়ে নিলেন এবং মাওলানা সাহেব ও বুঝালের মুসলমান পুনরায় ঝিলাম আসার পূর্বেই আমাকে নিয়ে ঝিলাম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সেই কারণেই নবম দিনের বিকাল বেলা লাহোর চলে যাওয়ার জন্য আমাকে নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে আসেন। আর এখানে ঘটনাক্রমে মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা হয়ে যায়।

আমাদের বেশীক্ষণ বিলম্ব করতে হলো না। কিছুক্ষণ পরই লাহোরের বাস এসে গেল। আমার আব্বা ও চাচা আমাকে বাসে তুললেন। সাথে স্থানীয় কয়েকজন হিন্দুও ছিল। তারা অবশ্য বাসে উঠলো না। আমাদের বাস ছেড়ে দেয়ার পর তারা চলে গেল। বাসে বসে আমি উদাস হয়ে জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। সম্ভবত এক অনিশ্চিত জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যথাসময়ে আমাদের বাস লাহোর পৌঁছল। লাহোরে আমরা আমার চাচার বাসায় উঠলাম। মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব দেখলেন আমাকে বাসে তোলা হলো, আর বাস ছেড়ে চলে গেল। মাওলানা সাহেব যেহেতু আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তাই তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। আদালতেরই এক ব্যক্তির নিকট হতে তিনি এটুকু জানতে পারলেন, আজ গাজী আহমাদকে আদলতে পেশ করা হয়েছিল। তাকে তেমন কোন কথা বলতে দেওয়া হয়নি। তার পিতা তাকে আগের দিনের মত নিয়ে যায়। গাজী আহমাদ তার ইসলাম ধর্মের উপর অটল থাকার কথাই ব্যক্ত করে। তার পিতা তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে, তা আমি বলতে পারবো না।

মাওলানা সাহেব রাত্রে ঝিলামেই রইলেন। পর দিন সকালে পূর্বের পরামর্শ মত বুঝালের আটাশ/ত্রিশ জন মুসলমান ঝিলামের আদালতে এসে পৌঁছলেন। তারা হিন্দুদের কুট চাল আর জজ সাহেবের আচরণ শুনে নিরাশ হলেন। একজন হিন্দু উকিল এমন মিথ্যা কথাও বললো, ছেলেটি তার পিতার পক্ষে আদালতে বয়ান দিয়ে বলেছে "আমি মুসলমান হয়ে ভুল করেছি। আজ থেকে আমি পূর্বের ধর্মে ফিরে গেলাম এবং এখন থেকে আমি আমার পিতা-মাতার কাছে থাকবো। মাওলানা সাহেব বুঝাল থেকে আগত লোকদেরকে বললেন, আপনারা চলে যান। আমি প্রকৃত অবস্থা অবহিত হয়ে তারপর আসবো।

মাওলানা সাহেব আরেকজন মুসলমান উকিলের সাথে দেখা করলে তিনি বললেন, হিন্দু উকিল মিথ্যা বলছে। গাজী আহমাদের ইচ্ছার পরিবর্তন হয়নি। সে ইসলাম ধর্মের উপর অটল রয়েছে। জজ সাহেব কোন শুনানির সুযোগ না দিয়ে এক তরফা রায়ে বলেছেন, তুমি এখনও নাবালেগ। তোমার বালেগ হতে আরো দু' বছর লাগবে। এই দু' বছর তোমাকে তোমার পিতার নিয়ন্ত্রণেই থাকতে হবে। তারপর যেথায় ইচ্ছা তুমি যেতে পারবে। মাওলানা সাহেব আমার মনের দৃঢ়তার কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন এবং ইসলামের উপর অটল থাকার জন্য দোয়া করলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছেন, আমার পিতা লাহোরের টিকেট ক্রয় করেছেন। তাই তিনিও পরের দিন বাসে লাহোর পৌঁছে আমাকে খুঁজতে থাকলেন। এত বড় শহর, এত লোক, ঠিকানা ব্যতীত কাউকে খোঁজে বের করা অসাধ্য। হিন্দু প্রধান

এলাকায় চার/পাঁচ দিন অনবরত খোঁজে আমাকে না পেয়ে নিরাশ হয়ে বুঝাল চলে গেলেন। আমরাতো ঝিলাম থেকে বিকালে রওয়ানা হয়ে রাত্রে লাহোর পৌঁছে ছিলাম। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি লাহোরের অনেক আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত। তারা আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। কেউ ঠাট্টা-টিপ্পনীও করলো। "এ যে এক মহা ধর্মানুসন্ধানী। গোত্রের মান-সম্মান ডুবিয়ে বুজুর্গ বনতে চান।" এমনি আরো অনেক কথা বলতে লাগলো। একজন বললো, মুসলমানদের নিকট তুমি কি পাবে, তারা তো নিজেরাই দ্বারে দ্বারে ফিরে? সকলের কথা নীরবে শুনে বললাম, আমি যা করেছি সঠিকই করেছি তোমাদের তা বুঝবার প্রয়োজন নেই। আমার পিতা আমাকে কয়েকদিন নিরীক্ষণ করলেন। আমার অবস্থা দেখে তিনি আশ্বস্ত হতে না পেরে লাহোরে আমাকে পড়াবার ব্যপারে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। বললেন, একে লাহোর স্কুলে ভর্তি করলে সে চিঠি লিখে বুঝালের কোন মুসলমানকে ডেকে আনবে অথবা নিজেই পালিয়ে বুঝাল চলে যাবে। আমার অনভিজ্ঞতা ও কুটকৌশল না জানার কারণে আমাকে অনেক যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। আমার সততা আমার কষ্ট আর বিড়ম্বনাই বৃদ্ধি করেছে। কপটতা করে আমি যদি এমন ভাব প্রকাশ করতাম যে, আমি সত্যিকার ভাবেই ইসলাম ধর্ম পরিহার করে হিন্দু ধর্মে ফিরে এসেছি অথবা আমার পিতার নিকট যদি বলতাম, আমি আর আপনাদের ছেড়ে যাব না, তাহলে আমার পিতা লাহোরে কোন হিন্দু স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তিনি কাশ্মীর চলে যেতেন। আর আমি সময় বুঝে পালিয়ে বুঝাল চলে আসতে পারতাম।

কিন্তু আমি তা করিনি। তখন আমার মনের অবস্থা এমন ছিল যে, আমার মুখ দিয়ে এমন কথা বের করা সম্ভব ছিল না যে, আমি ইসলাম ধর্ম বর্জন করেছি। এই বিশ্বাস আমার অন্তরের গভীরে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল। আমি যদি তখন কপটতা বা কৌশলমূলক এই বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কথা ব্যক্ত করতাম, তাহলে পরবর্তীকালে আমার আক্ষেপের অন্ত থাকতো না। যদিও আমাকে একটি নির্যাতনের সমুদ্র পার হয়ে আসতে হয়েছে। আমার ঈমান আগুনের কুন্ডে নিক্ষেপ করে আমাকে সীমাহীন কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমি আমার বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কথা বলিনি, তাই পরবর্তীকালে আমার নিকট প্রশান্তিই অনুভব হয়েছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও পরম আস্থা ছিল যে, আল্লাহ অবশ্যই পথ খুলে দিবেন। আমি যদি ধৈর্য ধারণ করে কিছুদিন নির্যাতন ভোগ করতে থাকি তাহলে আল্লাহর সাহায্য অচিরেই আমি পাব, যেমন পেয়েছিলেন বিলাল হাবশী (রাঃ) ও সুহাইব রুমী (রাঃ)।

আমরা যখন লাহোর পৌঁছলাম, তখন আমাদের এক আত্মীয়ের বিবাহের আয়োজন চলছিল। বরযাত্রী লাহোর থেকে মুলতান যাবে। আমার পিতাও এ বিবাহের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তাই তাকেও বরযাত্রীর সাথে মুলতান যেতে হলো। বলা বাহুল্য, তিনি আমাকেও সাথে নিয়ে গেলেন।

বিবাহ বাড়ী গিয়ে আমার পিতা গোত্রীয় মুরুব্বী হিসাবে বিবাহের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর আমি একটি কক্ষে নীরবে বসে রইলাম। টেবিলে কাগজ-কলম রাখা ছিল।আমি সুযোগকে গনিমত মনে করে মাওলানা আবদুর রউফ সাহেবকে পত্র লিখতে শুরু করলাম।

জনাব, আপনি আমার বিষয়ে মনে কোন দ্বিধা আনবেন না। আলহামদুল্লিাহ! আমি ঈমানের উপর অটল রয়েছি।সুযোগের অপেক্ষা মাত্র, সুযোগ পাওয়া মাত্রই আপনার কাছ চলে আসব।

আব্বা যদিও বিবাহানুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আমার ব্যাপারে উৎকণ্ঠা ছিল প্রচুর। তাই তিনি একবার আমার খোঁজ নিতে এলেন। তখন আমার পত্র লেখা শেষ। আমি পত্রটি ভাজ করে পকেটে রাখছিলাম, এতেই আব্বা অনুমান করে নিলেন, আমি পত্র লিখেছি।

তবে আব্বা আমাকে পত্র সম্পর্কে কিছু না বলে কৌশল অবলম্বন করে তিনি আমাকে বললেনঃ "গোসল করে নাও"। আমি সরল মনে তার কথামত জামা খুলে গোসল খানার বাইরে দেয়ালে লটকিয়ে রেখে গোসল খানায় প্রবেশ করলাম। আর এদিকে আব্বা জামার পকেট হতে পত্রটি হাতিয়ে নিলেন। নিজে পড়লেন, চাচাকে পড়ালেন। এরপর বললেনঃ আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, তার পলায়নের ইচ্ছা এখনো রয়েছে।

আমি গোসল সেরে বাইরে এলাম।এক সুযোগে আমার লেখা পত্রটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেনঃ "নির্লজ্জ! এখনও তোমার হুঁশ হল না? আমার মান-সম্মান ধুলিসাৎ করে দিলে। তারপরও তোমার চেতনা ফিরে এলোনা। আমাকে আরো কঠোর হতে বাধ্য করো না। আগামীতে যদি এরূপ কিছু করতে দেখি, তবে জানে খতম করে দিব। এখনো সময় আছে নিজেকে শুধরিয়ে নাও।

আব্বার ভর্ৎসনা নীরবে শুনতে হলো। নিজের বোকামির খেসারত দিতে হলো চরমভাবে। আমাকে কড়া নিয়ন্ত্রণে ও চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। একা থাকা ও কোথও যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আব্বার মেযাজ সম্পর্কে আমার জানা ছিল। তিনি সহজে রাগ হতেন না। তবে কখনও রাগ হলে চরমে পৌঁছে যেতেন। একবার যদি প্রহার করতে আরম্ভ করতেন তাহলে অর্ধমৃত করে ছাড়তেন।

মূল বিবাহের যাবতীয় কাজ সমাধা করার পর আমরা লাহোর ফিরে এলাম। লহোরে দু'দিন চাচার বাড়ীতে থাকার পর তৃতীয় দিন বিকালের দিকে আব্বা বললেনঃ "জামা-কাপড় গুছিয়ে নাও। আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। বিকালের দিকে আমরা যাত্রা করলাম। জানতে পারলাম, এবার যেতে হবে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। বাস যোগেই আমাদের সফর চললো। মধ্যরাত পর্যন্ত আমরা জম্মু পৌঁছলাম। বাকী রাত আমরা একটি মুসাফির খানায় যাপন করলাম। জম্মুতে আব্বার খুবই পরিচিতি ছিল। সকাল বেলা তিনি আমাকে এক পুরোহিতের বাড়ী নিয়ে গেলেন। দু'দিন আমরা পুরোহিতের আশ্রমে অতিবাহিত করলাম। করজোড় করে আব্বা পুরোহিতের নিকট আমার সব কথা নিবেদন করলেন। পুরোহিত আমাকে কয়েকটি প্রচার পত্র ও পুস্তিকা পড়তে দিলেন। পুস্তিকাগুলোর একটি ছিল স্বামী দয়ানন্দের 'সত্য প্রকাশ' নামক একটি পুস্তিকা। দয়ানন্দ তার এই পুস্তিকায় পবিত্র কুরআনের সূরার সংখ্যা অনুযায়ী একশ, চৌদ্দটি আপত্তি করেন।

তার আপত্তির ধরন, যেমনঃ কুরআন শুরু করা হয়েছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দ্বারা। স্বামী সাহেব আপত্তি করেছেন এই প্রারম্ভ পদ্ধতি সঠিক হয়নি। কেননা, বলা হয়েছে আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি অতীব দয়াময় ও দয়ালু।

স্বামীজীর কথা হলো যদি এভাবে বলা হতো "আমি আমার নিজের নামে শুরু করছি" তাহলে সঠিক হতো। আর যে কিতাবের (স্বামীজীর জ্ঞান অনুযায়ী) প্রারম্ভই সঠিক নয়, তা কখনও প্রতিপালকের কিতাব হতে পারে না। গাজী আহমাদ বলেন, "আমি প্রথম অধ্যায়টি পড়েই পুরোহিতকে বললামঃ

জনাব, যদিও আমি নও-মুসলিম, ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার সুযোগ এখনো পাইনি, তবুও বলবোঃ স্বামীজীর প্রশ্ন ও আপত্তি ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতা প্রসূত। আল্লাহ তাআলা এই কিতাব নিজের জন্য অবতীর্ণ করেননি, বরং এটি অবতীর্ণ করেছেন বান্দাহর জন্য। এখানে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে বান্দাদেরকে যে, তোমরা বল-"আমরা মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি"। কাজেই এভাবে আরম্ভ করাই সঠিক হয়েছে। অন্যভাবে আরম্ভ করলে সঠিক হতো না।

আমার কথা শুনে পুরোহিতজী নীরব ও লা-জবাব হয়ে গেল। সুতরাং এ ব্যাপারে কোন কিছু না বলে অন্য প্রসঙ্গে বলতে লাগল ঃ আমি তোমাকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলবো।

স্বামীর পুস্তিকাটি ধারাবাহিকভাবে পাঠ করলাম। এতে বুঝা গেল, আরবী সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই। উর্দূ অনুবাদ দেখে প্রসঙ্গ আর প্রেক্ষাপট না বুঝেই কুরআন মজীদের উপর আপত্তি করেছে, যা একেবারেই নিরর্থক, অজ্ঞতা প্রসূত ও হাস্যকর। পরবর্তী সময়ে দেখলাম, মাওলানা সানাউল্লাহ অ মৃৎস্বরী স্বামীজীর প্রশ্নগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আরেকটি তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন।

আমি পুরোহিত সাহেবকে তানাসুখ 'মৃত্যুর পর আত্মার দেহ পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। সে বলল ঃ "পাপী মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তাদের আত্মাকে চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। কুকুর, শিয়াল, গাধা ইত্যাদি যেসব জন্তু আমরা দেখি, আসলে এগুলোর মধ্যে সেসব মানুষের আত্মা রয়েছে, যারা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণকারী ও অবাধ্য। পূর্ব জন্মে এই আত্মাগুলো মানুষের মধ্যে ছিল। পাপের কারণে শাস্তি স্বরূপ পূনর্জন্মে তাদেরকে জন্তুর আকৃতিতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমি পুরোহিত সাহেবকে বললাম ঃ আপনার দরজার বাইরে যে কুকুরটি শুয়ে থাকে, আপনার বিশ্বাস মতে এর আত্মাটি পূর্ব জন্মে কোন মানুষের দেহে ছিল, শাস্তি স্বরূপ এই কুকুরটির মধ্যে বন্দী করে দেয়া হয়েছে। এই আত্মাটি কি একথা অবহিত হতে পেরেছে যে, তাকে তার কোন পাপের শাস্তি স্বরূপ এই কুকুরের দেহে পুরে দেয়া হয়েছে? আর এটা নিশ্চিত যে, তা জানানো হয়নি। তাহলে অজান্তে ও পাপ সম্পর্কে অবগত না করিয়ে শাস্তি দেয়াটা কিরূপ ইনসাফ? আপনি সেই ভাগবানকে ন্যায়পরায়ন ও সুবিচারক বলতে পারেন, যে অপরাধীকে তার অজান্তে ও অপরাধ না জানিয়ে শাস্তি দিতে থাকে? এরই মধ্যে আমার আব্বা আমাদের কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন পুরোহিত সাহেব বললেন ঃ জনাব! আপনার পুত্রের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। এতদিন মুসলমানদের মধ্যে থাকার কারণে তার মন-মগজ আর পথে নেই। অন্য পথে অনেক অগ্রসর হয়ে হয়ে গিয়ছে। আব্বা বললেন ঃ "আমি ঠিক করে নিব"।

জম্মুতে আমরা দু'দিন রইলাম। তখন আমার পেটে ব্যথা সৃষ্টি হলো। আমি

বাথরুমে বসে মাওলানা সাহেবকে একটি পত্র লিখেছিলাম। কিন্তু রাত্রে ঘুমিয়ে থাকার সময় সম্ভবত আমার পকেট তল্লাশী করে আব্বা পত্র খানা নিয়ে নিলেন। পরে যখন পকেটে পত্রটি পেলাম না, তখন বুঝলাম আমার উপর এবার বড় ধরনের শাস্তি আপতিত হবে।

পেট ব্যথায় দু'দিন খুবই কষ্ট পেলাম। তারপর একটু সুস্থ হলে একদিন আব্বা সকালে বললেনঃ সামান-পত্র ও জামা-কাপড় গুছিয়ে নাও। আমরা চলে যাব। প্রায় ভোরে ভোরেই আমরা বাসে আরোহন করলাম। জম্মুর পর পহাড়ী পথ। সড়ক সাপের ন্যায় বাঁকা হয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। পাহাড়ের উঁচু উঁচু চূড়াগুলো যেন বরফের পোশাক পরিধান করে আছে। দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও দৃষ্টি নন্দন। পর্বত শৃঙ্গের পাদদেশে সবুজ আর সবুজ। যেন দিক-দিশা হীন সবুজ বন আর বন। পাহাড় চূড়ার বরফ গলার পানি ঝর্ণায় প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, যার মন-মাতানো শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। হাজারো পাখীর সুরেলা কণ্ঠের গুঞ্জনে সারা কোহেস্তানকে মুর্চ্ছনা দিয়ে রেখেছে। গগন ছোয়া পর্বত শৃঙ্গরাজি দেখে মনে হয় যেন ভূমি আর গগনের সিঁড়ি হয়ে আছে। বাসের জানালায় বাইরের দিকে তাকিয়ে এসব দৃশ্য চোখ ভরে দেখছি। এরূপ দৃশ্য কখনও তো দেখিনি।

আনন্দ মনের একটি অবস্থার নাম, যা পারিপার্শ্বিক কারণে মনে সৃষ্টি হয়। তারপর তা বাইরে প্রকাশ পায়। কিন্তু মনে যখন কোন বিষাদ-যাতনা অথবা কষ্ট-ক্লান্তি থাকে, তখন আনন্দদায়ক বস্তুও মনে আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না; বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা মনে যাতনা বৃদ্ধিরই কারণ হয়।

তাই ভূ-স্বর্গ নামে খ্যাত কশ্মীরের পাহাড়ী এলাকার এই মনোরম ও নয়ন জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার মনে কোন প্রকার আনন্দ সৃষ্টি করতে পারছে না, বরং কেবল যাতনাই বৃদ্ধি করছে। এই সারি সারি সুউচ্চ পাহাড়, পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের বন্যা, এই মনোরম দৃশ্য মহান আল্লাহর সৃষ্টি , তারই অনুপম কারুকর্য-সেই আল্লাহর তাওহীদ গ্রহণ করায়, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ায় আজ আমাকে যাতনা দেয়া হচ্ছে, বাঁধা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহর সাথে শিরক করার জন্য, অসত্য ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জানিনা কোন্ অজানা নির্যাতন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। অজানা অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিরক্তি, আতংক ও যন্ত্রণা-যাতনায় মন বিদগ্ধ হচ্ছে। মনে আনন্দ সৃষ্টি হওয়া এই অবস্থায় সম্ভব নয়। তাই বিষণ্ন মনে বাসে বসে রয়েছি। আমার বাইরের অবস্থাটা আমার আব্বার দখলে, আর ভিতরের অন্তরটা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কি অবস্থা যে আমার ছিল , তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার জানা নেই।

সকালে বাসে বসে বিকাল পর্যন্ত 'বাটাটুত' নামক জায়গায় এলাম।এটাই বাসের পথের শেষ গন্তব্য। এখানে আমরা রাত কাটালাম। আমার আব্বার কর্মস্থল হল 'ভেদরাওয়া'। বাটাটুত থেকে ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূর। বাস বা টেক্সিতে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই, পায়ে হেটেই যেতে হয়। বোঝা ও বাসন পত্র থাকলে খচ্চরে বা ঘোড়ার পিঠে তা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

পরদিন সকালে আমাদের সামানপত্র একজন খচ্চর ওয়ালার নিকট সোপার্দ করে আমরা পিতা-পুত্র দু'জনে পায়ে হেটে রওয়ানা হলাম। রাস্তা খুবই বিপদজনক।

কোন কোন স্থানে পাহাড় কেটে বা ভেদ করে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়ের প্রান্ত দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে। অসতর্কতাবস্থায় রাস্তায় পা পিছলে গেলে শত শত ফূট নীচুতে গিয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকবে না। সকালে রওয়ানা করে বিকাল পর্যন্ত আমরা মাত্র বাইশ-তেইশ মাইল পথ অতিক্রম করলাম।

দৈহিক ক্লান্তিতে আমার অবস্থা খুবই দুঃসহ হয়ে গেল। আর মনের ক্লান্তি তো আগে থেকেই ছিল। রাত্রে চলা মোটেই নিরাপদ নয়। তাই একটি গ্রামে রাত্র যাপন করলাম। সকালে উঠে আবার রওয়ানা করলাম। আমার পা চলছিল না। কিন্তু তারপরও করার কিছুই ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়ে হাটতে হচ্ছিল। দুপুরে একটি ঝর্ণার পার্শ্বে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। তারপর আবার চলতে শুরু করলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভেদরাওয়ার কাছাকাছি একটি গ্রামে পৌছলাম। দ্বিতীয় রাতও পথে কাটাতে হল। তৃতীয় দিন আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছলাম।

পিতার কর্মস্থল ঃ

পায়ে হাঁটার তৃতীয় দিনে আমরা আব্বার কর্মস্থল ভেদরাওয়ায় পৌছলাম। সেখানে পৌছার সাথে সাথে আব্বা হরেকৃষ্ণ এন্ড কোং এর প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিতি রিপোর্ট করলেন। কার্যালয়ের প্রধানকে আমার সব অবস্থা জানালেন। তিনি এই বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন যে, আপনার ছেলে আপনি ফেরত পেয়েছেন এবং সাথে করে নিয়েও এসেছেন। কোম্পানীর একটি রেষ্ট হাউজে আমরা রাতে অবস্থান করলাম।

সকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর আব্বা বললেন, একটু দূরে ভাল পানির ঝর্ণা রয়েছে, চল ওখান থেকে গোসল করে আসি। ক্লান্তি দূর হবে। পুরোহিত শ্রেণীর এক ব্যক্তি আমাদের সাথে গেল। ঝর্ণাটির নিকট যাওয়ার পর আব্বা পুরোহিতের সাথে কথা বলতে লাগলেন। আমার মামলা সম্পর্কিত বিষয়ে আলাপ করছিলেন। আব্বা আমাকে বললেন, তুমি একটু ওদিক থেকে ঘুরে আস। সম্ভবত আমি হাটতে হাটতে খানিকটা দূরে পৌছে গিয়েছিলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি, আর আল্লাহর কুদরতের কথা ভাবছি। অনুমান আধা ঘন্টা পর আব্বার কণ্ঠ শুনলাম-এদিকে আস।

বললেনঃ আমাদের অবস্থান হতে প্রায় এক কিলোমিটার নীচ দিয়ে এই যে একটি পাহাড়ী নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার নিকট কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করব, জবাবে যদি কোন প্রকার মিথ্যার মিশ্রণ পাই, তাহলে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ঐ নদীতে ফেলে দিব। আমার প্রথম ও শেষ কথা, মন-মস্তিষ্ক হতে সব আবর্জনা দূর করে দাও।

আমি বললামঃ দু'তিন মাস হল আমি আমার মন-মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে নিয়েছি। আব্বা সম্ভবত আমার কথার ইঙ্গিত বুঝে নিয়েছিলেন, তাই আর কোন কথা না বলে হাতে একটা ছড়ি নিয়ে বেধড়ক পিটাতে আরম্ভ করলেন। আমি বেত্রাঘাতের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু কে আসবে এগিয়ে? পার্শ্বের পুরোহিত তাকিয়ে দেখতে থাকলো। বেত্রাঘাত যখন মাত্রাতিরিক্ত হতে লাগল, তখন তিনি এগিয়ে এসে আব্বাকে নিঃস্কৃত করতে চাইলেন, কিন্তু আব্বা রাগের প্রচন্ডতায় তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়ালেন।

আমি বুঝতে পারলাম আজ আমার উপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শাস্তি নেমে এসেছে। হযরত বিলাল (রাঃ) আর আম্মার (রাঃ) এর অবস্থা আমার উপর আপতিত হচ্ছে। উরু আর পায়ের গোছাতেই অধিক বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। চামড়া ফেটে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। পাজামা সম্পূর্ণ ভিজে গেল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। এবার বুকে, মুখে এবং মাথায় পিতা মহোদয়ের বুটের লাথি আর আঘাত চলতে লাগল। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। এভাবে তার মনের জিদ যতক্ষণ না মিটল, ততক্ষণ মারতে লাগল। আমি ভূলুণ্ঠিতই রইলাম। একটু পরে হুংকার দিয়ে বললেন, রে কুত্তা! চলে যা, আমার সামনে থেকে চলে যা। যেখানে ইচ্ছা ধ্বংস হয়ে যা! আমি নিথর অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিলাম।পুনরায় গর্জে উঠলেনঃ হারামজাদা শুনছিস না আমি কি বলছি? এখনই তুই এখান থেকে দূর হয়ে যা। আমি এতই মুমুর্ষু অবস্থায় ছিলাম যে, দুই তিনবার চেষ্টার পর কোনক্রমে উঠে দাঁড়ালাম। পঁচিশ-ত্রিশ পা এগিয়েছি মাত্র, এমন সময় আবার পিছন থেকে তীর্যক কণ্ঠ শোনা গেল। আরে হারামজাদা যাস কোথায়? এদিকে ফিরে আয়।

আমি ফিরে এলাম। তখনও নাক, মুখ দিয়ে লালা বেরুচ্ছিল। পিতা মহোদয় বললেন, আমি আজ শেষ ফয়সালা করতে চাই। কি ইচ্ছা এখন বল? আমি কিছু বলতে পারলাম না। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না? আমি চুপ করেই রইলাম।

তিনি আবার গালি দিয়ে বললেন, হারামজাদা! অন্তরের বক্রতা এখনো দূর হয়নি। এ কথা বলে সজোরে গালে থাপ্পড় দিতেই আবার জমিনে লুটিয়ে পড়লাম। বলতে লাগলেন, তুমি আমার ছেলে থাকার যোগ্য নও। আমার মান-সম্মান সব ডুবিয়েছ। গোত্র, এলাকা এমনকি আদালতে পর্যন্ত আমাকে চরম অসম্মান করেছ। তোমার জন্য এ পর্যন্ত পনের হাজার টাকা বরবাদ করেছি। তোমার মুসলমান জজ থেকে তোমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে রীতিমত ক্রয় করে এনেছি। তুই আমার দিকে তাকালি না, আমার কথা শুনলি না, তোকে আমি জীবনের জন্য ..... এই বলে তিনি আমাকে তুলে দাঁড় করিয়ে ধক্কা দিয়ে অর্ধ মাইল নীচ দিয়ে প্রবাহমান নদীতে ফেলে দিচ্ছিলেন, এমনই সময় অদূরে দাঁড়ানো পুরোহিত ব্যক্তিটি দৌড়ে এসে আমাকে টান দিয়ে একদিকে ফেলে দিয়ে আব্বার পা জড়িয়ে ধরলেন। লালাজী ভগবানের নাম নিচ্ছি, এটা করবেন না। অবুঝ ছেলে কিছুদিন পর বুঝে যাবে। ভগবানের নাম স্মরণ করে তাকে ছেড়ে দিন। এবার তার উপর দয়া করুন। তাকে যদি ঐ নীচের নদীতে ফেলে দেন তাহলে পরিনাম দু'জনেরই খারাপ হবে। আপনি তো কয়েক হাজার রূপী জামানত দিয়ে তাকে আদালত থেকে এনেছেন। আপনার হেফাজত করতে হবে।

আব্বা রাগে কাঁপছিলেন। ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় তিনি পাথরের উপর বসে পড়লেন। বসে বসেও তিনি গর্জন করছিলেন। না আমি আজ সমাপ্ত করবো। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের স্বাদ তাকে চাখিয়ে দিব। লোকটিকে বললেন, আপনি পা ছাড়ুন, আমাকে কিছুক্ষণ ভাবতে দিন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ

আব্বা বসে পড়ায় আমিও কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়ার ও চিন্তা করার সুযোগ পেলাম। মুখেতো কিছুই বলা ও ব্যক্ত করা সম্ভবই নয়, তবে নিঃশব্দে দয়াময় আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম।

ওগো আমার আল্লাহ! আমার অবস্থা আপনার সামনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আমার পিতা আমাকে নীচের ঐ নদীতে নিক্ষেপ করবে। আমার জীবন হয়তো শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মৃত্যুতে আমার কোন আপত্তি নাই।

হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুর পর আমাকে এই ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত মুখমন্ডল, ফেটে যাওয়া ঠোঁট, রক্ত মাখা পোষাক সহ তোমার হাবীবের সামনে পৌঁছে দিও। আমি তাকে বলবো, হে আমার মনিব! আপনি আমাকে ঈমানের যে আমানত দান করেছিলেন, আমি তার খেয়ানত করিনি। আমি নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণতো উৎসর্গ করেছি, কিন্তু খানায়ে কাবার দেয়ালের ছায়ায় যে আমানত বুকে ধারণ করতে বলেছিলেন, তা এখনো আমার বুকে বিদ্যমান রয়েছে। ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে আপনার নিকট পৌঁছেছি ইত্যাদি কল্পনা করছিলাম। এসব কথা কল্পনা করতে করতে যেন আমার মনের জোর বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে গেল। আমি মনের দিক থেকে সাহসী হয়ে উঠলাম। আব্বা ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিতে চান ফেলে দিন। কিন্তু আমি ঈমান ত্যাগ করব না। কল্পনা আমাকে নদীতেই ভাসাতে লাগল। মনে হচ্ছিল, আমি ভাসতে ভাসতে মদীনার দিকে যাচ্ছি। আমি আরো অনুপ্রাণিত হলাম, আমার মন আরো দৃঢ় হল। আরো শক্ত করলাম মনকে। ফয়সালা আমার অটল ও অপরিবর্তনীয়। মনে একটা মুখে আরেকটা এই ভূমিকায় যাব না। অন্যথায় নবীজীর (সাঃ) সামনে লজ্জা পেতে হবে। মুখ দেখাবার মত সুযোগ থাকবে না।

ক্ষতগুলোর চিকিৎসা ঃ

আমিতো নীরব নিথর অবস্থায় মাটিতে পড়াই ছিলাম। আবার পিতাজির গর্জন শুনলাম 'এদিকে আয়'। আমি কোন প্রকারে কাছে এলে বললেন ঃ পাজামা খুলে এই ধুতি পর। এই ঝর্ণায় গিয়ে হাত মুখ ধোও।

পাজামা খুলে ধুতি পরলাম। পাজামাটি পিতাজি নিজেই নিয়ে ঝর্ণায় ধুতে লাগলেন। ঝর্ণার পানি পাজামায় লাগা রক্তে লাল হয়ে গেল। মুখ হাত ধোওয়ার পর প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল রেস্ট হাউজে।

ডাক্তার ডাকা হল! ডাক্তার ক্ষতস্থানে বেন্ডিজ করতে লাগলেন। ঔষধ লাগাতে লাগলেন। ব্যথা উপশমের ঔষধ খাওয়ালেন এবং ঘুমের ঔষধও খাওয়ালেন। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। কয়েক ঘন্টা পর ঘুম ভাঙলো। চোখ খুলতে পারি না, ব্যথায় হাত পা নাড়তে পারি না। দেহের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা। এক গ্লাস গরম দুধ দেওয়া হল। উঠে কোন ভাবে দুধটুকু খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। উঠবার, বসবার, দাঁড়াবার, হাটবার, চলবার শক্তি দেহে ছিল না। আমার অবস্থা দেখে পিতাজিও কিছু বললেন না।

সারা দিন-রাত প্রায় শুয়েই রইলাম। সময় মত ঔষধ খাওয়ানো হলো। দুই দিন দুই রাত শুয়ে ঔষধ সেবনের পর কিছুটা সুস্থতা বোধ করতে লাগলাম।

মাওলানা সাহেবকে পত্র ঃ

তৃতীয় দিন স্বাস্থ্য কিছুটা ঠিক হয়ে এল। মুখের জখম ও ব্যথা কমেছিল, কিন্তু উরুর ক্ষত তেমন শুকায়নি,তাই তাতে ব্যথা ছিল বেশী। আব্বা মাঝে মধ্যে এসে আমার খোঁজ-খবর নিচিছলেন। একদিন সকালে অকস্মাৎ আব্বা কাগজ-কলম নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ এই নাও কাগজ-কলম। একটি পত্র লিখ। আমি বললাম, কি লিখবো? এরপর আব্বা যা লিখতে বললেন, তাতে আমার হাত নিথর হয়ে গেল। সাথে সাথে আব্বা নির্দয়ের মত আমার গালে এত জোরে এক থাপ্পড় কষলেন যে, কান ঝি ঝি করতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে লিখতে শুরু করলাম। চিঠিটা মাওলানা সাহেবের নিকট সংরক্ষিত ছিল, পরবর্তী কালে তিনি আমাকে তা দিয়ে দিলেন। চিঠিটা ছিল নিম্নরূপ ঃ

মৌলভী আঃ রউফ!

দেখ, আমি পরমাত্মার কৃপায় হারানো ধর্মে ফিরে এসেছি। এটা ভগবানের দয়া। অন্যথায় আমিতো একবার পবিত্রআত্মা ভ্রষ্ট করে ফেলেছিলাম। এরপর আমার আর ফিরে আসার আশা করো না। আমি তোমাদের সকলকে জেলে ঢুকাতে পারতাম, কিন্তু হিন্দু হওয়ার কারণে কৃপা করেছি। তাই আমার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। আগামীতে কোন হিন্দুকে মুসলমান বানাতে চেষ্টা করো না। আমি পরমাত্মার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আমাকে তোমাদের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। আমার যে কম্বল আর কোর্ট তোমার ঘরে রয়েছে, তা আমাদের মিয়ানীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও।

ইতি

কৃষ্ণলাল, ভেদরাওয়াহ।

ইনভেলপের উপর ঠিকানাও আমার দ্বারাই লিখালেন এবং পোস্ট করিয়ে দিলেন।

বিদ্যালয়ে ভর্তিঃ

এর দু'দিন পর আমার স্বাস্থ্য আরো একটু সুস্থ হলে আব্বা আমাকে ভেদরাওয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করে এই বিদ্যালয়ে আমার ভর্তির ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, তবে এর ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক বললেনঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্টাফ সবাই হিন্দু। আমি সকলকে লাইব্রেরীতে ডেকে বিষয়টি অবহিত করে ওর ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দিব। আব্বা বললেনঃ সাথে সাথে খেয়াল রাখতে হবে এ যেন মুসলমান ছাত্রদের সাথে মিলামেশা করতে সুযোগ না পায়। বিকাল বেলা আব্বা আমার জন্য বই-খাতা সহ প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনে নিয়ে এলেন। আমাকে নবম শ্রেণীতেই ভর্তি করানো হলো। স্কুলে যেদিন ভর্তি করানো হলো সেদিন বিকালে নতুন করে স্বাস্থ্য খারাপ হলো, প্রচন্ড জ্বর এলো। আমার জ্বরের কারণে আব্বা তার ডিউটিতে যাওয়া স্থগিত করে দিলেন। আমাকে সাথে করে নিয়ে আসার পর আব্বা আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয়ে পুনঃ যোগদান রিপোর্ট করেছিলেন মাত্র, কিন্তু তার কর্মস্থলে কাজে যোগদান করেননি। আমাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে আমার

থাকার ব্যবস্থা করে তারপর কাজে যোগদান করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নতুন করে আমার জ্বর আসায় কাজে যোগদানে বিলম্ব করলেন।

আমার সুস্থ হতে আরো দশদিন লেগে গেল। সুস্থ হওয়ার পর একদিন তিনি নিজেই আমাকে স্কুলে নিয়ে এলেন এবং শ্রেণীকক্ষেও বসিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাদের নবম শ্রেণীতে প্রায় চল্লিশ জনের মত ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে দশ-বার জন মুসলমান। বাকীরা সবাই হিন্দু। শিক্ষকদের ব্যতীত ছাত্রদের কেউই আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে কিছু জানতো না। ভেদরাওয়াহ্ থেকে ২২ মাইল দূরে 'ভেলিস' নামে একটা এলাকা ছিল। ওখানে কোম্পানীর একটি শাখা অফিসের প্রধান ছিলেন আমার আব্বা। আব্বাকে তাড়াতাড়ি তার কর্মস্থলে পৌঁছার নির্দেশ এলো। তাই তিনি পরের দিনই ভেলিস যাওয়ার প্রোগ্রাম করলেন। সন্ধ্যার পর আমাকে নিয়ে আব্বা নেহালচন্দ্র নামে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ী গেলেন। তিনিও আব্বার সাথে একই কোং-এ চাকুরী করতেন। আব্বার সাথে তার খুবই ঘনিষ্টতা ছিল। আব্বা প্রায় সব বিষয়েই তার সাথে পরামর্শ করতেন। বলা বাহুল্য আমার বিষয়েও তাকে অবহিত করেছিলেন।

নেহাল চন্দ্র মহাশয়কে আব্বা বললেনঃ আমি তো আর বিলম্ব করতে পারছি না, কাল ভোরেই ভেলিস যেতে হবে। সুতরাং কৃষ্ণলালকে আপনার দায়িত্বে রেখে যেতে চাই। ওর যাবতীয় খরচ আমিই বহন করব। নেহাল চন্দ্র আমাকে রাখতে রাজি হলেন। তবে খরচ গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন। বললেন-প্রিয় কৃষ্ণলালের খেদমত করা পূণ্য বলে আমি মনে কারি। তাই ওই কাজটুকু আমিই করবো। তুমি আমাকে এই সুযোগ দেয়ার জন্য আমি খুশী। ওর বিষয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। এরপর আব্বা আর নেহাল চন্দ্র মহাশয় একান্তে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করলেন, যার বিষয়বস্তু আমার শোনা ও জানা সম্ভব হলো না।

পরদিন আব্বা ভোরেই আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তার যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন ছিল। আবেগময় কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "তোমার বোঝার, ভাল-মন্দ বিবেচনা করার বয়স হয়েছে। আমার সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখো। বিদেশে এসব লোকদের সম্মুখে আমাকে অপমানিত করো না। নেহাল চন্দ্র ও তার পরিবারের লোকদের সাথে সদাচরণ করো। তাদের সম্মান করো। তোমার আচার-আচরণ দ্বারা যেন তোমার গোত্রীয় ভদ্রতা ও গৌরব প্রকাশ পায়। এই একশত টাকা তোমার হাত খরচের জন্য রেখে গেলাম। প্রয়োজন হলে আরো আনিয়ে নিও। আমি আব্বাকে বললাম, আমার আচরণ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ ব্যাপারে কখনও কিছু বলার সুযোগ পাবেন না। আব্বা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কীয় কয়েকটি বইও কিনে দিয়ে গেলেন। ফাঁকে ফাঁকে এগুলোও পড়তে বললেন এবং নেহাল চন্দ্রের সাথে মাঝে মাঝে মন্দিরে যাওয়ার কথাও বললেন। আমি সব কিছুর পর বললাম-'আচ্ছা'। যেদিন আমাকে মারধোর করা হয়েছিল, তারপর থেকে আব্বার কথায় প্রতিবাদ বা প্রকাশ্যে উচ্চবাচ্য না করে যতটুকু সম্ভব নীরবতাই অবলম্বন করে যাচ্ছিলাম। আব্বাও খুচিয়ে খুচিয়ে আমার মনের কথা বের করার জন্য চেষ্টা করেননি। তিনি একটা প্রকাশ্য ভাব ব্যক্ত করেছিলেন যে, তিনি এখন আমার উপর আশ্বস্ত। এটা আব্বা যথেষ্ট অর্জন মনে করেছিলেন। এই মনোভাব নিয়েই তিনি খুশি খুশি ভেলিস চলে গেলেন। আমিও খানিকটা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু আব্বার চলে যাওয়ার পর বার বার তাঁর কথা মনে পড়তে থাকল। মনে অস্থির অস্থির ভাব। এতো মারধোর করার পরও পিতা হিসাবে তাঁর অবস্থান আমার মনে এতটুকুও কমেনি। মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, আব্বার সাথে কখনও অসদাচরণ করবো না, পারতপক্ষে প্রাণ দিয়ে তাঁর খেদমত করতে সচেষ্ট থাকবো।

আব্বার উপদেশ মত নেহাল চন্দ্রের সাথেও খুব ভদ্রতাসুলভ আচরণ করতাম। পড়াশুনা সবকিছুতেই শৃংখলা বজায় রাখতাম। আর ব্যক্তিগত আচার-আচরণেও খুবই শালিন রইলাম, যাতে তিনি কোন অভিযোগ করতে না পারেন। নিয়মিত স্কুলে যাওয়া আসা করতাম এবং বাসায় স্কুলের পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম, তা সত্বেও নেহাল চন্দ্রের এক ছেলে পেনালাল ও এক সাথী বদরীনাথ 'কিরামান-কাতিবীনের' ন্যায় সর্বদা আমার সাথে থাকতো। একা স্কুলে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তাছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ারও অনুমতি ছিল না, আর একা এদিক-সেদিক যাওয়া সম্ভবও ছিল না। ছুটির দিন ঘুরতে গেলে বা বাজারে গেলেও পেনালাল বা বদরীনাথ কেউ না কেউ অবশ্যই সাথে থাকতো।

স্কুল থেকে এসে পানাহারের পর সমবয়সী কয়েকজন মেয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করতো। তারা অহেতুক আমার এটা ওটার প্রশংসা করতো। প্রথম প্রথম কেমন উস্মা প্রকাশ করতাম। তখন এদের আচরণ বুঝতেও পারিনি। মনে হতো কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ, আর এরা তার হুর-পরী। কিন্তু ক্রমে তাদের এই বাচিলতার আসল কারণ প্রকাশ পেতে লাগলো। এদের কেউ নেহাল চন্দ্রের কন্যা নয়, তবে তার আত্মীয়দের কন্যা। যখন তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হতে লাগলো, তখন তাদেরকে দেখে বিরক্তি বোধ করতে থাকলাম। তারা এলে স্কুলের কাজ শেষ হয়নি বলে পড়াশুনা শুরু করতাম। এতে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠতো। বিভিন্ন আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি মন্দই মনে হতো। নেহাল চন্দ্রের কাছে অভিযোগ করে ফল হলো না। তিনি বললেন-তুমিতো খুবই ছেলে মানুষ। এরা একটু আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য আসে, আর তুমি ওদেরকে খারাপ মনে করো।

একাকি হলে আমার প্রতি তাদের মনের গভীর আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করত। কেউ কেউ হিন্দু ধর্মের গুণ-কীর্তন করত, আর মুসলমানদের দুর্নাম করত।

মনে হচ্ছিল, এদেরকে আমার কাছে পাঠানো হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে যে, "আর যদি আমি মুসলমানদের নিকট ফিরে না যাই, তবে এদের যাকে খুশী বিবাহ করা যাবে। সে ভেটও দেয়া হলো। এদের আচরণে হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার মনে আরো ঘৃণা সৃষ্টি হলো। সেইসাথে ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়তে লাগলো। হিন্দু ধর্মে রাখার জন্য মেয়েদেরকে লেলিয়ে দেয়া হলো। আর ইসলাম ধর্মে বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত গায়রে মুহরিমার সাথে দেখা-সাক্ষাতই নিষিদ্ধ। কি পবিত্র ধর্ম!

আমার প্রয়োজনীয় কিছু কেনা-কাটার জন্য আব্বা একশত টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। তা তিনি দিয়েছিলেন নেহাল চন্দ্রের নিকট। উক্ত টাকা তার নিকটই ছিল। কোন কিছু ক্রয়ের প্রয়োজন হলে তিনি আমার হাতে নগদ টাকা দিতেন না। আমি প্রয়োজনীয় বস্তুর কথা বলতাম, আর তিনি ক্রয় করে দিতেন। কারণ, তার প্রতি আমার আব্বার এরূপ নির্দেশই ছিল। একদিক থেকে যেমনিভাবে আমার সব রকমের আরাম-আয়েশের খেয়াল রাখা হতো, অন্যদিক থেকে আমাকে প্রহরা দিয়ে রাখার সব রকমের ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছিল, যার সামান্য ব্যতিক্রম হতো না।

মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেবকে পত্র

আব্বা তার কর্মস্থলে চলে যাওয়ার পর সবচেয়ে জরুরী বিষয় ছিল মাওলানা সাহেবকে পত্র লিখে প্রথম পত্র সম্পর্কে অবহিত করা যে, পূর্বের পত্রে আপনাদের মনে কোন দ্বিধা সৃষ্টি হয়ে থাকলে তা দয়া করে দূর করে দিন। নেহাল চন্দ্র সাহেবের বাড়ীতে পত্র লেখার মত অবকাশই পেতাম না। হয়তো পেনালাল নয়তো বদরীনাথ অথবা মেয়েদের মধ্যে কেউ না কেউ আমার কক্ষে থাকতোই। সবচেয়ে বেশী বিরক্ত করতো মেয়েগুলো। তারা যেন আমাকে দখল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। এই কারণে বাড়ীতে পত্র লেখা সম্ভব ছিল না। তাই স্কুলেই লিখব বলে সংকল্প করলাম।

আমার ক্লাশের একজন মুসলমান ছাত্র 'দোস্ত মুহাম্মদের' সাথে আমি পরিচয় ও আলাপ করে নিয়েছিলাম। আমি তাকে আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত কথা বলেছি, তাই আমার প্রতি তার খুবই অনুরাগ ও অনুকম্পা সৃষ্টি হয়েছিল। দোস্ত মুহাম্মদ আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিল। আমি খুবই সতর্কতার সাথে একটি পত্র লিখে তাকে দিলাম। সে পত্রটি পোস্ট করে দিল। আমার এই পত্রটিও মাওলানা সাহেব সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। পত্রের অনুলিপি নিম্নরূপঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব! আস্‌সালামু আলাইকুম। ইতি পূর্বে আমার নামে লেখা একটি পত্র হয়তো পেয়ে থাকবেন। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, ঐ পত্র আমি স্বেচ্ছায় লিখিনি; বরং শাস্তি দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে, তা লিখবার জন্য। আমার কোট আর কম্বল কিছুতেই আপনি মিয়ানী পাঠাবেন না।

আল্‌হামদুলিল্লাহ! আমি ইসলাম ধর্মের উপর পূর্বের ন্যায় অটল রয়েছি। এই ধর্ম ত্যাগ করার জন্য আমাকে অবর্ণনীয় শাস্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমি অটল রয়েছি। এর পূর্বে কয়েকবার পত্র লিখেও পাঠাতে সক্ষম হইনি। দু'টি পত্র আব্বার হস্তগত হয়ে যায়। আমাকে আব্বার কর্মস্থল হতে বাইশ মাইল দূরে ভেদরাওয়াহ্ নামক স্থানে একটি হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। কোন সুযোগ পেলেই ইনশাআল্লাহ পালিয়ে আপনার নিকট চলে আসবো। পালানোর পন্থা সম্পর্কে পরবর্তী চিঠিতে আপনাকে জানাব। আপনাদের থেকে দূরে থাকার কারণে মনে দারুণ যাতনা বোধ করছি। আমার মুক্তিলাভের জন্য আপনি আল্লাহর দরবারে খাসভাবে দোয়া করবেন। সব বন্ধুদেরকে আমার সালাম জানাচ্ছি।

আমার ঠিকানা
কৃষ্ণলাল
প্রযত্নে ঃ নেহাল চন্দ্র
মেসার্স হরেকৃষ্ণ এন্ড কোং
ভেদরাওয়াহ্, কাশ্মীর
(গাজী আহমাদ নওমুসলিম)

বুঝালের অবস্থা ঃ

ঝিলাম থেকে আমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার পর আমার সম্পর্কে বুঝালের লোকেরা আর কিছুই জানতে পারেনি। কয়েকদিন পর্যন্ত তো ব্যাপক আলোচনাই চলছিল। পরে আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মাওলানা সাহেব অপেক্ষা করতে থাকেন আমার পত্রের।

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিখানো পত্র যখন মাওলানা সাহেব পেলেন কিছু লোক তার বিষয়বস্তু জানতে পেরে খুবই মর্মাহত হলেন। ইশার পর অনেক লোক সমবেত হলেন। মাওলানা সাহেব তাদেরকে পত্র পাঠ করে শুনালেন। কেউ কেউ বললেন ঃ ছেলে মানুষ! শাস্তি আর নির্যাতনে অটল থাকতে পারেনি। মাওলনা সাহেব বললেনঃ পত্রটির লেখায় মনে হয় এটি সে স্বেচ্ছায় লেখেনি, বরং তাকে দিয়ে লেখানো হয়েছে। আমার মন বলে গাজী আহমাদ ইসলামের উপর অটল রয়েছে। কারণ, সে বেশ চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধানের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই নেয়ামত সে ত্যাগ করবে না।

আমার দ্বিতীয় পত্রটি কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝাল পৌঁছে গেল। তাতে তিনি অপরিসীম খুশী ও অনুপ্রাণীত হলেন। আমার পরিচিত ও হিতাকাঙ্খী লোকদেরকে ডাকলেন। সবাইকে পত্র পাঠ করে শুনালেন। তারা খুবই আনন্দিত হলেন। মাওলানা সাহেব বললেন-আমি সেদিন বলিনি যে, গাজী আহমাদ ইসলামের উপর স্থির ও অটল রয়েছে।

'ভেদরাওয়াহ্' এতদঞ্চলের একটি কেন্দ্রীয় কসবা বা বড় গ্রাম। প্রায় তিন হাজার পরিবার এখানে বাস করে। পার্শ্ববতী এলাকার লোকেরা প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এখানে আসে। মুসলমান অধিবাসী বেশী হলেও হিন্দুদের হাতেই এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য। মুসলমানরা গরীব ও বেশীর ভাগই মজদুরী করে। এলাকায় কয়েকটি মন্দির।প্রতিটি মন্দিরের স্বর্ণের চূড়া বড় সুন্দর দেখায়। আর মসজিদ মাত্র একটি, তাও নামাযীদের অবহেলায় অনাবাদ রয়েছে।

এদিকে ভেদরাওয়ায় একদিন আমি একটি মন্দিরে প্রবেশ করলাম। সেখানে ছয়টি বড় মূর্তি ছিল। একটি শূয়ূজী মাহারাজার, একটি কৃষ্ণ মাহারাজার, একটি কৃষ্ণ দেবীর, একটি মহারাজ হনুমানের, অবশিষ্ট দু'টি কার আমি চিনি না। মনে মনে ভাবলাম মন্দিরে যখন প্রবেশ করলাম, তখন দু'টি কথা বলেই যাই "লা'নত ঐসব লোকদের উপর, যারা তোমাদেরকে নিজ হাতে তৈরী করে উপাস্য স্থির করেছে। মানুষ প্রয়োজন ও অভিযোগের আবেদন-নিবেদন করে তোমাদের কাছে, অথচ কোন ভাল-মন্দের ক্ষমতা কিছুই নেই তোমাদের। কৌতুক বশতঃ সব মূর্তিগুলোর নাক-কান স্পর্শ করে বেরিয়ে এলাম। যারা আমায় প্রহরা দিচ্ছে; তাদেরকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিত করার জন্য আমি নিয়মিত স্কুলে যেতে লাগলাম। পেনালাল আর বদরীনাথ সর্বক্ষণ আমার কাছেই থাকতো।

এরই মধ্যে কোন এক উপলক্ষে স্কুলের ছুটি এল। একাধারে পাঁচদিন ছুটি। এই ছুটির কথা আমার আব্বারও জানা ছিল। তাই তিনি আমাকে তার কর্মস্থল ভেলিস যাওয়ার সংবাদ পাঠালেন। দয়াল চন্দ্র আমাকে পেনালালসহ ভেলিস ঘুরে আসতে বললেন।

পরদিন সকালেই আমরা ভেলিস রওয়ানা হলাম। কিন্তু পৌঁছতে পৌঁছতে শেষ বিকাল হয়ে গেল। আব্বা অফিস থেকে এসে আমাকে দেখতে পেয়ে খুবই খুশী হলেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

ভেলিস অবস্থানের তৃতীয় দিন ভেদরাওয়ায় মাওলানা আবদুর রউফ সাহেবের পাঠানো পত্র পৌঁছলো। নেহাল চন্দ্র পত্রটা লোক মারফত ভেলিস পাঠিয়ে দিলেন। আব্বা পত্রটি পাঠ করলেন, কিন্তু কে পাঠিয়েছে, কার কাছে পাঠিয়েছে তার উল্লেখ নেই এবং পত্রটি কোথা থেকে লেখা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই, তিনি তেমন কিছু বুঝতে পারলেন না।কিন্তু যা বুঝার আমি ঠিকই বুঝেছি, তাই পত্রটি পাঠ করে আমি আব্বার হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। তবুও আব্বা অনুমান করে একটা গুলি চালালেন, মনে হয় পত্রটা বুঝাল থেকে এসেছে। তুমি তাদেরকে ঠিকানা না দিলে তারা কিভাবে তোমার ঠিকানায় পত্র পঠালো?

আমি বললাম, মিয়ানী হতেও ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারে। আব্বা আর কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। চতুর্থ দিন আমার ভেদরাওয়াহ ফিরে আসার কথা। ঐ দিন আব্বা আদর-আপ্যায়ন করলেন। সম্ভবতঃ তার মনের সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল।

চতুর্থ দিন আমরা চলে এলাম এবং বিকালেই মাওলানা সাহেবকে পত্র লেখলাম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জনাব মাওলানা সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আপনার পত্রটি এমন সময় আমার হাতে পৌঁছে, যখন আমি আব্বার নিকট ছিলাম। ভাগ্য ভাল যে, আপনার পত্র পাঠে আব্বা কিছু বুঝতে পারেননি। তাই আমার প্রাণ বেঁচে গেছে। অন্যথায় এবার প্রাণেই মেরে ফেলতে। আগামীতে এই ঠিকানায় পত্র লিখবেনঃ দোস্ত মুহাম্মদ, নবম শ্রেণী, ভেদরাওয়া উচ্চ বিদ্যালয়, জম্মু। এ আমার পাঠ্য সাথী। তার সাথে আমি খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছি। তাকে আমার সব কিছু বলেছি। সে আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার কথা দিয়েছে।

আমি পালিয়ে আসার পথ ও সুযোগ খুঁজছি। আপনি একশত টাকা পাঠিয়ে দিন। আমার কাছে নগদ কোন টাকা রাখার সুযোগ নেই। যদি বুঝালকালা থেকে আমাকে নিয়ে যেতে কেউ আসেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। কেননা, আমার মত এই বয়সের ছেলেদের একা এ দুর্গম পথ সফর করা মোটেই নিরাপদ নয়। আপনি পত্র মারফত জানাবেন আমি কি করবো। এখানের পরিবেশ আমার কাছে খুবই অপছন্দ লাগছে। আমি এখন নিয়মিত সালাত আদায় করতে পারছি না। তবে ইসলাম ধর্মের উপর অটল রয়েছি।

বিঃ দ্রঃ কোন পয়সা না থাকার কারণে রেয়ারিং পত্র পাঠালাম।

আপনার খাদেম
গাজী আহমাদ,
ভেদরাওয়াহ্, জম্মু।

সত্যিই যেদিন থেকে আমি হিন্দুদের দখলে এসেছিলাম, সেদিন থেকে নিয়মানুযায়ী সালাত আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। হিন্দুরা সকাল-সন্ধ্যা হাঁটু গেড়ে আসন করে বসে চক্ষু বন্ধ করে হাত জোড় করে বন্ধনা করে। আমিও সকাল-সন্ধ্যা একইভাবে বসে সালাতের ধ্যান করতাম। রুকু-সিজদা করতাম না। উল্লেখ্য, সে অবস্থায় সালাতে যে মনোযোগ ও প্রশান্তি বোধ করতাম, পরবর্তী সময়ে প্রকাশ্যে প্রচলিত নিয়মে সালাত আদায় করতে গিয়ে সে রকম মনোযোগ অনুভব হয়নি। জানি না এর রহস্য কি?

ভেলিসে যে চার দিন আব্বার কাছে ছিলাম তখনও সালাতের ধ্যান কাযা হতে দেইনি। আমার বিশ্বাস ছিল, যেহেতু প্রকাশ্য রুকু-সিজদা করে সালাত আদায় সম্ভব হচ্ছে না, তাই এই "ধ্যান" আল্লাহ তার স্মরণরূপে অবশ্যই কবুল করবেন এবং এদ্বারাও আমি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবো। আমি পরবর্তী সময় এই সব সালাতগুলোর কাযা আদায় করে নিয়েছিলাম।

আমার পরবর্তী চিঠি বুঝালকালা পৌঁছার পর মাওলানা সাহেব তার হিতাকাংখী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে পরামর্শ করলেন যে, কি করা যায়। এত দূরের সফর, হিন্দু প্রধান এলাকা, যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশংকা, নিরাপদে আসা খুবই দুরূহ ব্যাপার। আর গাজী আহমাদের একা আসাও সম্ভব নয়। কেউ গেলে সীমাহীন বিপদের ঝুঁকি নিয়েই যেতে হবে এবং জান বাজী রেখে আসতে হবে। সূফী জান মুহাম্মদ সাহেব দাঁড়িয়ে বললেনঃ মাওলানা! আমি একাজ করতে চাই। বিপদ যতই হোক আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা রেখে আমি সাহসিকতার সাথে এ কাজে সফল হব ইনশাআল্লাহ্–এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সূফী জান মুহাম্মদ বুঝালকালার আদি বাসিন্দা। তার বাপ-দাদার পেশা ছিল খৌরকার্য করা। কিন্তু সূফী সাহেব এ পেশা অবলম্বন না করে সাইকেল মেরামতের কাজ করতেন। সবক'টি মামলায় তিনি আমার সাথে গিয়েছিলেন। তিনি ইসলামের জন্য যেকোন কাজ করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন, যে কোন স্থানে যেতে রাজি ছিলেন। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণে তিনি খুবই খুশী ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আর্থিকভাবে গরীবই ছিলেন, কিন্তু ইসলামের নামে অন্তর প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ছিল। তার অন্তরে আল্লাহর ঘর দেখার তীব্র আকাংখা ছিল। অস্থির ছিলেন হজ্জ করার জন্য। একবছর সূফী সাহেব তার এক বন্ধুর নিকট হতে পঁচিশ টাকা কর্জ করে হজ্জের উদ্দেশ্যে সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে এলেন। করাচী পৌঁছতেই তার পঁচিশ টাকা শেষ। তারপর তিনি শিপিং কর্পোরেশনে চাকুরী নিয়ে উক্ত জাহাজেই হজ্জে চলে এলেন। এরপর হতে এ পর্যন্ত নয় বার হজ্জ করেছেন, কি সৌভাগ্য তার!

সূফী জান মুহাম্মদ সাহেব যদিও লেখাপড়া করেননি এবং তার পেশাও মর্যাদাপূর্ণ নয়, কিন্তু তার অন্তর ও মননশীলতা খুবই উত্তম। পরবর্তী কালে আমি তার নিকট থেকে পিতৃত্বের মমতা পেয়েছি।

সূফী সাহেবের আত্মীয়-স্বজন জানতে পারলেন যে, তিনি কাশ্মীর যাচ্ছেন এবং আমাকে আনতে যাচ্ছেন। সুতরাং তারা তাকে সতর্ক করে বললেন, কাশ্মীর হিন্দুদের রাজত্ব। মুসলমানরা সেখানে খুবই দুর্বল। তুমি যদি কোনক্রমে ধরা পড়

তাহলে প্রাণে বেঁচে আসতে পারবে না। অপরদিকে তুমিতো কোনদিন সেখানে যাওনি। পাহাড়ী এলাকা, বন-জঙ্গল আছে। নিরাপদ পথ-ঘাট তুমি চিন না। হিংস্র জন্তুও তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা অসম্ভব। তুমি অহেতুক নিজের প্রাণ ঝুঁকিতে ফেলছো। জান মুহাম্মদ সাহেব আত্মীয়-স্বজনের অনাকাংখিত উপদেশ শুনে বললেন ঃ আমি যদি মরেও যাই অথবা আমাকে যদি হত্যাও করে ফেলা হয়, হিংস্র জন্তু যদি আমাকে ভক্ষণও করে ফেলে তাহলেও আমি সেখানে যাব। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজন নও মুসলিমকে উদ্ধারের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হলে আমি নিজের জীবনকে ধন্য মনে করবো। গাজী আহমাদকে উদ্ধার করে আনা আমাদের উপর ফরয।

ধন-সম্পদহীন গরীবরা ইসলামের শুরু থেকে বিরাট খিদমত করে আসছে। তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর উপর ইসলামের ভিত্তি মজবুত হয়েছে। এই গরীবদের ইসলামী জযবা দ্বারা আজও ইসলাম জিন্দা রয়েছে। সূফী সাহেবের জন্য সর্বদা আমি দোয়া করি। আমার জন্য তিনি মুসিবতের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব কাশ্মীরের মানচিত্র সংগ্রহ করে ভেদরাওয়া খুঁজে বের করলেন। মানচিত্র নিয়ে সূফী সাহেবের জন্য পথের নতুন মানচিত্র তৈরী করে সূফী সাহেবকে দিলেন। মৌখিকও বুঝিয়ে দিলেন। সুবেদার খান যামান সাহেব তার আসা যাওয়ার সমস্ত পথ খরচ দিলেন।

সূফী সাহেবের ভেদরাওয়াহ্ যাত্রা ঃ

সূফী সাহেব নীরবে মানুষের সাথে লেন-দেন সমাধা করলেন। যাদের সাথে চলাফেরা করতেন তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। যেদিন রওয়ানা করলেন সেদিন সকালে মায়ের নিকট গিয়ে দোয়া নিলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। মা তাকে অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় দিলেন, নিরাপত্তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, বাবা! ইসলামের প্রয়োজনে তোমরা যদি এগিয়ে না আস, তবে ইসলাম থাকবে কি করে? ইসলামের ডাক আসলে কাউকে না কাউকে সাড়া দিতেই হবে। আমি খুশী যে, গাজী আহমাদকে আনার জন্য তুমি যাচ্ছ। সূফী সাহেব মায়ের নিকট দোয়া চেয়ে বিদায় নিলেন। মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব আমার নিকট আর কোন পত্র লিখলেন না। আমি কিন্তু পত্রের অপেক্ষায় ছিলাম। সময়মত পত্র না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলাম।

আমি যে মাওলানা সাহেবকে পত্র লিখেছি সে পত্র তার হাতে পৌঁছলো কি না তাই বা কে জানে? আল্লাহ না করুন এমন পত্র যদি আমার আত্মীয়-স্বজনের হাতে পড়ে থাকে, তাহলে জীবনের আর কোন আশা নেই। এই হিন্দু পরিবেশটা খুবই খারাপ লাগছে। খাবার-দাবারও সন্দেহযুক্ত মনে হয়। কিন্তু করারও কিছু নেই, খেতে হচ্ছে। মাওলানা সাহেব আমাকে একটি অযিফা শিক্ষা দিয়েছিলেন যখন মহামুসীবত মনে করবে তখন পড়তে থাকবে। আমি বহুবার এই অযিফার ফল ও বরকত লাভ করেছি। এই অযিফাই পড়তে লাগলাম মনভরে। সূফী সাহেব 'লাল্লাহ' রেল স্টেশন হতে শিয়ালকোট হয়ে জম্মু পৌঁছলেন। মানুষের কাছে ভেদরাওয়াহ্

যাওয়ার পথ ও যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। মানুষেরা তাকে বললো এখান থেকে বামে বাট্রুত, আর বাট্রুত থেকে ভেদরাওয়াহ্ হয়তো খচ্চরের উপর সাওয়ার হয়ে অথবা পায়ে হেটে যেতে হয়। সূফী সাহেব বাসে বাট্রুত গিয়ে সেখান হতে একটা খচ্চর ভাড়া করলেন। রাতে 'থিলয়াসী' নামক স্থানে রইলেন। পরদিন ভেদরাওয়া পৌঁছে গেলেন। ভেদরাওয়া দু'টি অংশে বিভক্ত। একটি ভেদরাওয়াহ্ নিগার, আরেকটি শুধু ভেদরাওয়াহ্। দোস্ত মুহাম্মদ ভেদরাওয়ায় থাকতো, আর আমি থাকতাম নিগার ভেদরাওয়াহ। সূফী সাহেব সন্ধার সময় ভেদরাওয়াহ্ নিগারের মসজিদে উপস্থিত হয়ে দোস্ত মুহাম্মদের ঠিকানা খোঁজলেন। লোকেরা বললেন, আপনিতো ভেদরাওয়ার অপর অংশে চলে এসেছেন। এখন তো রাত হয়ে গিয়েছে, রাত্রে আপনি এ মসজিদেই থাকুন। সকালে স্কুলেই তার সাথেদেখা করতে পারবেন।

পরদিন ফজরের সালাত আদায় করে সাথে সাথেই সূফী সাহেব দোস্ত মুহাম্মদের সাথে তাদের বাড়ীতে দেখা করার জন্য ভেদরাওয়াহ্ রওয়ানা হয়ে গেলেন। মসজিদ হতে এক মাইল দূরে তাদের বাড়ী। তাই সূফী সাহেব সূর্য উঠার পূর্বেই তাদের বাড়ী পৌঁছে গেলেন। দোস্ত মুহাম্মদ বাসায় ছিল না, তার বড় ভাই জান মুহাম্মদ গাজী আহমাদ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তাই এত সকালে একজন অপরিচিত মানুষকে বাসায় আসতে দেখে জান মুহাম্মদ ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলো আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? সূফী সাহেব বললেনঃ আমার বাড়ী পাঞ্জাবের ঝিলাম জেলায়। দোস্ত মুহাম্মদের সাথে দেখা করতে চাই। দোস্ত মুহাম্মদের বাড়ীর সকলেই অস্থিরতা ব্যক্ত করলেন। এরই মধ্যে দোস্ত মুহাম্মদ বাড়ী এল এবং সব কিছু অবহিত হওয়ার পর সবাই শান্ত ও নিশ্চিত হলেন। দোস্ত মুহাম্মদ সূফী সাহেবকে বললো, কৃষ্ণলাল তো আজ তিন দিন যাবত স্কুলে আসছে না। অসুস্থ কিনা তাও জানি না। সূফী সাহেব খানিকটা চিন্তিত হলেন। আজও যদি স্কুলে না আসে তাহলে দেখা সাক্ষাতের কি সূরত হবে? সূফী সাহেব দোস্ত মুহাম্মদকে বললেন, আমি স্কুলের বাইরে থাকবো। তুমি স্কুলে গিয়ে সে আসলো কিনা তা আমাকে এসে জানাবে। আমি স্কুলে গেলে দোস্ত মুহাম্মদের সাথে দেখা হওয়ার পূর্বেই আরেকজন মুসলমান ছাত্র আমাকে বললো, ঝিলাম থেকে তোমার একজন বন্ধু এসেছে। আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে নাম বলতে পারলো না। আমি খুবই অস্থিরতার সাথে দোস্ত মুহাম্মদের অপেক্ষায় থাকলাম। দোস্ত মুহাম্মদ স্কুলে এসেই আমার কাছে এল এবং বললো সূফী জান মুহাম্মদ সাহেব এসেছেন। সূফী সাহেবের নাম শুনে এমনিতেই মনের স্পন্দন বেড়ে গেল। ভয়ে দেহ কাঁপতে লাগলো। দোস্ত মুহাম্মদ বললো ঃ তিনি তোমাকে নিতে এসেছেন। স্কুলের বাইরে ঐ গাছের নীচে সবরী (পেয়ারা) বিক্রেতার দোকানের কাছে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। টিফিন পিরিয়ডে আমি কিছু কেনার ভান করে পেয়ারা বিক্রেতার দোকানের নিকট গিয়ে দেখলাম, সূফী সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আমি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েই পাঞ্জাবী ভাষায় বললাম, আমার নিকটে আসবেন না। আমার সাথে এখন মুসাফাহা করার চেষ্টাও করবেন না। কেউ দেখে ফেলতে পারে। বহু লোক আমার প্রহরায়

নিয়োজিত আছে। আমি বললাম ঃ খেলার ঘন্টায় আমি পুনরায় আসবো এখন চলে যাচ্ছি। আপনি ঐ নালাটার পূর্ব পার্শ্বে থাকবেন। নালাকে পিছন দিয়ে বসে থাকবেন। আমি এর পশ্চিম পার্শ্বে আসবো এবং প্রয়োজনীয় কথা তখন বলবো। খেলার ঘন্টায় আমি নালার পার্শ্বে এলাম। সূফী সাহেব নালার পূর্ব পার্শ্বে পূর্ব দিকে মুখ করে বসা ছিলেন, আর আমি গিয়ে নালার পশ্চিম পার্শ্বে পশ্চিমমুখী হয়ে বসলাম। অর্থাৎ আমরা একজন অপর জনকে পিছন করে বসলাম। সূফী সাহেব বললেন ঃ আমি তোমাকে নেয়ার জন্য এসেছি। আমি বললামঃ আজ তো ছুটি পর্যন্ত বিলম্ব হয়ে যাবে। আগামী কাল রবিবার বাড়ী থেকে বের হওয়াই সম্ভব নয়। পরশু সোমবার স্কুলে পৌঁছেই চলে যাওয়ার পথ ধরবো। সূফী সাহেব বললেনঃ না, আজই যেকোন অবস্থায় আমাদের চলে যেতে হবে। কারণ, আমার এখানে আসার ব্যাপারে মিয়ানীতে তোমার আত্মীয়রা যদি সংবাদ পেয়ে যায়, তাহলে তারা টেলিগ্রাম করে দিবে। সেক্ষেত্রে সবকিছু ভন্ডুল ও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ বাট্রুত এর রাস্তা নিরপদ নয়। সেখানে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা আছে। আমরা বাট্রুত পৌঁছার পূর্বেই আমাদের পালিয়ে যাওয়ার টেলিগ্রাম পৌঁছে যাবে, তখন গ্রেফতার হওয়া ছাড়া পথ থাকবে না। সূফী সাহেব বললেন ঃ আমি এসব বিপদজনক রাস্তা পরিহার করবো। মুসলমানদের সাথে আলাপ করে আমি একটি বিকল্প রাস্তা জেনে নিয়েছি, যা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং ঐ পথ চিনিয়ে নেয়ার জন্য আমি মজুরী দিয়ে একজন লোকও ঠিক করে রেখেছি। সে আমাদেরকে নিরাপদ রাস্তা দিয়ে কাশ্মীর সীমান্ত পার করে দিয়ে আসবে। সূফী সাহেব বললেন ঃ আমি বন্দরের বাজার ওয়ালী মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি, তুমি সুযোগমত সেখানে চলে আস। বই-পুস্তকের বোঝা সাথে এনো না। স্কুলের ঘন্টা শুনা গেল। জান মুহাম্মদ সাহেব মসজিদের দিকে রওয়ানা করলেন। আমিও স্কুলে চলে গেলাম। স্কুল ছুটির এখনও এক ঘন্টা বাকী। আমি মুখ বানিয়ে ক্লাশ টিচারের কাছে গিয়ে বললাম, আমার প্রচন্ড পেট ব্যথা করছে, আমি বাসায় চলে যাই। ক্লাশ টিচার আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন। যারা আমাকে চোখে চোখে রাখতো আমি ধীরে ধীরে তাদের চোখ থেকে বেঁচে স্কুল থেকে বেরিয়ে বাজারস্থ মসজিদের সামনে চলে এলাম। সূফী সাহেব পথ প্রদর্শককে নিয়ে আমার অপেক্ষা করছিলেন। আসরের সময় এখনও হয়নি, আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহর পথের তিন জনের এই কাফেলা আসবাব উপায়হীন অবস্থায় মনজিলে মকসূদের দিকে রওয়ানা হলো। ভয়ে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। মনের স্পন্দন হচ্ছিল জোরে জোরে। যে কোন ব্যক্তি আমাদেরকে দেখলেই বুঝতে পারতো আমরা কোন পেরেশানীর শিকার। আমার পরিধানে হিন্দু ছেলেদের পরিহিত পোশাক ছিল। এটা একটা বিপদজনক নিদর্শন ছিল। কারণ, কেউ দেখেই মনে করত, হিন্দু ছেলে মুসলমানের সাথে কোথায় যাচ্ছে? ভেদরাওয়াহ বন্দর অতিক্রম করে আসার পর আমাদের পথ প্রদর্শক বললো, তোমরা এত চিন্তাযুক্ত ও পেরেশান কেন? মনে হয় তোমরা কোন অপরাধ করে বেরিয়েছ। সূফী সাহেব বললেন, আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে আমাদের অবস্থা তোমাকে জানাবো। শহরের সীমা অতিক্রম করে বাইরে আসার পর আমাদের মনে খানিকটা স্বস্তি

এলো। কয়েক পা এগিয়ে বার বার আমরা পিছন ফিরে তাকাতাম। হয়তো কেউ আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। এবার পথ প্রদর্শক বললো ঃ তোমাদের গতিবিধি খুবই সন্দেহ জনক মনে হচ্ছে, আসল কথা না বললে আমি আর এক পা অগ্রসর হব না। বাধ্য হয়ে সূফী সাহেব তাকে আমাদের অবস্থা অবহিত করলেন। তাতে সে আশ্বস্ত হলো এবং আমাদেরকে সূর্য ডুবার আগে আরো একটু দ্রুত চলার জন্য তাকিদ করলো। সূর্য ডুবার পূর্বে আমাদেরকে বেশ কিছু পথ এগিয়ে যেতে হবে। ভেদরাওয়ার তের মাইল দূরে এই পথেই তার বাড়ী ছিল। সূর্য ডুবার আগে আমরা তার বাড়ী পৌঁছতে পারিনি; বরং সূর্য ডুবার বেশ কিছুক্ষণ পর আমরা তার বাড়ী পৌঁছলাম।

আমাদের পথ প্রদর্শক তার স্ত্রীকে খানা তৈরী করতে বললো। দুধ আর মধু দিয়ে আমরা রুটি খেলাম। সূফী সাহেব মধুর মূল্য জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, আমাদের এখানে টাকায় ছয় কেজি মধু পাওয়া যায়। আমাদেরকে লোকটি যে ঘরে বসালো সেই ঘরের একটি ছিদ্র দিয়ে আমরা যেপথে এসেছি, সেদিকে তাকালাম। দূর পর্যন্ত দেখা যেতে লাগলো। হঠাৎ দেখলাম দূরে একটি আলো নড়ছে। কেউ যেন এ পথ দিয়ে এদিকে আসছে বলে মনে হলো। আমাদের আশংকা, কেউ হয়তো আমাদের খুঁজতে আসছে। কিন্তু আমাদের বাড়ীওয়ালা আমাদের সান্ত্বনা দিলেন। একবার দেখা গেল তিনটি আলো এগিয়ে আসছে। এবার আমাদের ইয়াকীন হলো, এরা আমাদের খোঁজেই আসছে। আমাদের পথ প্রদর্শকের নাম ছিল খাত্তু। আমরা খাত্তুকে বললাম ঃ আমাদের এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিৎ। ঐ দেখ বেশ কিছু লোক এদিকেই এগিয়ে আসছে। খাত্তু বললো, এরা এ রাস্তার নয়। অন্য রাস্তা দিয়ে চলছে। এরা তাদের ডেরায় যাচ্ছে। সূফী সাহেব খাত্তুর সাথে চুক্তি করেছিলেন, সে আমাদেরকে ভেদরাওয়া হতে বিশ মাইল দূরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। বিশ মাইল পর জম্মু রাজ্য শেষ হয়ে অন্যরাজ্য শুরু হবে। খাত্তুর স্ত্রী খাত্তুকে বললো, এরাতো পলাতক মনে হচ্ছে। তাই বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। খাত্তু তার স্ত্রীকে আমাদের অবস্থা বললো, তাতে সে খুব খুশী হলো এবং বার বার দোয়া চাইলো। রাত্রে আহার শেষ করার পর আমরা খাত্তুকে বললাম, আরো সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে আমাদের রাত যাপন করা উচিৎ। সে বললো, সামনের রাস্তা খুবই বিপদজনক। বরফের পথ দিয়ে যেতে হবে। জঙ্গল থেকে কোন হিংস্র জন্তু এসে গেলে কেমন হবে? এখানে রাত্রে কেউ আসে না। আমরা বরং সকাল হওয়ার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়বো। সূফী সাহেব একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। খাত্তুর স্ত্রী বললো ঃ এদের এখানে থাকতে ভয় হচ্ছে, তাই তাদেরকে সামনে আমাদের অমুক আত্মীয়ের ডেরায় নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তারা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন। খাত্তু অনিচ্ছা ভাব নিয়ে বেরুলো। সত্যিই রাস্তা পাহাড়ী ও দুরূহ ছিল। খাড়া ভাবে কোথাও কোথাও উপরে উঠতে হয়। রাস্তায় কোথাও কোথাও বরফও ছিল। মৌসুম ঠান্ডা ছিল, তা সত্ত্বেও ঘামে ভিজে গেলাম। দু'মাইল অগ্রসর হয়ে আমরা পাহাড়ের উপর একটি ডেরায় পৌঁছলাম। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে হলো। রাতে আমরা এখানেই কাটালাম এবং ভোর হতে না হতেই রওয়ানা হয়ে গেলাম। সূর্য

উঠার পূর্বেই আমরা চার পাঁচ মাইল পথ চলে এলাম। জম্মু অতিক্রম করে সামনের দিকে যত অগ্রসর হতে লাগলাম আমাদের মনের অস্থিরতা তত কমতে লাগলো। খাত্তু বললো, এটা খুবই নিরাপদ রাস্তা। ভেদরাওয়ার খুব কম লোকই এ রাস্তা সম্পর্কে অবহিত। জম্মু সীমান্তে পৌঁছার পর খাত্তু বললো, এবার আমি বিদায় নিচ্ছি। আমরা বললাম, আরো এক মাইল এগিয়ে দাও। কিন্তু সে রাজী হলো না। বললো, আমাকে ভেদরাওয়া ফিরে যেতে হবে। খাত্তু আমাদেরকে সামনের রাস্তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলে দিল। কোন্ কোন্ গ্রাম সামনে পড়বে, কোনটি থেকে কোনটি কতদূর, কোনটির কি নাম ইত্যাদি। আমরা পথের এই নির্দেশনা কাগজে টুকে নিলাম। খাত্তু আমাদের সাথে বুক মিলালো এবং দোয়া চেয়ে বিদায় হয়ে গেলো।

সূফী জান মুহাম্মদ সাহেব খুবই সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেনঃ চল আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা রওয়ানা হই। পথে আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা রওয়ানা করলাম। রাস্তায় কিছুদূর এগুবার পর মুসলমানদের ডেরা পড়তো। জান মুহাম্মদ তাদেরকে আমার পরিচয় দিয়ে বলতো, যদি এপথে কেউ এসে এর সন্ধান করে তাহলে বলবে আমরা বলতে পারবো না। ডেরাবাসী বলতো আপনারা নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলুন। আমরা অগ্রসর হওয়ার পরই বরফ পড়া রাস্তা শুরু হল। মাঝে মাঝে ঠান্ডা পানির ঝর্ণা ছিল। পাহাড়ের চূড়াগুলো সাদা বরফে আচ্ছাদিত ছিল। বন ছিল নীরব, নিঝুম, রাস্তা ছিল বিপদজনক । পাহাড়ের কোল ঘেষে রাস্তা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সাপের ন্যায় বাঁকা হয়ে রাস্তা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। কেটে কেটে সিঁড়িও বানানো হয়েছে নীচে থেকে উপরে উঠার জন্য। পায়ের নীচে বরফ, তাই পা পিছলে যাওয়ার আশংকা ছিল। এক স্থানে বরফের বড় একটি ফাটল ছিল। একটি কাঠ ফেলে সাঁকো বানানো হয়েছে। সূফী সাহেব বললেন ঃ তুমি দাঁড়াও আমি আগে পার হয়ে যাই, তুমি পরে আস। সূফী সাহেব পার হয়ে গেলেন। আমি পার হতে গেলে হঠাৎ কাঠটি পিছলে যেতে লাগলো। সূফী সাহেব ধরে ফেললেন। অন্যথায় তখনই আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটে যেত। আমরা এত দ্রুত চললাম যে, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করলাম। পথ চলার পরিশ্রমের কারণে ক্ষুধা লেগেছিল খুব, কিন্তু রাস্তায় পানি ব্যতিত আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ একটি দোকান দেখে খুশী হলাম। কিন্তু দোকানে গুড় ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেলো না। ঐ গুড় খেয়েই ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দুই মুসাফির দুপুরের খানা ব্যতীত দ্রুত রওয়ানা হলাম।

আমরা যেখানে রাত যাপন করেছিলাম সেখান থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরত্বে সুন্দলা নামক একটি গ্রাম ছিল। আমাদের পিছু ধাওয়া করতে পারে এই ভয়ে আমরা খুব দ্রুত এতটুকু পথ আসর পর্যন্ত অতিক্রম করে এসেছি। আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একজন ঘোড়া ওয়ালার সাথে কথা বললাম ঃ সে দশ মাইল দূর পর্যন্ত এক জায়গায় নিয়ে যেতে চার টাকা চাইলো। কিন্তু সেই সাথে বললো ঃ সন্ধার পূর্বে আমি যেতে পারবো না। আমরা আধা ঘন্টা বিলম্ব করার পর ঘোড়া

ওয়ালা বললো ঃ আমার পক্ষে আজ আর যাওয়াই সম্ভব হবে না।

এরপর আমরা খুবই অস্থির হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলাম। ক্ষুধা আর ক্লান্তির কারণে পা উঠানোও মুশকিল ছিল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত খুব কষ্টে আরো দু'তিন মাইল অগ্রসর হলাম।

এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম সুন্দলার বাজার কত দূর? সে বললো ঃ এই পাহাড়ের কোণ শেষ হলেই সুন্দলার বাজার। আমরা দ্রুত চলতে লাগলাম। বনের মধ্য দিয়েই রাস্তা। হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল। তা সত্ত্বেও অপরিসীম ক্লান্তি নিয়েই চলতে লাগলাম। পাহাড়ের মোড় যেন আর শেষ হয় না। ক্লান্তির সময় অল্প পথও অনেক মনে হয়। পাহাড়ের কোণ শেষ হলে একটি ছোট গ্রাম পাওয়া গেল। কয়েকজন হিন্দু নারী-পুরুষ সেখানে বসা ছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমাদের রাত যাপনের জন্য দু'টি চারপায়ী (খাটিয়া) পাওয়া যাবে? তারা বললো ঃ না। আমরা জিজ্ঞাসা করলামঃ এটা সুন্দলা নয়? বললো ঃ না, না, সুন্দলা আরো একটু সামনে। ঐযে ঘর-বাড়ী দেখা যাচ্ছে, সেটাই সুন্দলা। সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এখানে কোন মুসলমানের বাড়ী আছে কি? তারা বললো ঃ এখানেতো কোন মুসলমান নেই। একজন ছিল গত বছর সে মারা গিয়েছে। তোমরা ঐ নীচের দিকে যাও। ওখানে একটা দোকান আছে। সেখানে তোমাদের থাকার জন্য খাটিয়া পাবে। আমরা দোকানে গিয়ে দেখি দোকানদার ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা তাকে ডেকে জাগালাম। সে বললো ঃ খাটিয়া নেই। তবে কয়েকটি চট দেয়া যাবে। আমরা তাই বিছিয়ে রাত যাপনের ব্যবস্থা করলাম।

দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম আটা আছে কিনা? সে বললো ঃ চাউল আছে, আটা নেই। আমাদের ক্ষুধার তো অন্ত ছিল না। বাধ্য হয়ে চাউলই ক্রয় করলাম। দোকানদার থেকে একটি পাতিল নিয়ে রান্না শুরু করে দিলাম। সূফী সাহেব রান্না করতে জানতেন না। আর আমার কথা বলে তো লাভ নেই। আগুন এত বেশী জ্বালানো হলো যে, নীচের চাউল তো পুড়ে গিয়েছে, আর উপরেরগুলো কাচাই রয়ে গেছে। ক্ষুধার পেট তাই গ্রহণ করলো। দোকানদার তার সবকিছুর হিসাব সাথে সাথে আদায় করে নিল। আর বললো ঃ পাতিলটা ধুয়ে রেখে দিও। কিন্তু পাতিল পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি ঘুমিয়ে পড়ার কারণে। ভোরে উঠে সূফী সাহেব বললেন, চল এক মুহূর্তও বিলম্ব নয়।

দোকানদার হিন্দু ছিল। এত সকালে তাদের উঠবার দায়িত্ব নেই। তাই তারা উঠে না। আমরা রওয়ানা হয়ে এলাম। আমার পা প্রায় অবশ হয়ে এল। কয়েকদিন পূর্বে এই পাগুলোতে শত শত বেত্রাঘাত পড়েছিল। উরু আর পায়ের গোছা ফেটে গিয়েছিল। তাই পাগুলো ব্যথায় টন্ টন্ করতে লাগলো। কিন্তু যেতে তো হবে। দুপুর পর্যন্ত অতিকষ্টে পাঁচ মাইল পথ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বসে পড়তাম। সূফী সাহেব আদর ও মমতা সহ উৎসাহ দিতেন। এই কষ্ট আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য। আল্লাহর নিকট এসবের কারণে তোমার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি হবে।

সন্ধায় একটি গ্রামে পৌঁছলাম। পালানোর পর এটা আমাদের তৃতীয় রাত। গ্রামটির একমাত্র মুসলমান বাড়ীতে পৌঁছলে তারা আমাদের আশ্রয় দিয়ে মেহমানদারী করতে অপারগতা প্রকাশ করলো। আমরা বাজারে ফিরে এলাম। একটি হিন্দু দোকানে কিছু পাকুড়া পাওয়া গেল। আনুমানিক ২৫০ গ্রাম হবে, যা দিয়ে পূর্ণ ক্ষুধা নিবারণ হলো না। তবুও তাই আহার করে আল্লাহর নাম স্মরণ করে শুয়ে রইলাম। এই গ্রামটির নাম ছিল বাথরি। এর পাঁচ মাইল দূরে 'দালহুয' নামে একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর এলাকা। ঐখানে বাস স্টেশন রয়েছে। আমাদেরকে সেখান থেকেই বাসে উঠতে হবে।

আমি সূফী সাহেবকে ভোরেই বলে দিয়েছিলাম, আজ আমি কোনক্রমেই হাঁটতে পারবো না। যেভাবেই পারেন আরোহীর ব্যবস্থা করবেন। সূফী সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করেও আরোহীর ব্যবস্থা করতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে পায়ে হেঁটেই চলতে হলো। এক একটি কদম চলায় এক একটি পৃথক শাস্তি হচ্ছিল। আল্লাহকে ডেকে ডেকে চলছিলাম। সেই সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত পাঁচ মাইল দূরত্বের দালহুযে পৌঁছলাম। অনাহারে-অর্ধাহারে তিন দিনের পায়ে চলা পথ সমাপ্ত হলো। আমরা অর্ধমৃত হয়ে গেলাম।

দালহুযের বাসে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। দালহুয থেকে পাঠান কোর্ট–পাঠান কোর্ট হতে অমৃতস্বর পৌঁছলাম। অমৃতস্বর পৌঁছে হোটেলে গিয়ে তিনদিনের ক্ষুধা নিবারণ করলাম। অমৃতস্বর হতে বুঝালকালা যাওয়ার দু'টি প্রসিদ্ধ রাস্তা। (এক) চাকওয়াল হয়ে (দুই) লাল্লাহ হয়ে ট্রেনযোগে। কিন্তু উভয় রাস্তাই আমাদের জন্য বিপদজনক ছিল। কেননা, আমার আব্বা এই পথের কাউকে টেলিগ্রাম করে আমাদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন। এই প্রসিদ্ধ রাস্তা আমাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। তাই সূফী সাহেব হোটেলে বসেই আমার সাথে এসব বিষয়ে বিষদ আলোচনা করে বললেন ঃ আমরা এখান থেকে লালামুসা, লালামুসা থেকে মিক্ওয়াল-সেখান হতে কেওড়া, সেখান থেকে চুয়াসিদানশাহ তারপর সেখান থেকে কুলার কাহার হয়ে বুঝালকালা পৌঁছবো। এই রাস্তাটি অপেক্ষকৃত নিরাপদ।

অমৃতস্বর হতে ট্রেনে আমরা লালামুসা রওয়ানা করলাম এবং সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছলাম। রাত্র লালামুসায় অতিবাহিত করলাম। পরদিন দুপুরে কেওড়া পৌঁছলাম। সেখানে সূফী সাহেবের এক আত্মীয় চাকুরী সূত্রে অবস্থান করতেন। সূফী সাহেব আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন এবং দুপুরের আহারের পর বললেন ঃ তুমি এখানে বিশ্রাম কর, আমি বুঝালকালায় একটি টেলিগ্রাম করে দিয়ে আসি যে, "আমরা আগামী কাল বুঝালকালা পৌঁছছি।"

আমাদের পরিকল্পনা মত পরদিন সকালে আমরা কেওড়া থেকে বাসে চুয়াসিদানশাহ পৌঁছে সেখান থেকে অন্য বাসে কুলার কাহার পৌঁছলাম। কুলার কাহারেও পুলিশের ভয় ছিল। কিন্তু আল্লাহ নিরাপদ রাখলেন।

বুঝালকালায় সম্বর্ধনার প্রস্তুতি ঃ

সূফী সাহেব সুবেদার খান জামান সাহেবকে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, তা

যথা সময়েই তিনি পেয়ে যান। সুবেদার সাহেব বুঝালে একথা প্রচার করে দেন যে, গাজী আহমাদ আজ দুপুরে সূফী সাহেবের সাথে বুঝাল পৌঁছবে। একথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সারা এলাকা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। পুরুষ-মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকলেই বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এলো। অনেকেই শহরের বাইরে বাস স্টেশনে এসে সমবেত হলো।

লোকদের নাকি বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, গাজী আহমাদ বুঝালে ফিরে আসতে পারে। সূফী সাহেবের জীবিত ফিরে আসাটাও অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য বোধ হচ্ছিল। বাস আসতে একটু বিলম্ব হওয়ায় মানুষের সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সুবেদার সাহেব বললেন, প্রতারণামূলক টেলিগ্রাম করা হলো কিনা তাইবা কে জানে? কেউ কেউ বললো, বাস আসতে বিলম্ব হচ্ছে, মনে হয় কুলার কাহারে পুলিশ আটকিয়েছে। অনেকে কুলার কাহার যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। এরই মধ্যে দূর থেকে দেখা গেলো বাস আসছে। সবাই যে যার জায়গায় শ্বাসরুদ্ধের ন্যায় দাঁড়িয়ে পড়লো– কি খবর আসছে কে জানে?

বাস আরো নিকটে আসার পর দেখা গেল, সূফী সাহেব বাসের ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। শতশত লোক দেখে তিনি বিজয়ের ঝান্ডা উড়াতে লাগলেন। কেওড়া থেকে তিনি এটা এনেছিলেন। লোকেরা বুঝতে পারলো সূফী সাহেব সফল হয়ে ফিরে এসেছেন। মিয়ানী বাস স্টেশনে শতশত লোকের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। লোকেরা বাস থামিয়ে আমাকে নামিয়ে নিলো। বাস স্টপ বুঝালকালা থেকে আড়াই মাইল দূর হবে। বাস থেকে নামার পর আগত লোকেরা আমার সাথে বুক মিলাতে ও আমাকে স্বাগত জানাতে লাগলো। শতশত লোক। তাদের কেউ-ই আমার সাথে বুক না মিলিয়ে ফিরে আসতে চাইলো না। এতে প্রায় দেড় ঘন্টা লেগে গেল।

বুঝালকালা আসার জন্য আমাকে একটি ঘোড়ায় চড়ানো হলো। ১ টাকাও ৫ টাকা মূল্যমানের কাগজের নোটে তৈরী মালা আমার গলায় পড়ানো হলো। টাকার মালায় আমার গলা ভরে গেলো। ইতিপূর্বে এই রাস্তায় এত লোক কখনও একত্রিত হয়নি। মিয়ানী আর বুঝালের কোন লোকই বাড়ীতে ছিলো না। সবাই আজ রাস্তায়। লোকদের মনে আমার সম্পর্কে একটা আকর্ষণও ছিল, লোভও ছিল। আমার পিতা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আদালত থেকে একটি হঠকারি পন্থায় আমাকে হিন্দুদের মধ্যে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। এ সংবাদে মিয়ানী আর বুঝালের সমস্ত মুসলমানদের মনে দারুণ ক্ষোভ ছিল। কিন্তু ইংরেজদের শাসন ছিল। তেমন কিছু করতেও পারছিলো না। আমি যখন মুসলমান অবস্থায় এলাকায় ফিরে এলাম, মানুষের সেই ক্ষোভ আনন্দে পরিবর্তন হয়ে গেলো। তাই তারা সব বাড়ী-ঘর ছেড়ে আমাকে বরণ করার জন্য বর্ণনাতীত উদ্দীপনা নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। মানুষের এই উদ্দীপনা তাদের ইসলামী আবেগ-অনুভূতিই প্রকাশ করছিল। প্রত্যেকের মুখমন্ডল ছিল আনন্দ দীপ্ত। কি আশ্চর্য! সমাজের এই গরীব-দুর্বল লোকগুলোর মাঝে একটি ক্ষুদ্র কারণে কত উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে গেল।

মিয়ানী থেকে আমাকে নিয়ে মানুষের এই আনন্দ মিছিল যখন বুঝালকালা

পৌঁছলো, তখন সূর্য অস্তের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। এত লোক! মাগরিবের সালাত খোলা মাঠে আদায় করার ব্যবস্থা করা হলো। মাগরিবের সালাতের পর সুবেদার সাহেব তার বাড়ী নিয়ে গেলেন। মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব ঐদিন বাড়ী ছিলেন না। দুই দিন পূর্বে কোথাও গিয়েছিলেন। সন্ধার পর তিনি এলাকায় এসে আমার আগমন সম্পর্কিত সংবাদ পান এবং সাথে সাথে সুবেদার সাহেবের বাড়ী পৌঁছেন। তখন তার সাথে দেখা হল।

সপ্তাহ দশদিন সাক্ষাতেই চলে গেল। এরপর স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। ইতিপূর্বে বিভিন্ন মামলা ও ঝামেলায় বেশ কিছু দিন অপচয় হয়ে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম।

ভেদরাওয়ার অবস্থা ঃ

আমি যেদিন ভেদরাওয়া থেকে পালিয়ে আসি, ঐ দিনই নেহাল চন্দ্র বাট্রুত পুলিশ স্টেশনকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন এবং আমার আব্বার নিকট লোক পাঠানো হয়েছিল। চাকওয়াল ও লাল্লাহ পুলিশকেও টেলিগ্রাম করে আমাকে গ্রেফতার করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরাতো এবিষয়টি পূর্বেই বিবেচনায় এনে এসব পথ পরিহার করে অচেনা পথে অগ্রসর হয়েছিলাম, যার কারণে আমরা নিরাপদে পৌঁছতে পেরেছি। আমাকে রাস্তায় গ্রেফতার করাতে না পেরে আব্বা নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তার জন্য আর আইনী কার্যক্রম গ্রহণ করারও সুযোগ ছিল না। আর সেটা করলে কোন লাভও হতো না। তাই আব্বা এ পথে এগুলেন না। আমি বুঝালকালা পৌঁছে সাথে সাথে আব্বাকে পত্র লিখে দিয়েছিলাম যে, "আমি নিরাপদে বুঝালকালা পৌঁছে গিয়েছি। ওখান থেকে কোন কিছুই আনিনি, যা কিছু ছিল সবই নেহাল চন্দ্র সাহেবের ওখানেই রয়েছে। আপনি আনিয়ে নিবেন।"

মায়ের সাথে সাক্ষাৎ ঃ

আমি আব্বার ওখান হতে পালিয়ে বুঝালকালার মুসলমানদের নিকট চলে আসাতে আমার আত্মীয়রা বিশেষভাবে আমার মা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এক মাস পর আমি মায়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। মা আমায় দেখে কাঁদতে লাগলেন। বললেন ঃ এটাই যদি তোমার করার সংকল্প ছিল, তাহলে আমাদেরকে আগেই বলে দিতে। আমরা আইন-আদালত করে এতগুলো টাকা খরচ করতাম না। আমি মাকে সান্তনা দিয়ে বললাম ঃ আম্মাজান আমি তো তোমাকে একাধিকবার বলেছি "আমি ইসলাম ধর্ম সত্য জেনেই কবুল করেছি। তোমরা আমাকে কিছু বলো না। আমি যতটা সম্ভব তোমাদের কাছে আসা যাওয়া করবো। তোমাদের খিদমত করবো। আমি তো তোমাদের ছেলেই রয়েছি এবং সর্বদাই থাকবো। একথা আমি আব্বাকেও বলেছিলাম। কিন্তু সেকথা তোমরা শুনলে কই। তিনি তো আমার আবেদন-নিবেদন কানে নেয়ারই প্রয়োজন বোধ করলেন না। বরং আইন-আদালত করে কত রকম কষ্ট করলেন। টাকা নষ্ট করলেন। আমাকে অবর্ণনীয়.....

(গাজী আহমাদের আর বলা সম্ভব হলো না, চোখ মুছতে লাগলেন।)

দীর্ঘ সময় মায়ের কাছে রইলাম। ভাইদেরকে আদর করলাম। তারপর চলে এলাম। এরপর আমি মাঝে মধ্যেই মিয়ানী এসে আম্মাকে সাহায্য করতাম। বাজার সদাই করে দিতাম। ভাইদের পড়া-শুনার খোঁজ-খবর নিতাম। বাড়ীর বড় ছেলের যা যা দায়িত্ব ও করণীয় ছিল তা সবই করতাম। মায়ের সাথে খুবই সদাচরণ করতাম।

মা আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। বিশেষতঃ আমার ব্যবহারে তিনি খুবই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার দিকে মা পরম স্নেহে তাকিয়ে থাকতেন। আমার আচরণ দেখে মা আমাকে একটু সমীহ করতে শুরু করেন। অন্য হিন্দু মহিলাদের সাথে আমার সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে বলতেন ঃ আর পাঁচটা ছেলের চেয়ে তার ব্যবহার ও কথাবার্তা আলাদা । আগের চেয়ে অনেক ভাল ব্যবহার। সে যদি মুসলমান না হয়ে এরূপ আচরণ করতো তাহলে সবাই তাকে দেবতার অবতার বলতো।

আমি মাকে হিন্দু ধর্মের কারণে কোনপ্রকার অবহেলা করতাম না। আঘাত দিয়ে কথা বলতাম না। তবে শান্তভাবে বলেছি "মা পরকালের মুক্তির জন্য সকল যুগেই আল্লাহর মনোনীত ও সত্য ধর্ম অপরিহার্য। বর্তমানে সেই সত্যধর্ম একমাত্র ইসলাম। এটা যিনি বুঝবেন তিনি তার মুক্তির সনদ পাবেন। আর যিনি বুঝবেন না, বুঝতে হবে তিনি মুক্তি ও কল্যাণের পথে আসলেন না।"

মা মাঝে মধ্যেই আমার কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে উঠতেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কখনও কখনও বলতেন ঃ তোমার কথা শুনতে খুব ভাল লাগে, তবে তোমার আব্বা কি এসব কথা বুঝবেন? বুঝলাম ঃ আব্বার অস্তিত্ব আমার মায়ের ঈমান আনার পথে বাঁধা।

কাশ্মীর থেকে আসার পর প্রায় বছর কাল পর্যন্ত নিমন্ত্রণের ধারা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকটি মুসলিম পরিবারই অত্যন্ত আগ্রহ ও উষ্ণ ভালবাসা প্রকাশ করে দাওয়াত করতো। বছর প্রায় শেষ হয়ে এলো, কিন্তু আমি এ জাতীয় ব্যস্ততার কারণে লেখাপড়ায় ভালভাবে মনোনিবেশ করতে পারলাম না। বছর শেষে দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছি বটে, তবে রেজাল্ট খুব দুর্বল ছিল।

গ্রীষ্মের ছুটির পর যখন পরীক্ষা নেয়া হলো তখন আমার রেজাল্ট সব বিষয়েই প্রায় ফেল এর কাছাকাছি ছিল। একদিন প্রধান শিক্ষক মহোদয় আমাকে তার অফিস কক্ষে ডেকে পাঠালেন। অন্যান্য সকল শিক্ষক তখন অফিসে ছিলেন। প্রধান শিক্ষক মহোদয় বললেন ঃ গাজী আহমাদ! তুমি আমার কঠোরতা সম্পর্কে জান। তোমার ব্যাপারে মনে হয় একটু বেশী উদাসীনতা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। তোমার পড়াশুনার অবস্থা এই রকম থাকলে বোর্ডে তোমার ফরম পাঠানো হবে না। তুমিই চিন্তা করে দেখ, হিন্দুরা কি বলবে না যে, মুসলমান হয়ে অপদার্থ হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা তাকে মেট্রিকও পাশ করাতে পারলো না।

এখনও পরীক্ষার তিন চার মাস বাকী আছে, খুব মনোযোগ দিয়ে পড়। সকল শিক্ষকবৃন্দ তোমাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবে। তোমার রেজাল্ট খারাপ হলে আমরা (মুসলমানরা) সবাই অপমানিত হবো।

প্রধান শিক্ষকের কথা আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল। ভালভাবে পড়াশুনা করার সংকল্প করলাম। দিন রাত পড়তে লাগলাম। পড়াশুনা ব্যতীত অন্যান্য সবকিছু ত্যাগ করলাম এবং প্রত্যেক সালাতের পর আল্লাহর দরবারে অধীর প্রাণে দোয়াও করতে লাগলাম।

মেট্রিক পরীক্ষা ঃ

ঐ সময় বুঝাল উচ্চ বিদ্যালয়ের মেট্রিক পরীক্ষার সেন্টার ছিল পেন্ডুদাদ খান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। আমরা যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিতে গেলাম তখন আমাদের সাথে গেলেন সহকারী শিক্ষক গোলাম কাদের সাহেব। ঐ বছর আমাদের স্কুল হতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল সতের জন। তার মধ্যে চৌদ্দজন মুসলমান ছাত্র বাকী ক'জন হিন্দু। পরীক্ষার দিনগুলোতেও নামাযান্তে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতাম। পরীক্ষা শেষ করে বুঝালেই ফিরে এলাম। ক্রমেই ফল প্রকাশের সময় ঘনিয়ে এল। আমার সম্পর্কে শিক্ষকদের তেমন উৎসাহ ছিল না, বরং আমার পাশের ব্যাপারে তাদের দ্বিধা ছিল। আমাদের রেজাল্ট ডাকযোগে আসতো। যেদিন রেজাল্ট ডাকে আসার কথা, সেদিন সব পরীক্ষার্থীসহ আরো অনেকে ডাকঘরের নিকটে অপেক্ষা করছিল। আমিও ছিলাম। প্রধান শিক্ষক বললেন ঃ গাজী আহমাদ কেমন আছ? কেন এসেছ? আমি বললাম ঃ সাথীদের সফলতার আনন্দে শরীক হওয়ার জন্য।

ডাক আসলো। থলে খোলার পর চিঠি পত্রের সাথে রেজাল্ট সিটও পাওয়া গেলো। সতের জনের মধ্যে চৌদ্দ জন পাশ করেছে। একজন প্রথম শ্রেণী, ছয় জন দ্বিতীয় শ্রেণী, সাত জন তৃতীয় শ্রেণী। আমার মনটা দুরু দুরু করছিল। আল্লাহর অনুগ্রহের পরিসীমা ছিল না। প্রথম শ্রেণীতে পাশ করার যে রোল নম্বর ছিল, সেটা ছিল আমার। উপস্থিত সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলো। শিক্ষক মন্ডলী আমাকে মুবারকবাদ দিতে লাগলেন। প্রধান শিক্ষক মহোদয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বললেন ঃ গাজী আহমাদ! তোমার এই রেজাল্ট আল্লাহর এক বিশেষ দান, যা তুমি ইসলাম ধর্মের কল্যাণে লাভ করেছ। আমার মনে পড়ে গেল স্বপ্নে নবীজীর (সাঃ) জিয়ারত লাভের সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমার সফলতার জন্য দোয়া করছি"। আজ যেন মেট্রিকের রেজাল্ট নবীজীর (সাঃ) দোয়ার বাস্তব রূপ নিয়ে আমার জীবনে এল। আমি তখনই বিশ্বাস করেছিলাম। দয়ালু নবীর (সাঃ) দোয়ায় আমার জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

সারা এলাকায় নতুন করে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বাতাস বইতে লাগলো। মায়ের কাছে দৌড়ে গেলাম। মা আগেই শুনে ফেলেছিলেন আমার রেজাল্টের খবর। মায়ের কাছে গিয়ে তার পা স্পর্শ করে চুমু খেলাম। মা আনন্দে চোখ মুছতে লাগলেন। আমার ভাইয়েরাও খুশী।

কাশ্মীর থেকে আসার পর সুবেদার খান যামান সাহেবের বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুবেদার সাহেব ও তার স্ত্রী আমাকে তাদের সন্তান ভাবতেন এবং তারা আমাকে সেভাবেই আদর ও প্রতিপালন করতেন। আমি এই

পরিবারে পিতা-মাতার স্নেহ পেয়েছি, যার কারণে সুবেদার সাহেবের দুই ছেলে মালিক মুহাম্মদ ইসহাক ও মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব আমাকে সারা জীবন তাদের বড় ভাই মনে করতেন। মালিক মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব খুবই ভদ্র, বিনম্র ও ফিরিস্তা স্বভাবের লোক ছিলেন এবং ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত, অনুসারী ও খাদেম ছিলেন। আমার কঠিন সময়ে সর্বদা আমি তাকে আমার পাশে পেয়েছি।

আমার মেট্রিক পাশের পর সুবেদার সাহেবের ইচ্ছা ছিল আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেই। কিন্তু মাওলানা আবদুর রউফ সাহেবের সাথে পরামর্শ করার পর আমরা উভয়ে একমত হলাম যে, আমি দ্বীনী শিক্ষাগ্রহণ করবো। এটা আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। মাওলানা সাহেব সম্মতি দিলেন মাত্র। এরপর আমি জান মুহাম্মদ সাহেবের বাড়ীতে আমার অবস্থান পরিবর্তন করে নিলাম।

আব্বার সাথে সাক্ষাৎ ঃ

প্রায় তিন বছর পর আমার পিতা ছুটিতে বাড়ী এলেন। এরই মাঝে আমি বুঝাল থেকে সাইকেল চালিয়ে ইসহাক সাহেবের বাগানে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় দেখলাম আব্বা একই রাস্তা দিয়ে বুঝালের দিকে আসছেন। আব্বার নিকট পৌঁছতেই আমি তাকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। আব্বা আমাকে দূর থেকে বার বার তো দেখেছেন, কিন্তু নিকটে আসার পর আরেক দিকে তাকিয়ে আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত না করে হেঁটে চলে গেলেন। আমার মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো, কিন্তু তাঁকে ডাক দিতে সাহস হলো না। আমি নীরবে দাঁড়িয়েই রইলাম। আব্বাকে দূর পর্যন্ত যেতে দেখলাম। কাশ্মীর থেকে আসার পর আব্বার সাথে এটাই আমার প্রথম সাক্ষাৎ এবং শেষ সাক্ষাৎও ছিল এটাই।

মাওলানা সাহেবের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে আমি দ্বীনী শিক্ষার প্রথম পর্ব তার কাছেই শুরু করলাম। প্রথম পর্যায়ে শেখ আত্তার, গুলিস্তা, বোস্তা, সিকান্দার নামা, ইউসুফ-জোলাইখা অর্থাৎ ফার্সী কিতাবগুলো তিন মাসেই শেষ করলাম। এরপর নাহু-সরফের কিতাব পাঠ শুরু করলাম। বুঝালকালার মানুষের সাথে বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্কের কারণে পূর্ণ সময় পড়াশুনা করা সম্ভব হচ্ছিল না, তাই মাওলানা সাহেব এলাকা ত্যাগ করার জন্য পরামর্শ দিলেন। সারগোদা জিলায় চক মংলা নামক স্থানে একটি মাদ্রাসা ছিল। মাওলানা মুনাওয়ার হুসাইন সাহেব সেই মাদ্রাসার প্রধান ছিলেন। আমি উক্ত মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হলাম। নাহু-সরফের কিতাবগুলো পড়ার পর কুরআন মজীদের অনুবাদ পড়লাম। কিন্তু ওখানে মন বসছিল না। কারণ, মাওলানা মুনাওয়ার সাহেবের সাথে আমার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী সম্পর্কে তিক্ত কথা কাটাকাটি হয়। ইসলামের সার্বজনীন ধর্ম বিশ্বাস, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে যে ব্যক্তি নবী দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফের। অথচ মুনাওয়ার সাহেব মির্জা গোলাম আহমাদকে নেক ও পরহেযগার ব্যক্তি মনে করতেন। আমি মাওলানা মুনাওয়ার সাহেবের পিছনে সালাত আদায় করা বন্ধ করে দিলাম। মাওলানা মুনাওয়ার সাহেবের কারণে মংলার বেশীর ভাগ

লোকই মির্জা গোলাম আহমদের অনুসারী হয়ে গিয়েছে। আমি উনিশ শত বিয়াল্লিশ এবং তেতাল্লিশ সনে কয়েক মাস সেখানে অবস্থানের পর অন্যত্র চলে যাওয়া জরুরী মনে করলাম।

কাদিয়ানী সম্প্রদায় তখনও বেশী প্রসার লাভ করেনি। আমি তাদের লিট্রেচার পড়তে শুরু করে দিলাম এবং আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করলাম। লোকটার দাবী সময়ে সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তন হতে থাকলো। সর্বপ্রথম সে নিজেকে মুসলিহ (সংস্কার), তারপর মুজাদ্দিদ, তারপর ইমাম মেহেদী, তারপর প্রতিশ্রুত ইমাম মসীহ দাবী করতে থাকলো এবং নবী হওয়ার দাবী করা দ্বারা পূর্ববর্তী সব দাবীর পরিসমাপ্তি ঘটালো।

আসলে মির্জা সাহেবের এইসব দাবীর প্রেক্ষাপট ও কারণ ছিল রাজনৈতিক। মির্জা সাহেব নিজেকে "ইংরেজদের বপন করা চারা গাছ" আখ্যা দিয়েছেন। তাই তিনি সর্বদা ইংরেজদের বিশেষভাবে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন। সারা জীবনই তিনি ইংরেজদের ভক্ত ছিলেন। বৃটিশ রাজত্বের (ভারতে) স্থায়ীত্বের জন্য তার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ছিল। আর এ জন্য তিনি যা যা করেছেন তা গর্বের সাথে সর্বদা বলেছেন ও লিখেছেন।

মির্জা সাহেব তার তোহফায়ে কায়সারিয়্যা বই এর ষোল পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "আমার পিতা গোলাম মুর্তাজা গভর্ণরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের এমন হিতাকাংখী ছিলেন যে, ১৮৫৭ সালে নিজের টাকা দিয়ে পঞ্চাশটা ঘোড়া ও পঞ্চাশজন যোদ্ধা দিয়ে নিজের সামর্থের অধিক সাহায্য করেছিলেন।"

'তিরিয়াকুল কুলুব' বই এর ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "আমার বয়সের বেশীর ভাগ সময়ই ইংরেজ রাজত্বের সমর্থন ও সাহায্যে অতিবাহিত হয়েছে। ইংরেজ সরকারের আনুগত্য ও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ নিষিদ্ধ করণ সম্পর্কে আমি এত বই লিখেছি যে, সেগুলোকে একত্রিত করা হলে পঞ্চশটি আলমারি ভরে যাবে।"

ইংরেজরাও মির্জা সাহেবের এই সমর্থন ও সেবার বিনিময়ে তার ভ্রান্ত আন্দোলনের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। মুসলমানদের বিদ্রোহের সংশয় ইংরেজদের ছিল। এই ব্যাপারে তারা গোলাম আহমাদ হতে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে। তারা এর উপর নির্ভর করে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার অবকাশ পেয়েছে। জিহাদ অবৈধ ও হারাম ঘোষণা দ্বারা ইংরেজরা মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর নির্যাতন করার যুক্তি পেয়েছে।

জিহাদ পুস্তিকার পরিশিষ্টের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখেছে ঃ "প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে এবং যে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে স্বীকার করেছে অদ্য হতে তাকে এই বিশ্বাসও পোষণ করতে হবে যে, এই সময় জিহাদ হারাম।"

অথচ প্রয়োজনে জিহাদ করা ফরয। ক্ষেত্র বিশেষে তা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই ফরযে আইন পর্যন্ত হয়ে যায়। মির্জা সাহেবের এই ভ্রান্ত ফতোয়া ভারতের মুসলমানরাতো দূরের কথা, হিন্দুরা পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। যদি মুসলমানরা তার এই

ভ্রান্ত ফতোয়া গ্রহণ করতো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত ইংরেজদের গোলামীর বেড়ী গলা থেকে নামাতে পারতো না।

আমি তো এ পর্যন্ত মির্জা সাহেবের জীবনের একটি দিক মাত্র আলোচনা করলাম। ব্যক্তি জীবন তো মানুষের একান্ত থাকে। কিন্তু মির্জা সাহেবের একান্ত জীবনের যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে, সেটুকুও যদি আলোচনা করি, তাহলে সকলেই বুঝতে পারবেন, তার জীবন নবী জীবনের উচ্চ আদর্শও আখলাকের সম্পূর্ণ বিপরীত। মির্জা গোলাম আহমদের ধর্মীয় দর্শন ছিল ভারতের মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং তার নাগরিক ভূমিকাও ছিল ভারতবাসীর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ তার ধর্ম বিশ্বাস ছিল কুফরী, আর তার নাগরিক অবস্থান ছিল ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী। পরবর্তীকালে আমি যখন শিক্ষা অধিদপ্তরে চাকুরী করতাম, তখন আমাকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পরীক্ষা গ্রহণের সময় বেরওয়া কলেজ সেন্টারের হল নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করা হয়। সে সময় বিশ পচিশ দিন বেরওয়া কলেজে অবস্থান করতে হয়েছে। এক রবিবার পরীক্ষা বন্ধ থাকার কারণে মির্জা নাসিরের সাথে দেখা করতে গেলাম। মির্জা গোলাম আহমাদ তখন বেঁচে নেই। মির্জা নাসিরই লোকদেরকে সাক্ষাৎ দেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে নির্দেশনা দেন। আমি সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তালিকায় নিজের নাম লিখালাম। ত্রিশতম ক্রমিকে আমার নাম লিখানো সম্ভব হলো। আর তার একান্ত সচিবকে বললাম ঃ যদি সম্ভব হয় একটু পূর্বে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। পরীক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সমস্যা রয়েছে। একান্ত সচিব মির্জা সাহেবকে ফোনে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি আমার নাম দর্শনার্থীদের ২য় ক্রমিকে লিখতে বললেন।

প্রথম নাম ছিল ডঃ আব্দুস সালামের। সাক্ষাতের পর্ব শুরু হলে ডঃ আব্দুস সালাম ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রায় আধা ঘন্টা পর্যন্ত একান্তে আলাপরত রইলেন। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলে আমাকে ডেকে নেয়া হলো। মির্জা নাসির দ্বিতীয় তলায় ছিলেন। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলাম। কক্ষের দরজায় মির্জা নাসির দাঁড়ানো ছিলেন। আমাকে দেখে সৌজন্য হাসি দিয়ে বললেন আসুন! আসুন!! স্বাগতম! স্বাগতম!! বসবার পর মির্জা নাসির বললেন ঃ আমি অবহিত হয়েছি আপনি আপনার পৈত্রিক ধর্ম অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

আমি বললাম ঃ ঠিকই বলেছেন আপনি। আমিতো হিন্দু পরিবারেই জন্ম গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন।

মির্জা নাসির ঃ আমি একথা জানতে পেরেছি স্বয়ং রাসূলে পাক (সাঃ) স্বপ্নযোগে আপনাকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত করেছেন।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, জনাব এরূপ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বরকতময় হাত ধরে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

মির্জা নাসির ঃ আনন্দ ব্যক্ত করে বললেন ঃ সত্যিই আপনি মহাভাগ্যবান। বরং আমি বলবো আপনি ইসলাম ধর্মের সত্যতারই প্রমাণ। মির্জা নাসির আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কীয় বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকলেন। আর আমি তার জবাব দিয়ে

গেলাম। আমারও প্রায় আধা ঘন্টা আলাপ চারিতায় চলে গেল। এরপর বললাম ঃ জনাব যথেষ্ট সময় আমি নিলাম। নীচে অনেক সাক্ষাত প্রার্থীরা অপেক্ষা করছে। এবার অনুমতি চাইবো, তবে আপনি যদি বেয়াদবী মনে না করেন, তাহলে ছাত্রের ন্যায় ছোট একটি প্রশ্ন করবো, যার জবাব পেলে খুবই কৃতার্থ হব।

নাসির সাহেব প্রসন্নতার সাথে অনুমতি দিলেন। জিজ্ঞাসা করুন কি আপনার প্রশ্ন। উত্তর দেয়া তো আমাদের প্রাত্যহিক বিষয়।

আমি বললাম ঃ যেমন আপনারও জানা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বপ্নযোগে আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়ে ধন্য করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর বাণী হল "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে"। এই হাদীসের ভাষ্য অনুসারে আমার বিশ্বাস হলো আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেই দেখেছি ও তাঁর নিকট হতেই দ্বীন গ্রহণ করেছি।

জনাব আপনারাতো নবুওয়তের সিলসিলারই দাবীদার, যদি আপনাদের এই সিলসিলা আল্লাহর নিকট সঠিক হতো তাহলে নবীজী (সাঃ) যখন আমাকে নিজ হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করালেন তখন তিনি আমাকে অবশ্যই একথা বলতেন ঃ তুমি মুসলমান হয়ে গিয়েছ। এবার তুমি তোমার দ্বীনের পূর্ণতার জন্য কাদিয়ান যাও এবং সেখানে গিয়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান শিক্ষালাভ কর। একজন নবী আরেকজন নবীর কথা এড়িয়ে যেতে পারেন না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আপনাদের কোন আলোচনাই করেননি তাতেই একথা প্রমাণিত হয় গোলম আহমাদ নবী নন। আপনাদের এই সিলসিলা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। নবী না হয়ে নবী দাবী করা কত জঘন্যতম মিথ্যাচার তা কি ভেবে দেখেছেন?

আমার প্রশ্ন শুনে মির্জা নাসির বললেন ঃ এই প্রশ্ন আমি জীবনে প্রথম শুনলাম। আপনার প্রশ্নের যৌক্তিকতায় তো দ্বিধার অবকাশ নেই, তবে নীচে তো অনেক দর্শনার্থী অপেক্ষা করছে পরে কোন সাক্ষাতে এর জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো। আমি বললাম, আচ্ছা চলি। ছোট্ট আরেকটি প্রশ্ন–আমি মির্জা সাহেবের লেখা পড়েছি। তিনি লিখেছেন আমি ও আমার সম্প্রদায় ফিক্হী মাসাইল এর বিষয়ে ইমাম আবু হানিফার মুকাল্লিদ বা অনুসারী। নাসির সাহেব আমিও হানাফী মাযহাবেরই অনুসারী, আমার কথায় মির্জা নাসির আনন্দই প্রকাশ করলেন। আমি বললাম ঃ মির্জা গোলাম আহমাদ সাহেব তো নিজেকে নবী দাবী করেন। ইমাম আবু হানিফা তো নবী নন। তিনি হলেন উম্মত। একজন নবী একজন উম্মতের মুকাল্লিদ হবে, আপনি বলুন এটা নবীর নবুওয়তের মর্যাদার অসম্মান নয়?

মির্জা নাসির বললেন ঃ এ প্রশ্নের জবাবও আরেক দিন দিব।

আমি চলে এলাম। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়তের প্রতি আমার ঈমান আরো দৃঢ় হলো। মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর সর্বশেষ নবী। তাঁর দ্বীন পূর্ণাঙ্গ। এরপর যেই নবী দাবী করবে সে-ই মিথ্যাবাদী-দজ্জাল বলে গণ্য হবে।

পিন্ডিঘেব-এ আগমন ঃ

ম্যাঙ্গোলার অধিবাসীরা খুবই অতিথীপরায়ণ। আমার সেখানে থাকাকালীন সময়

তারা আমার খুবই খিদমত করেছে। ম্যাঙ্গোলার লোকদের আমি শুকরিয়া আদায় করছি।

আমার ম্যাঙ্গোলায় থাকা যেহেতু সম্ভব হলো না, তাই "পিন্ডিঘেব" চলে এলাম। সেখানে 'খাদেমুশ্ শরীয়ত' নামে একটি মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসার মহা ব্যবস্থাপক ছিলেন মাওলানা কাজী শামছুদ্দীন সাহেব। কাজী সাহেব খুবই বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। আমি উক্ত মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর ফিকাহ, নীতিশাস্ত্র, বালাগাত, আরবী সাহিত্য মানতেক, দর্শন, ইত্যাদি বিষয়ের প্রাথমিক কিতাব পড়তে শুরু করলাম। এসব কিতাবগুলো আমি কাজী সাহেবের নিকটই অধ্যয়ন করছিলাম। দুই বছর পর কাজী শামসুদ্দীন সাহেবকে দারুল উলূম দেওবন্দ ডেকে নিয়ে তাঁকে সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করা হলো।

দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন ঃ

কাজী সাহেব দেওবন্দ যাওয়ার সময় আমাকেও সাথে নিয়ে গেলেন এবং আমি সেখানে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব পড়তে লাগলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিভিন্ন অক্ষমতার কারণে দেওবন্দ মাদ্রাসায় বেশী দিন থাকা সম্ভব হলো না। দেড় বছর সেখানে অধ্যয়ন করে তারপর গুজরাট চলে এলাম। 'ইশাআতুল কুরআন' নামে গুজরাটে একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা ছিল। সাইয়্যেদ ইনায়েতুল্লাহ শাহ সাহেব বুখারীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাওলানা মুহাম্মদ ফাজেল সাহেব এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইসলামী জ্ঞান-গরিমায় অনন্য সাধারণ পন্ডিত ছিলেন। মাওলানা গোলাম রসূল সাহেব আমাকে পড়াতে শুরু করলেন। প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ ফাজেল সাহেব খুবই স্নেহ বাৎসল ব্যক্তি ছিলেন। আমাকে তিনি কল্পনাতীত আদর করতেন। আমি এ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে হাদীস, হাদীসের উসূল, ফিকহের উসূল, আরবী সাহিত্য, আরবী হস্তলেখা, মানতিক, দর্শন, ইসলামী উত্তরাধিকার, সৌর বিজ্ঞান, তর্ক শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে দরসে্ নিযামীর পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করলাম।

আমার পড়াশুনার বিষয়ে মাওলানা মুহাম্মদ ফাজেল সাহেব বিশেষ খোঁজ-খবর রাখতেন এবং এ ব্যাপারে আমি তাঁর সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি। দিন ও রাতে আমাকে প্রায় আঠার ঘন্টা পড়াশুনায় বিমগ্ন রাখতেন। মাদ্রাসার সব উস্তাদই আমার উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। আমিও উস্তাদগণকে পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম। তাই আমি তাদের আন্তরিক দোয়াও লাভ করেছিলাম।

দেশ বিভাগ ঃ

১৯৩৮ ইংরেজীতে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। লেখা পড়া ও বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে নয়টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। বেনিয়া ইংরেজরা ছল-চাতুরী আর কুট কৌশল দ্বারা দখল করে নিয়েছিল ভারত উপমহাদেশ। তারপর থেকে তারা বন্দুক ব্যবহার করে অত্যাচার-নির্যাতন করে প্রায় দু'শ বছর দখল করে রাখে এদেশ। কিন্তু একদিন এমন এলো ভারত ছেড়ে যেতে তারা বাধ্য হলো।

অতএব, ১৯৪৭ইং আগষ্টের দিকে ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে ভাগ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা হয়ে গেল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধতে লাগলো। আমি আমার মা ও ভাইদের জন্য উদ্বিগ্ন হলাম। আমাদের পৈত্রিক এলাকা পড়লো পাকিস্তান অংশে। এখানে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ হতে পারে, তাই আমি পরদিনই গুজরাট ছেড়ে বুঝালকালা পৌঁছলাম। নূরপুর আমাদের নিকটতম এলাকা। খবর পেলাম গত রাত্রে নাকি সেখানে প্রচন্ড দাঙ্গা হয়েছে। আমি খুব ভোরেই মিয়ানী পৌঁছলাম। আমার মা ও ভাইয়েরা আমাকে দেখে স্বঃস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আমি মাকে ও ভাইদেরকে বুঝালকালা নিয়ে এলাম। সুবেদার সাহেব তার বাড়ীর একটা অংশ ছেড়ে দিলেন। বাড়ীর মূল্যবান ও জরুরী সামান পত্রও নিয়ে এসেছিলাম। বুঝালকালা ও আশ-পাশের মুসলমানদের নিকট আমি এত পরিচিত ও প্রিয় ছিলাম যে আমার মা ও ভাইদের উপর কেউ মন্দ ইচ্ছায় তাকিয়েও দেখলো না।

এলাকার হিন্দুরা হিন্দুস্তান চলে যাচ্ছে। সরকার চাকওয়ালে আশ্রয় শিবির স্থাপন করেছে। পার্শ্ববর্তী এলাকার হিন্দুরা আশ্রয় শিবিরে গিয়ে জড়ো হয়েছে। সরকার রেলগাড়ী যোগে তাদেরকে হিন্দুস্তান পাঠাচ্ছে। আশ্রয় শিবিরের চতুর্দিকে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে তারা নিরাপদ থাকে। আমার পিতা বাড়ী এলেন না। আমি তাকে টেলিগ্রাম করে এই অনুমতি চাইলাম যে, "মাকে ও ভাইদেরকে আশ্রয় শিবিরের পরিবর্তে আমার কাছে রেখে দেই।" কিন্তু আব্বা অনুমতি দিলেন না। নিরুপায় হয়ে তাদেরকে সেনা প্রহরায় চাকওয়াল পাঠিয়ে দিলাম।

আমি নিয়মিত চাকওয়াল গিয়ে মা ও ভাইদেরকে দেখে আসতাম। প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনে দিয়ে আসতাম। আশ্রয় শিবির হওয়া সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে তারা আরামেই ছিল। আমার প্রতিদিনের আসা যাওয়ায় শিবিরের নিরাপত্তা কর্মীরা আমাকে চিনতো। সে কারণে যে কোন সময় আশ্রয় শিবিরের ভিতরে যাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন অসুবিধা হতো না। আমার মায়ের কারণে ক্যাম্পের সবাই আমাকে চিনতো। আমার সম্পর্কে সবারই জানা ছিল। মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, আচার-আচরণ দেখে সবাই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য মহিলারা মাকে বলতো, এমন ভাল ছেলে আর হয় না। আফসোস! সে যদি মুসলমান না হতো!

আমি বললাম, মুসলমান না হলে আমি আমার মায়ের এত খিদমত করতাম কিনা সন্দেহ। ইসলামের নির্দেশ ও প্রেরণায়ই তো আমি আমার মায়ের এই খিদমত করছি। আমার ইসলাম বলেছে, এই মায়ের পদতলে জান্নাত। পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

মহিলারা বলতো সোনা মানিক, এই এলাকার সব মুসলমানরা তোমার মত হলে আমাদের কি বাড়ী-ঘর ছেড়ে হিন্দুস্তান যেতে হতো?

আমার খালা যখন আশ্রয় শিবিরে যাচ্ছিলেন তখন তিনি আমার মায়ের মাধ্যমে একটি মুখবাঁধা বস্তা আমার নিকট রেখে গিয়েছিলেন। খালা বললেন, আমরা যদি নিরাপদে চাকওয়াল আশ্রয় শিবিরে পৌঁছতে পারি তাহলে তুমি এটা সেখানে পৌঁছে

দেয়ার ব্যবস্থা করো। অন্যথায় এটা তোমার কাজে লাগবে। খালাকে আমি বললাম, আল্লাহ আপনাদেরকে পৌঁছে দিন। আমি এটা যথাসময়ে আপনার কাছে পৌঁছে দিব। আমার সম্পদের প্রয়োজন নেই, আপনাদের কাছে তা চাইওনা। আমি যে ঈমানের সম্পদ পেয়েছি, তা নিয়ে মরতে পারলে আমার সম্পদের পরিসীমা থাকবে না। সূফী জান মুহাম্মদ সাহেবের বাড়ীতে এই বস্তাটা রেখে দিলাম। কয়েকদিন পর আমার কৌতুহল হল দেখিতো খালা বস্তার মধ্যে কি রেখেছেন? আমি আর সূফী সাহেব বস্তাটা খুললাম। দেখলাম কাপড়ে পেচানো ভারী কি যেন। পরে দেখলাম দুই সের স্বর্ণ এবং বিশ-বাইশ সের রৌপ্য। আশ্চর্য হলাম খালা কত সম্পদ রেখে গেছেন তা দেখে। যেভাবে বাঁধা ছিল বস্তাটি সেভাবেই বেঁধে রেখে দিলাম।

একদিন বিকালের দিকে সংবাদ পেলাম আগামীকাল সকালে একটি স্পেশাল ট্রেনে চাকওয়ালের আশ্রয় শিবিরের হিন্দুদেরকে হিন্দুস্তান নিয়ে যাওয়া হবে। সাথে সাথে খালার আমানতের কথা মনে পড়ে গেল। সূফী সাহেবও বাড়ীতে ছিলেন না। আল্লাহর উপর ভরসা করে একাই চাকওয়াল যাওয়ার সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করলাম। খালার আমানত পৌঁছাতেই হবে। বস্তাটা সাইকেলের পিছনে বাঁধলাম এবং দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলাম। রাস্তায়ই সূর্য ডুবে গেল। এই সময় রাস্তা মোটেও নিরাপদ ছিল না। এক জায়গায় কয়েকজন শিখের লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু মন তাড়া দিল "আমানত অবশ্যই পৌঁছানো উচিত?"

আশ্রয় শিবিরে যখন পৌঁছলাম তখন ইশার সময় হয়ে গিয়েছিল। সেনা সদস্যরা বললেন, অনেক বিলম্ব করে ফেলেছ। আমি বললাম, একটি বিশেষ প্রয়োজনে আসতে হল। সেনা সদস্যরা শিবিরে প্রবেশ করতে দিলেন। আমি যখন বস্তা নিয়ে পৌঁছলাম খালা-খালু সীমাহীন খুশী হলেন। আমার জন্য বিরামহীনভাবে দোয়া করতে লাগলেন। কারণ, তাদের তো জানা ছিল বস্তার মধ্যে কি কি রয়েছে। আমি যাওয়ার পর সে রাতে ক্যাম্পের বহু হিন্দু আমার নিকট জড়ো হয়ে গেল। সবাই আমার আমানতদারীর প্রশংসা করতে লাগলো। একজন বলে উঠলেন ঃ হিন্দু রক্ত, আমানতদার হবে না কেন?

আমি বললাম ঃ জনাব ঠিক বলেননি। আমি যদি মুসলমান না হতাম, তাহলে এই মাল পৌঁছাবার এত তাকিদ অনুভব করতাম না। আমি অমুসলিম হলে এই মাল অন্য কোথাও পৌঁছে যেত। ইসলামের কঠোর নির্দেশ 'যার আমানত তাকে পৌঁছে দাও।' অন্যথায় আমানত দ্রব্য কাঁধে করে কিয়ামতের দিন উঠতে হবে। আল্লাহর শোকর আমি আমার খালার আমানত তাকে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি।

উপস্থিত সবাই নীরবে অভিভূত হয়ে আমার কথা শুনছিলেন। ঐ ব্যক্তি এবার বললেন ঃ সব মুসলমান যদি তোমার মত হতো তাহলে কি আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া লাগতো।

আমার মা খুবই খুশী হলেন যে, আমার কারণে তার মুখ উজ্জল হলো। আমিও কম খুশী ছিলাম না এই ভেবে যে, আল্লাহ আমাকে একটি আমানত পৌঁছাবার তৌফিক দান করেছেন। আমি যদি এই আমানত না পৌঁছাতাম, তাহলে সে কারণে হিন্দুরা ইসলামের দুর্নাম করতো। আল্লাহর শোকর আমার কারণে ইসলামের দুর্নাম

করার সুযোগ তারা পায়নি।

আশ্রয় শিবিরের লোকেরা বললো ঃ আগামীকাল সকালের বিশেষ ট্রেনের খবর সঠিক নয়। জানি না কবে পর্যন্ত ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। ক্যাম্পে থাকতে থাকতে তো আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। উক্ত রাত্রে আমি ক্যাম্পেই মায়ের নিকট ছিলাম। সকালে আসার সময় আমি মাকে বললাম ঃ মা ক্যাম্পে যখন আসছেন আজ হোক বা কাল হোক আপনারা হিন্দুস্তান চলেই যাবেন। আমার পক্ষেতো আর হিন্দুস্তান যাওয়া সম্ভব নয়। বাকী জীবনে আমাদের একে অপরের সাথে দেখা হয় কিনা আল্লাহই ভাল জানেন। আপনারা তো সবাই একসাথে যাচ্ছেন, আর আমি একা থেকে যাচ্ছি। আপনি যদি অর্জুনকে আমার কাছে রেখে যেতেন তাহলে দুই ভাই সুখে দুঃখে একজন আরেকজনের কাজে আসতো! মা রাজী হলেন এবং অর্জুনকে রেখে যেতে স্বীকার করলেন।

আমি মায়ের নিকট গেলে তিনি যেমন খুশী হতেন, তেমন বিরামহীন ভাবে দোয়া করতে থাকতেন। আমি তো মায়ের দোয়ার ভিখারী। মায়ের দোয়া পরম সম্পদ।

মা ক্যাম্পে যাওয়ার পর আমি প্রতিদিন তার সাথে দেখা করতে যেতাম। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে যেতাম। একদিন আমার জ্বর হলো, তাই যেতে পারলাম না। সেদিনই নাকি বিশেষ ট্রেন এলো এবং সব হিন্দুরা হিন্দুস্তান চলে গেলো। আমি তৃতীয় দিন ক্যাম্পে গিয়ে দেখলাম ক্যাম্প শূন্য। শুনলাম গতকাল বিকালে সবাই চলে গিয়েছে।

ক্যাম্পের পার্শ্বে এক মুসলমানের একটি হোটেল ছিল। হোটেলের মালিকের নাম ছিল মালিক গোলাম মুহিউদ্দিন। ঐ হোটেলে মাঝে মধ্যে খানা খেতাম, বসতাম, বিশ্রাম করতাম। তাই তার সাথে বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল,। তিনি বললেন ঃ যাওয়ার পূর্বে তোমার মা তোমার ভাই অর্জুনকে নিয়ে আমার হোটেলে এসেছিল এবং অর্জুনকে তোমার নিকট পৌঁছাবার জন্য আমার নিকট রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তোমার অন্য আত্মীয়রা এসে তাকে নিয়ে যায়।

আফসোস! শেষবারের মত মমতাময়ী মায়ের মুখ খানা দেখতে পারলাম না। রক্তের আত্মীয় বলতে আর কেউ রইলো না। বুকের পাঁজড় ভেঙ্গে কান্না আসতে লাগলো। মুহিউদ্দিন সাহেব সান্তনা দিতে লাগলেন। কিন্তু কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। জীবনে একত্রে এত কান্না কখনও আসেনি। মায়ের জন্য বুকটা শূন্য-খা-খা করছে। দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে চোখের পানি মুছতে মুছতেই বুঝালকালা ফিরে এলাম।

রাস্তা সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন ছিলাম। ট্রেনেও আক্রমণ করা হতো। হিন্দুস্তানীরাই প্রথমে মুসলমানবাহী ট্রেনে আক্রমণ করেছিল। আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকলাম, যেন আমার মা ও ভায়েরা নিরাপদে পৌঁছতে পারে। আল্লাহর শোকর-কিছু দিনের মধ্যেই এক ভায়ের পত্র এলো যে, তারা নিরাপদেই হিন্দুস্তান পৌঁছে গিয়েছে এবং তারা 'নালাগড়ে' নিবাস গ্রহণ করেছে। হিন্দুস্তান গিয়ে দুই ভাই মেট্রিক পাশ করে সেনা বাহিনীতে চাকুরী নিয়েছে আর এক ভাই স্বাস্থ্য খারাপ থাকার কারণে ৭ম শ্রেণী অতিক্রম করতে পারেনি।

আব্বার পরলোকগমন ঃ

দেশ বিভাগের দুই বছর পর আব্বা মারা যান। মা ভাইদেরকে নিয়ে আম্বালা জিলার সাড়ুরা এসে আবাস গ্রহণ করেন। আমি মাকে পত্র লিখলাম আমার তো হিন্দুস্তান আসা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। হিন্দুরা এখনও মুসলমানদের উপর ক্ষুব্ধ। বিশেষ ভাবে তারা নও-মুসলিদেরকে চোখের কাটা মনে করে। তাই আমার আসা সম্ভব নয়। সুতরাং আপনি যদি ওয়াগা সীমান্তে আসতেন তাহলে আপনার দর্শন লাভে কৃতার্থ হতাম।

আমাদের মধ্যে পত্র আদান-প্রদান রইলো। পত্রেই দিন তারিখ ধার্য হলো এবং সেই তারিখে অর্জুনকে নিয়ে মা ওয়াগা সীমান্তে এলেন।

আমি জান মুহাম্মদ সাহেবকে নিয়ে লাহোর রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং সকালে আমিও নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। কিন্তু চেক পোষ্টের অফিসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন ঃ প্রথমে সরকারের (কর্তৃপক্ষের) অনুমতি আন। তারপর সাক্ষাৎ হবে। আমি বললাম, ঐ যে কাটা তারের বেড়ার অপর পার্শ্বে ভারতীয় অংশে আমার মা ও ভাই দাঁড়িয়ে আছেন আমি যদি অনুমতি আনতে চলে যাই তাহলে আর তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু লোকটি আমার কাকুতি-মিনতি শুনেও দয়া করতে রাজী হলো না। আমি নিরাশ হয়ে কাঁদতে শুরু করলাম।

এরই মধ্যে একজন ভদ্র মহিলা সেখানে এলেন। তিনি আমাকে কাঁদতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে সব কথা খুলে বললাম। মহিলার মনে দয়া এলো–ফলে আমি অনুমতিও পেয়ে গেলাম। ওহ্ মা সন্তানের প্রাণের সে যে কি আকর্ষণ, আমি তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত মায়ের সামনে বসে আলাপ-আলোচনা করলাম। এটাই ছিল গর্ভধারীণী মায়ের সাথে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা বলা। এরপর ভাইদের সাথেও সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি।

মা ও ভাইয়েরা হিন্দুস্তান চলে যাওয়ার পর আমি আমাদের নিজ বাড়ী মিয়ানীতে গিয়ে বসবাস শুরু করি। আল্লাহর কুদরতের রহস্য বুঝা মুশকিল "ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে আমাকে যেই গৃহ ছেড়ে যেতে হয়েছিল সেই একই গৃহ ইসলাম গ্রহণের কারণেই আমার নিবাস হল।"

পৈত্রিক সম্পত্তি সম্পর্কে তো আমার জানা ছিল, তাই ঐগুলোও আমি আমার দখলে এনে দশ-বার বছর ভোগ করেছিলাম। কিন্তু একজন তহশিলদার ঘুষ খেয়ে অন্য একজনের নামে সেগুলো বরাদ্দ দিয়ে দেয়। তহশিলদার প্রথমে আমার নিকট ঘুষ দাবী করেছিল। কিন্তু আমি গুনাহ মনে করে ঘুষ দিতে অস্বীকার করি। আমার মন ঘুষ দেয়ার ঘোর বিরোধী ছিল। তাই পৈত্রিক সম্পত্তিও চলে গেল। পরবর্তী সময়ে আমি এ নিয়ে কোন দুঃখ করিনি। আমি জমির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি। আল্লাহ আমার রিযিকদাতা। তিনি আমার রিযিক দেওয়ার জন্য এই জমির মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ আমাকে পরবর্তী সময়ে কোন দৈন্যে রাখেননি। আমি তো নিশ্চিন্ত জীবনই যাপন করছি। আল্লাহর শোকর।

দরসে নিযামীর পাঠ্যসূচী শেষ করার পর বিভিন্ন কাজের সাথে পড়াশুনাও চালিয়ে যাই। ১৯৪৮ সালেই "মওলভী ফাজেল" এর পরীক্ষা দিলাম। আল্লাহর

অসীম দয়ায় আমি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করি।

কর্মজীবন শুরু ঃ

শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্ম জীবনে প্রবেশ করলাম। ঝিলাম জিলার নূরপুর জিলা বোর্ড মডেল স্কুলে (Untrained Teacher) হিসেবে যোগদান করলাম। ত্রিশ টাকা মূল বেতন, আর বিশ টাকা বিশেষ ভাতা ধার্য হলো।

শিক্ষকতার সাথে সাথে নিজের পড়াশুনাও চালিয়ে গেলাম। ১৯৪৯ সালে 'মুনশী ফাজেল' এর পরীক্ষা দিলাম। এ পরীক্ষায়ও রাওয়াল পিন্ডি ডিভিশনে সর্বোচ্চ নম্বর পেলাম। নূরপুর মডেল স্কুলে আমাকে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর উর্দু ও ফারসীর ক্লাশ দেয়া হলো।

বিবাহের উদ্যোগ ঃ

আমার মা ও ভাইয়েরা হিন্দুস্তান চলে যাওয়ার পর পাকিস্তানে আমি একা হয়ে গেলাম। আল্লাহর শোকর তাদের যাওয়ার পূর্বে আমার মাদ্রাসার পড়া শেষ হয়েছিল। ইতিপূর্বে বৈবাহিক বিষয়ে আমার উপর করুণা করতে অনেকেই খুব উৎসাহী ছিল। আমার সম্পর্কে যারা জানতেন তাদের অনেকেই আমাকে জামাই বানাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে আমাদের পরিবার হিন্দুস্তান চলে যাওয়ার পর আমাদের মিয়ানীর বাড়ীতে আমি একা বসবাস করছি। এলাকার মধ্যে আমাদের বাড়ী যেহেতু সচ্ছল ছিল, তাই বাড়ী-ঘর বড় ও সুন্দর ছিল। আমি এদিক সেদিক কোথাও গেলে বাড়ী খালিই থাকতো। তাই অনেকেই আমাকে তাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করতে খুবই উৎসাহী ছিল। এমন লোকও কম ছিল না, যারা দ্বীনি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করতে আকাংখী ছিল।

সাধারণভাবে আমার এ বিষয়ের মুখপাত্র ছিলেন সূফী জান মুহাম্মদ সাহেব। তার মাধ্যমেই কন্যা পক্ষের সাথে কথা চালাচালি হতো। বিয়ে শাদীর ব্যাপার তো খুবই স্পর্শকাতর, তাই এটা-ওটা দেখিয়ে কথা অগ্রসর হতো না। তাছাড়া বিষয়টি তো তাকদীর সম্পর্কিত। আল্লাহর কলম যেখানে লিখা আছে সেখানেই হবে।

নূরপুর স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগে এই এলাকার প্রায় সকলের সাথেই পরিচিত হয়ে গেলাম। কাজী মুহাম্মদ রশীদ সাহেব নামক এক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তার এক ছেলে মুহাম্মদ আমিন আমাদের স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। কাজী সাহেব এলাকায় যেমন সম্মানিত ছিলেন তাদের পরিবারও ছিলো সম্ভ্রান্ত। এক নামেই সবাই চিনতো। তিনি একদিন স্কুলে এসে মুহাম্মদ আমিন সম্পর্কে আলাপ করলেন। পাশাপাশি আরো বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলো। এই প্রশ্নও তিনি করলেন "আমি বিবাহ করেছি কিনা?" আমি সসংকোচে জবাব দিরাম "এখনও তা বাকী রয়েছে।"

কাজী সাহেব পরদিন আবার এলেন। আমাকে একান্তে নিয়ে বললেন ঃ কাল বাড়ী গিয়ে আপনার সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমার স্ত্রী আপনার প্রতি খুবই দুর্বল। কারণ, আপনার ইসলাম ধর্মগ্রহণ ও তার পরবর্তী সব ঘটনাই তিনি শুনেছেন

এবং প্রভাবিত হয়েছেন। আমরা উভয়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আপনার কাছে আমাদের বড় মেয়েকে বিবাহ দেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি। আপনি আমাদের সম্পর্কে জেনে অবহিত হয়ে এ আত্মীয়তা গ্রহণ করলে আমরা ধন্য হবো, নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করবো। আমি তাৎক্ষণিক শুধু এতটুকু বললাম ঃ আপনার মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ ও কৃতার্থ। দু' তিন দিন পর আমি এ বিষয়ে আপনাকে অবহিত করবো।

সূফী সাহেবের কাছে আরেক ব্যক্তি প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল। ঐ রিশ্‌তা বিভিন্ন কারণে আমার পছন্দ ছিল না। স্কুল ছুটির পর আমি সূফী সাহেবের নিকট গেলাম এবং কাজী সাহেবের প্রস্তাবনা সম্পর্কে তাকে জানালাম।

সূফী সাহেব বললেন ঃ এত উচ্চ বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রস্তাবনা থাকলে অন্যদিকে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি তাদেরকে ভাল ভাবেই জানি। এলাকায় তারা খুবই পরিচিত। তাদের মর্যাদা সকলের নিকট স্বীকৃত। সমস্ত পরিবারটি দ্বীনদার ও সম্পদশালী। আপনি তাদেরকে সম্মতি দিন। আমার সাথে দেখা হলে আমিও কথা বলবো; বরং এই প্রস্তাব দেয়ার জন্য তার শুকরিয়া আদায় করবো। তৃতীয় দিন আমি মুহাম্মদ আমিনের মাধ্যমে কাজী সাহেবকে সালাম পাঠালাম। পরদিন তিনি স্কুলে এলেন। আমি কাজী সাহেবকে বললাম ঃ জনাব আমি সূফী সাহেব এর সাথে কথা বলেছি। উত্তম হলো আপনারা মিয়ানীতে এসে আমার বাড়ী-ঘর ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় দেখুন এবং জানুন। তারপর উভয় পক্ষ বসে শুভ কাজের শুভ আলোচনা করা যাবে। কাজী সাহেব বললেন ঃ আমরা বাড়ী-ঘর দেখতে চাইনা। আপনাকে দেখেছি তাই যথেষ্ট। আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এই উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আপনার সম্মতির প্রতীক্ষায় আছি। কাজী সাহেবের এই কথা শুনে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করে দিলাম।

কাজী সাহেবদের গোত্র ছিল খুব বড়। গোত্রের মধ্যে কেউ কেউ আহলে হাদীস হয়ে গিয়েছিল, বাকীরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল। কাজী সাহেবের চার পুত্র চার কন্যা। বড় কন্যার সাথেই আমার বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। পরিবারের সবাই নামায-রোযার পাবন্দ ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র পরিবহন ব্যবসা করতেন। তৃতীয় পুত্র মুহাম্মদ আমিন আমাদের স্কুলে পড়তো। আমার সাথে তার সম্পর্ক সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। তার আচরণে আমি আপন ভায়ের স্নেহ পেয়েছি। আমার জন্য জান লুটিয়ে দিতে চাইতো। ছোট ছেলে আবদুল ওয়াহ্‌হাব পরবর্তী কালে অর্থনীতিতে এম,এ পাশ করেছিল।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে আমাকে নূরপুর মডেল স্কুল থেকে বুঝালের জেলা বোর্ড হাই স্কুলে বদলী করা হলো। ১৯৫১ সালে এই স্কুল সরকারী করণ করা হলো। এরই সাথে আমি সরকারী সার্ভিসে প্রবেশ করলাম।

বিবাহের ব্যাপারে খুব একটা তাড়াহুড়া করলাম না, তবে বিষয়টি স্থির হয়ে রইলো। ১৯৫৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর বিবাহের দিন ধার্য হলো। বিবাহের দিন যত নিকটবর্তী হতে লাগলো আমার মনে কিসের যেন একটা অভাব তীব্র ভাবে অনুভূত হতে লাগলো। আমার এই আনন্দপর্বে যাকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ হতে লাগলো,

যার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, তিনি আমার স্নেহময়ী মা। মায়ের প্রত্যাশায় বুকটা হাহাকার করতে থাকলো। অনেক অভাব বিকল্প দ্বারা দূর করা যায়, কিন্তু মায়ের অভাব? পৃথিবীর সবাইও যদি বলে মায়ের বিকল্প আছে আমি তা স্বীকার করবো না। আমার বিবাহ অথচ আমার মা বেঁচে থেকেও উপস্থিত নেই। আমি জানি আমার পাঠকরাও জানবেন, আমার মা কেন উপস্থিত নেই। কোথায় আছেন তিনি।

আমার মায়ের সাথে আমার যে আকর্ষণ ছিল, আমার পিতার সাথে তার হাজার ভাগের এক ভাগও ছিল না। জন্মের পর বিবেক-বোধ হওয়ার পর মাকেই তো দেখেছি। পিতা থাকতেন দূরে। দু'তিন বছরে একবার আসতেন। মায়ের কাছে ছিলাম প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্ত। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর পিতা যে আচরণ করেছেন, মা তার হাজার ভাগের এক ভাগও করেননি। পিতা করেছেন বেত্রাঘাত, মা ফেলছেন চোখের পানি। আমার পিতার কথায় ও শাসনে হিন্দুত্বটাই ছিল আসল, আর মায়ের আচরণে তার সন্তানই ছিল মূখ্য। এ কারণেই আমার আত্মীয়রা যখন আমার পিতাকে বলেছিল কৌশলে কোথাও নিয়ে হত্যা করে ফেলতে। তখন মা গোপনে পত্র পাঠালেন 'আমার কথা ছাড়া এদিকে আসবে না।' আমার পিতার জোর ছিল তার হিন্দুধর্ম রক্ষা, আর আমার মায়ের কামনা ছিল তার পুত্রের প্রাণ রক্ষা।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরও স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের কাছে যাতায়াত করতাম। আব্বা একদিন রাস্তায় দেখেও তো অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। আমি মুসলমান হওয়ায় আমার আব্বা মনে করেছেন–তার জাত গিয়েছে, মান গিয়েছে আর আম্মার আকুতি-বিকুতিতে মনে করতাম তার পুত্র আছে তো সব আছে, পুত্র নাই তো কিছুই নেই।

শেষ দিন মাকে এই অবস্থায় দেখেছি ওয়াগা সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়ার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে অঝোরে কাঁদছেন। আমার পত্র পেয়ে কত দূর হতে অর্জুনকে হাতে ধরে কার টানে কিসের টানে ছুটে এসেছিলেন এই ওয়াগা সীমান্তে?

যেই ছেলের আকর্ষণে মা এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওয়াগা সীমান্তে, সেই ছেলের বিবাহ কিন্তু আত্মীয়-কুটুমকে দাওয়াত দেয়ার জন্য মা নেই। বিবাহের আয়োজন করার জন্য মা নেই। পুত্রবধুকে গ্রহণ করার জন্য মা নেই। মাও নেই, তার কোন ভূমিকাও নেই।

কৃষ্ণলাল গাজী আহমাদ হওয়ার কারণে আজ গাজী আহমাদের বিবাহে তার মা নেই। মা তো বেঁচে আছেন। তবে আরেক দেশে। আনা যাচ্ছে না তাকে। শুনেছি ছেলের বিবাহে মা নাকি বহু পর্ব পালন করেন। কিন্তু আমার পর্ব পালন করার কেউ নেই। বুকের পাঁজড়ে আবদ্ধ বেদনাটা বুকের ভিতরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। পাঁজড়ের দেয়ালে আছড়ে পড়ছে। আমার মা হিন্দু, আমি মুসলমান। এদ্বারা মায়ের সাথে আমি কোন দূরত্ব বোধ করছি না। তাই অন্তরের সমস্ত কামনা দ্বারাই আমি আমার বিবাহে মায়ের উপস্থিতি, মায়ের ভূমিকা প্রত্যাশা করছি।

এত যাতনা-যন্ত্রণা ও কামনা-বাসনার পরও যা সত্য, যা বাস্তাব, তাহলো আমার মা আমার ধারে নেই, কাছে নেই। মায়ের কামনা ও প্রত্যাশা আমার মনকে

স্থির হতে দেয় না। অন্তরে শান্তিও পাচ্ছি না, সান্ত্বনাও পাচ্ছি না। তাই কয়েকদিন থেকে ভাবছি মাকে অন্তত একটি পত্র লিখে দেই। কিন্তু লিখতে বসেও লিখতে পারছি না। কয়েকদিনে মায়ের উদ্দেশ্যে যে পত্রটি লিখা হলো তা এইঃ

প্রিয় মা!

আপনার গাজী আহমাদের তেরই ডিসেম্বর বিবাহ হচ্ছে। আপনি শরীক থাকছেন না? আপনি না থাকলেতো এটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোন আনন্দই হবে না। বিবাহের একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে আনন্দ, কিন্তু আপনার উপস্থিতিহীন আমার বিবাহ তো হবে, আনন্দ হবে না।

মা! বিবাহের কাজে অগ্রসর হয়ে দেখি আমি একা। সাহায্য-সহযোগিতা করার মানুষ তো অনেক। তারপরও মনে হচ্ছে আমি একা। বৈবাহিক কার্যক্রমে যারা অপরিহার্য, তারা আজ কেউ নেই। আমার বিবাহে আপনার ও আমার ভাইদের উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল, কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা দেখছিনা। যারা আমার স্বধর্মী, যারা হিতাকাংক্ষী তারা আমার জন্য কম কিছু করছেন না; বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছু করছেন। কিন্তু তারপরও মা আপনার তৃষ্ণা মিটছে না। আপনার তৃষ্ণা আপনি ছাড়া আমার কাউকে দিয়েই মিটবে না। মা, একাকী হলে চোখ কাঁদে, কিন্তু অন্তর কাঁদে সর্বদা। চোখের কান্না তো উপস্থিত লোকজন দেখে, কিন্তু অন্তরের কান্না কেউ দেখেনা।

মা! ওয়াগা সীমান্তের সাক্ষাতের পর আর আপনার মমতাময়ী মুখখানা দেখিনি। জানি বড় ছেলের জন্য আপনার প্রাণ অশান্ত থাকে, চোখ অশ্রু ফেলে, অন্তর থেকে শীতল নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

আজ আমার বিবাহের কথা শুনলে হয়তো আরো ব্যাকুল হয়ে উঠবেন। মা আপনার তো আরো তিন পুত্র রয়েছে তাদের বিবাহে আপনি আনন্দ-খুশী করতে পারবেন; কিন্তু আমার তো আর কোন মা নেই। আমার মায়ের অভাব পূরণ করবে কে?

আমার এ পত্র কবে পৌঁছে জানি না। তেরই ডিসেম্বরের পূর্বে আপনি এখানে আসতে পারবেন কিনা জানি না। তাছাড়া বর্তামানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-বিধি গ্রহণ করা খুবই দূরূহ। যদি আসতে না পারেন, তাহলে মা আপনার পায়ে চুমু খেয়ে নিবেদন করছি, অন্তত তেরই ডিসেম্বর চোখের পানি ফেলবেন না। আপনার অশ্রু ফোটা আমার অন্তরে বর্শার ন্যায় বিদ্ধ হয়। আপনার অন্তরের দহন আর চোখের পানির কারণেই আজ আমার মন অশান্ত। তাই মা খুশির হাসি দিয়ে দোয়া দিবেন, যেটা ছেলের পাওনা তার মায়ের কাছে।

মা আপনার বড় ছেলে হিসেবে আপনার সেবা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। সে ইচ্ছাও আমার আছে। তবে তা পূরণের তো কোন পথ নেই। এই বেদনা আমার কোন দিনও শেষ হবে না যে, মায়ের কোন সেবা করতে পারিনি। মা ক্ষমা চেয়ে পত্র শেষ করছি। আমার একটি শেষ নিবেদন, পত্রটি আপনার পায়ের উপর রাখবেন। ওটা আপনার পায়ে চুমু খাবে। ভাইদেরকে আমার প্রাণের আদর দিবেন।

আপনার বড় ছেলে
গাজী আহমাদ

প্রতিশ্রুত ও প্রত্যাশিত তেরই ডিসেম্বরে আমার বিবাহ সম্পন্ন হল। আমার বিবাহ হল অথচ আমার মা, ভাই, চাচা, মামা কেউ নেই। আজ আমি তাদের থেকে ছিন্ন। এর একমাত্র কারণ ইসলাম। ইসলামের কারণেই আমি ছিন্ন হয়ে গিয়েছি।

মনকে সান্ত্বনা দিলাম, আসলে তো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষকে পৃথিবীতে ভিন্ন ভাবে একাকিই পাঠানো হয়েছে। আবার যেদিন পৃথিবী হতে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে সেদিনও একাকিই নেয়া হবে। কবরে মানুষ একাকী থাকবে। হাশরের মাঠে আল্লাহর দরবারে একাকী হিসাবের জন্য পেশ হতে হবে।

এ বিষয়ে আক্ষেপ করে আর কি হবে? আল্লাহ আমাকে তার মনোনীত দ্বীন গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

অন্যদিকে আমার যে নূতন জীবন শুরু হলো, যাকে নিয়ে শুরু হলো এ বিষয়েও আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ-ই লাভ করেছি। মানুষ একদিকে হারায় অপরদিকে পায়, আবার একদিকে পায় অপরদিকে হারায়।

শ্বশুর-শাশুড়ী ও তাদের পক্ষের সকল আত্মীয় আমাকে শুধু একজন জামাই হিসাবেই গ্রহণ করেননি এবং একজন নওমুসলিম হিসাবেই গ্রহণ করেননি, বরং একজন নওমুসলিম হিসাবে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমীহ করতে লাগলেন। আমাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম মনে করলেন।

স্ত্রীও সব দিক থেকেই উত্তম মনে হলো। বিশেষতঃ তার পরহেযগারী মন তাকে 'নেক বিবিতে' পরিণত করে দিল। সালাত-সিয়ামের এত পাবন্দ ছিল যে, তাহাজ্জুদ পড়তো প্রতিদিন। আমার সেবা ও সন্তুষ্টি ইবাদত মনে করতো।

দাম্পত্য জীবন শুরু হলো। আল্লাহ অনুগ্রহ করে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৯৫ইং আমাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন। তার নাম রাখা হলো তাহের জামিল। বিবাহের পর হতে নিয়মিত পারিবারিক জীবন শুরু হলো। সাথে সাথে শিক্ষা জীবনের ধারাবাহিকতাও বজায় রাখা হলো।

তাহের জামিল তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ডাক্তারী পড়তে আগ্রহ ব্যক্ত করলো। তাই তাকে লাহোরের এড্ওয়ার্ড মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হলো। এম,বি,বি,এস পাশ করার পর সে সেনা বাহিনীর মেডিক্যাল কোরে ভর্তি হয় এবং বর্তমানে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় চাকুরীরত আছে।

ছেলে তাহের জামিল যদিও সরাসরি মাদ্রাসায় পড়েনি, কিন্তু তার মায়ের তরবিয়তে সে দ্বীনদার হয়েই গড়ে উঠেছে। আল্লাহর রহমতে কখনও সালাত-সিয়াম কাযা করে না। আচার-আচরণও বিনম্র। পরম সৌভাগ্য যে, তাহের জামিল বিভিন্ন সময়ে কয়েকবারই স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জিয়ারত লাভে ধন্য হয়েছে। একবার গভর্ণমেন্ট ইন্টার কলেজের ছাত্ররা তাদের সংগঠনের এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের এক পদস্থ ব্যক্তিকে প্রধান অতিথী হিসাবে দাওয়াত করে আনে। এতে পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব আব্দুস সালাম কুরাইশী-ও আমার উপর অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। অথচ এ দাওয়াতের ব্যাপারে আমাদের কোনই হাত ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারলাম আমার ও

প্রিন্সিপাল সাহেবের বদলীর নির্দেশ জারী হচ্ছে। ঐ সময় আমি একটু পেরেশানীর মধ্যে ছিলাম। আমাদের ছেলে তাহের জামিল ঐ সময়ই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলো। তাহের জামিল ঐ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে বললো ঃ আমি স্বপ্নে দেখি আমি আর আব্বা এক বনে দাঁড়িয়ে আছি। এক ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাতে তরবারী। আমার আন্দাজ হলো লোকটি আব্বার উপর আক্রমণ করবে। আমি বাঁধা দেয়ার জন্য দু'তিন পা এগিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটি তখনও খানিকটা দূরত্বে, আমি পিছন ফিরে আব্বার দিকে তাকালাম। দেখি, আব্বা নেই। নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। আমি হুজুর (সাঃ)-এর সম্মানার্থে একটু পিছনে এলাম। সাথে সাথে মনে ভাবনা এলো–লোকটিতো নবীজীর (সাঃ) উপরও আক্রমণ করতে পারে। যেভাবে সাহাবীগণ নবীজীর (সাঃ) আক্রমণ কারীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন আজ আমিও জীবন বাজী রেখে লোকটিকে প্রতিহত করবো। এরই মধ্যে লোকটি খুব নিকটে চলে এলো। আমি তার মুকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হতে লাগলাম। কিন্তু নবীজী (সাঃ) ইশারা দিয়ে বারণ করলেন। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। লোকটি আরও নিকটে আসতেই তার হাতের তরবারী নীচে পড়ে গেল। সে নবীজীর (সাঃ) নিকট নিবেদন করলো। "আপনি আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। আমি খুবই খুশী হলাম। নবীজী (সাঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তাহের জামিল! এখানে নিকটে কোন মসজিদ আছে? আমি বললাম ঃ জ্বীহা, এখানে একটি পুরাতন মসজিদ আছে। তিনি বললেন ঃ চল, মাগরিবের সময় নিকটবর্তী, আমরা মাগরিবের সালাত আদায় করে নেই।

আমরা মসজিদে গেলাম। নবীজী (সাঃ) ইমাম আর আমরা দু'জন মুক্তাদী। ফরয সালাত শেষ হওয়ার পর সুন্নত আদায় করার সময় আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল।

তাহের জামিল যখন তার স্বপ্ন শুনালো আমর মন তখন খুশীতে পূর্ণ হয়ে গেল। আমি কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবকেও স্বপ্নের কথা বললাম এবং আরো বললাম ঃ আর চিন্তার কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ আমরা নিরাপদ।

তারপর সত্যিই আমাদের বদলীর ব্যাপারে আর কিছু হয়নি। আমাদের মনের ভয় দূর হয়ে গেল। একথা ভাবতে আমার নিজেকে এত সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে যে, আমার ছেলে স্বপ্নে নবীজীর (সাঃ) জিয়ারত লাভ করেছে। "এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।"

এম,বি,বি,এস পাশ করার পর অপরিহার্যভাবে তাহের জামিলকে দু'বছর সেনা বাহিনীতে ডাক্তার হিসাবে কাজ করতে হয়েছে। দু' বছর পর সেনা বাহিনীর পক্ষ হতেই তাকে তিন বছরের জন্য ১৯৮১ সালের শেষ ভাগে সৌদী আরব পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখন সে ঐ পূণ্যভূমিতেই কর্মরত আছে।

প্রিয় তাহের জামিল কিছুদিন পূর্বে সৌদী আরব হতে একটি পত্র পাঠিয়েছে। তাতে সে স্বপ্নে নবীজীকে (সাঃ) দ্বিতীয়বার দেখার এক প্রাণ মুগ্ধকর ঘটনা লিখেছে।

তার স্বপ্নের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

আমি মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওযা শরীফের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বিনয় ও ভক্তি সহকারে দরূদ পড়ছি। হঠাৎ দেখি রওযা শরীফের দরজা আপনা আপনিই খুলে গিয়েছে। আর দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আরো বিনয়াবনত হয়ে হুজরা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে দরূদ পড়তে লাগলাম। একটু পরে দেখলাম, হুজরা শরীফের দরজাও খুলে গেল। আমি হুজরা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করলাম। হুজরা শরীফের অভ্যন্তরে তিনটি কবর রয়েছে। প্রথম কবরটির শিয়রের দিকে লেখা রয়েছে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

আমি কবর শরীফের পায়ের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পরম ভক্তি ও বিগলিত চিত্তে দরূদ শরীফ পড়ে যাচ্ছি। একটু পরে দেখতে লাগলাম কবর শরীফ বিদীর্ণ হয়ে সেখান দিয়ে তাজদারে মদীনা আত্ম প্রকাশ করছেন। নবীজী (সাঃ) আমার উপস্থিতির উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নিবেদন করলাম ইয়া সায়্যিদী! ইয়া রাসূলাল্লাহ। আল্লাহ যেন আমার জীবনের সব গুনাহগুলো ক্ষমা দেন। এই প্রার্থনা নিয়ে আপনার কদম মুবারকে উপস্থিত হয়েছি, আপনি সুপারিশ করে দিন।

দয়ালু নবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবীজীর (সাঃ) পবিত্র মুখে এই কথা শুনে আমার অন্তর বিগলিত হয়ে খুশীতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার সুসংবাদ শুনলাম। জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়ার সুসংবাদ শুনলাম।

নবীজীর (সাঃ) করুণা দেখে সাহস করে নিবেদন করলাম, ইয়া সায়্যিদী। আমি চিকিৎসায় পোষ্ট গ্রাজুয়েশন করতে চাই। আমার সফলতার জন্য আপনার দোয়া চাই। নবীজী (সাঃ) বললেন, খুব মনোযোগ দিয়ে পড় এবং পরিশ্রমী হও। আমি তোমার সফলতার জন্য দোয়া করছি।

এরপরই আমার নিদ্রা ভেঙ্গে যেয়। প্রিয় তাহের তার এই স্বপ্নের কথা লিখে তার প্রতিটি পত্রেই লিখেছে নবীজীর (সাঃ) সুমধুর ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে এক অনুপম মধু ছড়িয়ে দিয়েছে। বারবার ঐ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

এ স্বপ্ন দেখার পর আমি ছুটি নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা গিয়েছিলাম এবং পরম প্রশান্তি লাভ করে কর্মস্থলে ফিরে এসেছি। প্রিয় তাহের জামিল তৃতীয়বারের মত নবীজীকে (সাঃ) স্বপ্নে দেখার কথা আরও একটি পত্র মারফাত অবহিত করেছিল।

'মুনশী ফাযেল' পরীক্ষার পর বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে দুই বছর পর্যন্ত পড়া শোনা করতে পারিনি। কিন্তু পড়ার ইচ্ছা মনে ছিল প্রবল। তাই এফ.এ পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলাম। ১৯৫৪ সালের এফ. এ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে প্রথম বিভাগে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় স্থান অধিকার করলাম।

১৯৫৬ সালে বি. এ পরীক্ষা দিলাম। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর আমার ছিল। বি.এ পরীক্ষার পর একই বছর লাহোরের সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজে বি.এ বি,এড এ ভর্তি হলাম। কলেজের শিক্ষক মন্ডলী সবাই আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। প্রফেসার ফজল আহমাদ সাহেব আমাকে তার ছেলে মনে

করতেন। মাঝে মাঝে হোটেলে আমার কক্ষে চলে আসতেন। প্রয়োজনীয় কিছু সাথে নিয়ে আসতেন। সব বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতেন। মাঝে মধ্যে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যেতেন।

ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন জনাব এম. এ মাখদূমী সাহেব। ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন জনাব হারুন সাহেব। তারাও আমার বিশেষ খোঁজ-খবর রাখতেন। ট্রেনিং প্রার্থী ছাত্ররাও আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন ও সমীহ করতেন।

১৯৫৭ সালে বি. এড সমাপ্ত করলাম। প্রিন্সিপাল সাহেবেরে সাথে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি করতে চাও? আমি বললাম জনাব এম. এ আরবী করার ইচ্ছা।

বললেন ঃ পারবে তো করতে?

আমি বললাম ঃ ইনশাআল্লাহ পারবো এবং আমার আশা ভাল করবো।

তিনি বললেন ঃ রেজাল্ট বেরুবার পর আমাকে অবহিত করো।

১৯৫৮ সালে এম. এ আরবীর পরীক্ষা দিলাম। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলাম। তিনটি স্বর্ণের মেডেল পেলাম। সাথে সাথে এম. ও. এল ডিগ্রিও পেলাম। ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল মাখদূমী সাহেবকে পত্র মারফত আমার রেজাল্ট অবহিত করলাম।

লাহোর ট্রেনিং কলেজে নিয়োগ লাভ

মাখদূমী সাহেবকে আমার এম. এ আরবীর রেজাল্ট জানাবার কিছুদিন পরই আমার নিকট লাহোরের ডি. পি. আই অফিসের পত্র পৌঁছলো। তাতে লিখা আছে, তোমাকে সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজের লেকচারার পদে নিয়োগ দেয়া হল।

মাখদূমী সাহেবের প্রতি মনে অনেক কৃতজ্ঞতা। তিনি আমার উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। প্রস্তুতি নিয়ে আমি বুঝালকালার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে ২২ ইং ডিসেম্বর ১৯৫৮ ইং লাহোর চলে গেলাম এবং সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজে যোগদান করলাম।

পরবর্তী সময়ে আমি কিছু পারিবারিক অনুগ্রহ লাভে ধন্য হলাম। ২৭ জুন ১৯৫৮ ইং আমার প্রথম কন্যা জন্ম লাভ করলো। নাম রাখা হলো জামীলা কুলসুম। ৮ই জানুয়ারী ১৯৬১ ইং ৩য় পুত্র জন্ম গ্রহণ করলো। তার নাম রাখলাম তাহা খলিল। এরপর আরও দু'টি কন্যা সন্তান আমি লাভ করলাম বুশরা কুলসুম ২৩/০২/৬৩ ইং ও রাশেদা কুলসুম ২৮/০১/৬৫ ইং।

আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মা, ভাইসহ সবারই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানে একাকী রয়ে গেলাম। কয়েক বছরে আল্লাহ আমার পরিবারকে আট সদস্যে বিস্তৃত করলেন। তিন জন পুত্র সন্তান, আর তিন জন কন্যা সন্তানে মুখরিত আমার গৃহ।

ট্রেনিং কলেজে আমার কর্মজীবন ঃ

জীবনের এই সমৃদ্ধ কর্মজীবন আমার জন্য যেমন সৌভাগ্যের তেমনি খুশীর ও

প্রশান্তির অনুভূত হল। প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের সাথে খুব ভাল সময়ই কাটতে লাগলো। ইসলামিয়াত ও আরবী সাহিত্য ছিল আমার সাবজেকট। অতিরিক্ত ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেও আমি তাদেরকে আলোকপাত করতাম। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ শেষে নিজ নিজ কর্মস্থান হতে আমার নিকট পত্র লিখত যে, আমরা ইসলামের মৌল বিষয়ে আপনার নিকট হতে অনেক জ্ঞানলাভ করেছি। তখন খুশীতে মন পরিতৃপ্ত হয়ে উঠতো।

১৯৬০ ইংরেজীতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটি ইন্টারভিউ দিলাম। তাতে গুলব্রাগ গভর্মেন্ট ইন্টার কলেজের স্থায়ী পদে নিয়োগ পেলাম।

লাহোর ট্রেনিং সেন্টারে থাকাকালেই আমি এম. এ উলুমে ইসলামিয়া পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলাম। যথা সময়ে উক্ত পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহে পাঞ্জাব বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম স্থান অধিকার করলাম এবং গোল্ড মেডেল পেলাম।

পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রাপ্তি ঃ

উনিশ শ' একষট্টি সালের শেষ ভাগে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উলূমে ইসলামিয়ার একটি ফেকাল্টি খোলা হল। তাতে একজন লেকচারারের পদ সৃষ্টি হল। আমি আমার অফিসের মাধ্যমে আবেদন করলাম। বারজন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অসীম করুণায় নির্বাচনী বোর্ড আমাকে মনোনীত করলো। সে প্রেক্ষিতে ১৫ মার্চ ১৯৬২ ইং আমি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম। উলুমুল কুরআন আর ফিক্‌হে ইসলামী এই দুই বিষয়ে আমার ক্লাশ ছিল। আমি আমার সাধ্যমত পরিশ্রম করে অধ্যাপনা করতে লাগলাম। আল্লামা আলাউদ্দীন এই বিভাগের ডীন ছিলেন।

এই সময় ফিক্‌হে হানাফীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেদায়ার দু'টি পরিচ্ছদ উর্দূতে অনুবাদ করে ফেললাম। উর্দূ ভাষার পরিশুদ্ধতার জন্য আমার এক সহকর্মী প্রফেসার বশির আহমাদ সিদ্দিকীর সহযোগিতা নিলাম। সম্ভবত এটাই দরসে নিজামীর পাঠ্য কিতাব হেদায়া গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ। এ কারণে বাজারে এর চাহিদা সৃষ্টি হলো খুব।

উসূলুশ্ শাশীর অনুবাদ ঃ

এরই মধ্যে উসুল-ই-ফিক্‌হের একটি প্রাথমিক কিতাব উসুলুশ্ শাশীর অনুবাদও করলাম। মুজাহিদে ইসলাম মুসা বিন নাসির এর জীবনী লিখলাম। ইংরেজী ভাষায় SAYINGS OF HOLY PROPHET শীর্ষক একটি হাদীস গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ সহ সংকলন করলাম।

মাওলানা উবায়দুল হক তার প্রকাশনা হতে সবগুলো কিতাবই প্রকাশ করলেন এবং হেদায়া গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ অনুবাদ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।

যারা হেদায়া গ্রন্থ সম্পর্কে জানেন তারা ভাল ভাবেই জানেন, এটা কত দুষ্কর কাজ। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রত্যাশা নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। ক্রমে

ক্রমে কাজ হতে থাকলো। আর খন্ড খন্ড ভাবে মুদ্রিত হয়ে তা প্রকাশিতও হতে থাকলো। আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহে একদিন দেখা গেল ছোট দু'টি পরিচ্ছেদ ব্যতীত বাকী পূর্ণ অংশের অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা শেষ হয়েছে। এব্যপারে মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সহযোগিতা জীবনে ভুলার মত নয়।

এর মধ্যে দেওয়ান-ই হামাসা আরবী সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ করলাম। সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড আমাকে তিন হাজার টাকা পুরষ্কার দিল। আল হামদুলিল্লাহ।

বুঝালকালার স্থানীয় এম.এল. এ জনাব শেঠ আব্বাস খান খুব চেষ্টা করে বুঝালকালায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। গভর্ণমেন্ট ইন্টার কলেজ। পাঞ্জাবের গভর্ণর মালিক আমির মুহাম্মদ খান এই কলেজের মঞ্জুরী দিলেন। শেঠ আব্বাস প্রতি দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেই আমার কাছে আসতেন। আর বুঝালকালার কলেজে চলে আসার জন্য অনুরোধ করতেন। তিনি বলতে লাগলেন নিজের এলাকার খিদমত করা আপনার একান্ত কর্তব্য। শেঠ সাহেবের আন্তরিকতা ও অনুনয় দেখে আমি সম্মতি দিলাম। ১৯৬৩ ইং অক্টোবরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নভেম্বরের ১ লা তারিখ বুঝালকালার গভর্মেন্ট ইন্টার কলেজে যোগদান করলাম। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত অধ্যাপনা করার পর সহকারী প্রফেসর পদে উন্নতি পেলাম। পরে ৭৬ সালে একটি রাজনৈতিক কারণে আমাকে বুঝাল কালার কলেজ হতে চাকওয়াল কলেজে বদলী করা হলো। কিছুই করার ছিল না। চাকওয়াল এসে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সাধ্যমত আমি পালন করে গেলাম। অতঃপর ৭৭ ইং এর জুন মাসে আমাকে আবার বুঝালকালার কলেজে ফিরিয়ে আনা হলো।

আমার বয়স প্রায় বায়ান্ন। আটত্রিশ বছর যাবত পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। এই আটত্রিশ বছর যাবতই ইসলাম ধর্মের মৌলিক ও ব্যবহারিক আদেশ-নিষেধ সাধ্যমত পালন করে যাচ্ছি। আমার ভাল করেই মনে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর কোন দিন সালাত বাদ দেইনি, সিয়াম ভঙ্গ করিনি। প্রাণের আকর্ষণে সালাত আদায় করেছি এবং সিয়াম পালন করেছি। বলতে গেলে এই ইবাদত গুলোই আমার জীবন, জীবনের গ্রন্থী; জীবনের উৎস ও প্রশান্তি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জীবনে বহু কিছু হারিয়েছি, আবার অনেক অনেক কিছু পেয়েছিও। সত্য কথা হলো হারিয়েছি অল্প, পেয়েছি অনেক বেশী। আমার জীবনের বর্তমান বাহ্যিক ও আত্মিক অবস্থা, অবস্থান, উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সবই পবিত্র ইসলাম ধর্মের অবদান।

এতদিনের কর্ম ও সাধনায় আমি আমার শিক্ষা ও পারিবারিক জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছি। যতটুকু অগ্রসর হয়েছি তা শুধুই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে আমার জীবন আজ কোথায় কি অবস্থায় থাকতো তা কল্পনা করতেই আতংকে মন ঘাবড়ে উঠে। বয়স তো আমার ষাটের দশকে। স্বাভাবিক জীবনে এ বয়স কম নয়। ক্লান্তি ও শ্রম জীবনে কম যায়নি। বয়সও পঞ্চাশের উর্ধে। বয়সের ভাড় মাঝে মধ্যেই অনুভব হয়। সালাত ও সিয়াম সাধনার সাথে সাথে আরেকটি আকাংক্ষা মাঝে মধ্যেই মনের মধ্যে জেগে উঠতো! আহ যদি হজ্জটা করতে পারতাম।

ইসলামের কিবলা পবিত্র কাবাগৃহ বাল্যকালে স্বপ্নে দেখেছিলাম। কা'বার

দেয়ালের পাশে সাহাবীদের নিয়ে বসা ছিলেন দ্বীনের নবী, রহমতের ছবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। তিনি আমাকে পরম আদরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ইসলামের কালেমা পাঠ করিয়ে মুসলমান বানিয়েছিলেন। সেই স্বপ্নই ছিল আমার বর্তমান জীবনের মূল উৎস! অন্তরে প্রোথিত হয়েছিল তাওহীদের অমীয় বাণী।

ঐ স্বপ্নের অনুভূতি ও দৃশ্য সর্বদাই যেন আমার মনের চোখে ভাসমান ও দৃশ্যমান ছিল। চক্ষু মুদলে স্বপ্নের রিলটা টেলিভাইজ হতে থাকতো অন্তরের দেয়ালে। আল্লাহর সেই পবিত্র ঘর দেখার ইচ্ছা প্রায়শই মনকে ব্যাকুল করে তুলতো। আয় আল্লাহ! আপনার যে ঘর স্বপ্নে দেখেছিলাম তা যদি একবার বাস্তব চোখে দেখতে পারতাম। হজ্জ করার ইচ্ছা মনে তীব্র হলেও আর্থিক অবস্থা তার অনুকূল ছিল না। কারণ, উপার্জন যা হতো ছেলে-সন্তানদের পড়াশুনার খরচ আর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের পর তেমন কিছু উদ্বৃত্ব থাকতো না। তাই হজ্জের জন্য আবেদন করাও হয়ে উঠতো না। প্রতি বছর হজ্জের মৌসুম এলে এলাকার পরিচিতদের হজ্জের আবেদন করে হজ্জে চলে যেতে দেখলে মনে অস্থিরতার সীমা থাকত না। মন ছটফট করতে থাকতো। কিন্তু কিছু করার সাধ্য ছিল না।

আমার এক বন্ধু পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে চাকুরী করতেন। তার নাম সুবেদার মেহের খান। ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করে করাচীতে বেসরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। সুবেদার সাহেব বাড়ী এসে বললেন, আমিতো এখন করাচীতে থাকি। আপনি বার বার হজ্জের কথা বলেন, দেখি চেষ্টা করে আপনাকে হজ্জে পাঠাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা?

সুবেদার মেহের খান সাহেবের কথা শুনে মনে প্রায় আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আল্লাহর ঘর যিয়ারতের জন্য মন ব্যাকুল হতে লাগলো। হজ্জের মৌসুম যত নিকটে আসতে লাগলো, মনের ব্যাকুলতাও বাড়তে লাগলো। অক্টোবরের শেষ দিকে মেহের খানের পত্র এল। তিনি লিখেছেন এবারের মত আপনার হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা সম্ভবত সম্পন্ন হচ্ছে না। সারা বছরের চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভবনা দেখছি না।

পত্র পাঠে যার পর নাই ব্যথিত হলাম। নিজেকে খুবই হতভাগা মনে হলো। সারা বছর মনে মনে আশা করেছিলাম আল্লাহ হয়তো তাঁর ঘরে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করে দিবেন।মনে মনে এ আকাংক্ষা লালন করছিলাম। কিন্তু মেহের খানের পত্র আসার পর নিরাশায় বিষণ্ন হয়ে পড়লাম।

মনে আবেগের বিভিন্ন আঁকিবুঁকি আর কল্পনা ছুটাছুটি করছিল। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এই একই কল্পনা, একই চিন্তা, একই আবেগ-আকাংক্ষা, কবে আল্লাহর ঘরে হাজিরি দেওয়ার সৌভাগ্য হবে।

কে যেন কানের কুহরে আওয়াজ পৌঁছালো আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। এরপর আমি ভাবতে লাগলাম সত্যিইতো আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হচ্ছি কেন? নবীজী (সাঃ) তো স্বপ্নে বলেছিলেন, আমি তোমার সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি।

আমি আমার বায়ান্ন বছর বয়সে বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছি। জীবনে তো

সংকট-সমস্যার হাজারো তরঙ্গ অতিক্রম করেই এ পর্যন্ত এলাম। কোন সংকটেই তো বিফল হইনি। সমস্যা এসেছে সত্য, কিন্তু আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্যে সফলও হয়েছি। একবার নয়, দু'বার নয় বহুবার। তাই আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মিনতি করতে থাকলাম। তাছাড়া যাব তো আল্লাহর ঘরে। আল্লাহর ঘরে যাওয়ার জন্য তাঁর অনুমতি অপরিহার্য। অন্তর উজাড় করে অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকলাম। আমি আমার মন দোয়াতে যত বিমগ্ন করতে থাকলাম মনের মধ্যে তত প্রশান্তি ও সান্ত্বনা বোধ করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল আমার দোয়া কবুল হয়েছে। আমার হজ্জে যাওয়ার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে।

মনে এ ভাব কেন সৃষ্টি হলো, আমি বলতে পারবো না। কিন্তু বাস্তব হলো, সবাই জানে আমার হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা এখনও হয়নি। আমিও জানি একথা।

অক্টোবরের ত্রিশ তারিখ। মাগরিবের পর খানা খাচ্ছিলাম। পর দিন সকালে ছেলেকে "হাসান আবদাল" ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করতে নিয়ে যাওয়ার কথা। স্ত্রী বার বার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। মনে হয় আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছিল।কিন্তু আমার মুখের বিষণ্নতা দেখে কিছু বলতে চেয়েও বলছিল না। শুধু এতটুকু শুনতে পেলাম "আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়ে যান।" আর কিছু বলতে পারলো না বেচারী। একবার দেখি উড়নার কোণ দিয়ে চোখ মুছছে। স্ত্রীর এ আবেগ দেখে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করলাম। বললাম, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হওয়া কি সম্ভব? দু'জনের মনই তো আবেগ আপ্লুত, তাই আর কোন কথা না বলে আহার শেষ করে উঠে আমি আমার কক্ষে চলে গেলাম।

পর দিন সকালে আমি ছেলেকে নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী হাসান আবদালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। ঐ ক্যাডেট কলেজে আমার বিশেষ কয়েকজন বন্ধুও ছিল। রাত তখন এগারটা। বন্ধুদের সাথে কথা বলছিলাম,এমন সময় দরজায় আওয়াজ দেওয়া হল। দরজা খুলতেই দেখা গেল মালিক মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব। বাড়ী থেকে তাকে পাঠিয়েছে। তার হাতে একটি টেলিগ্রাম। তিনি বললেন, আপনি আসার পর টেলিগ্রাম এসেছে। আপনার হজ্জে যাওয়ার কথা আছে এর মধ্যে। আপনি এখানে বিলম্ব করেন কিনা, তাই আমাকে পাঠিয়েছে টেলিগ্রাম নিয়ে। মুহূর্তের জন্য আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। শুধু আমার ভাষা অচল হয়ে গেল তাই নয়। আমার ধমনীর চলাচল তথা শিরা-উপশিরার স্পন্দনও স্থবির হয়ে গেল। যখন মুখে কথা বেরুল তখন উচ্চারিত হল "আল হামদুলিল্লাহ।"

এ পর্যন্ত আল্লাহর যত অনুগ্রহ ভোগ করে আসছিলাম মনে হল এটা সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ। একমুখে একবার নয়, লক্ষমুখে কোটি বারও যদি আল্লাহর শোকর আদায় করি তবুও শত ভাগের একভাগ শোকরও আদায় হবে না। আল্লাহর এই অনুগ্রহ যে কত প্রত্যক্ষ, কত বাস্তব তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।

রাত্রেই বাড়ী ফিরে আসা অপরিহার্য ছিল। ছেলের ভর্তির ব্যাপারটি বন্ধুদের উপর ন্যস্ত করলাম এবং বিদায় নিয়ে রাত বারটায় কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করলাম।

বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর ছয়টা হয়ে গেল। মালিক ইসহাক সাহেবকে বললাম, আপনি বুঝালকালা গিয়ে একটি ট্যাক্সি নিয়ে আসুন। সারগোদা যাওয়ার

জন্য আমি এর মধ্যে বাড়ীর প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। ছুটির আবেদন করার জন্য আমাকে কলেজেও যেতে হবে।

গৃহে প্রবেশ করে দেখলাম স্ত্রী খুবই প্রসন্ন। সে আগেই আমার প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় সাথে নেয়ার আসবাব একটি সুটকেসে গুছিয়ে রেখেছিল। স্ত্রীও বললো আল হামদুলিল্লাহ্। আমিও বললাম আল হামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ-ই তো আমাদের বলতে হবে। আর কি বলবো আমরা? মনে হচ্ছিল আল্লাহর করুণার সমুদ্রে যেন ভাসছি।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম,তোমার কাছে কত টাকা আছে? বললো পাঁচশত হবে। বললাম, আমাকে দিয়ে দাও। পরশু পর্যন্ত কলেজের বেতন পাওয়া যাবে, তা দিয়ে ইনশাআল্লাহ আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমাদের পারিবারিক খরচ হয়ে যাবে।

ছুটির দরখাস্ত দেওয়ার জন্য কলেজে ছুটলাম। যাওয়ার পথে ইসহাক সাহেবের বাড়ী গেলাম। আশরাফ সাহেব বাড়ী ছিলেন। আশরাফ সাহেবের নিকট সতের শত টাকা ছিল, তা নিয়ে নিলাম।

কলেজের কাজ সেরে বাড়ী আসতেই মালিক ইসহাক সাহেব গাড়ী নিয়ে বাড়ী চলে এলেন। আমি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। অনাড়ম্বর প্রস্তুতি। এলাকার তেমন কেউ জানতেও পারলো না। ছেলে-মেয়েদের আদর করলাম। স্ত্রীর মাথায় হাত বুলালাম। বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

সারগোদা গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। ২রা নভেম্বর দুপুরের দিকে করাচী গিয়ে পৌঁছলাম। মালিক মেহের খানকে আমাদের আগমন সম্পর্কে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। তাই তিনি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মালিক মেহের খান আমাদেরকে মালিক মুহাম্মদ হুসাইন সাহেবের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ৩রা নভেম্বর মালিক মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব আমাদের সফরের সমস্ত কাগজ পত্র প্রস্তুত করে ফেললেন।

৩রা নভেম্বর ৭৭ইং আমাদের রওয়ানা হওয়ার কথা। বিকালেই জাহাজে উঠলাম। জাহাজের নাম ছিল সাফিনাই আরব। সন্ধার পূর্বেই জাহাজ জিদ্দার উদ্দেশ্যে করাচী সমুদ্র বন্দর ত্যাগ করলো।

এই হজ্জের সফরে সূফী জান মুহাম্মদ সাহেব সাথে ছিলেন। জাহাজে উঠার পর জানতে পারলাম বুঝালের আরও দু'তিন জন হজ্জ যাত্রী রয়েছেন। সমুদ্র ভ্রমণ এক নূতন অভিজ্ঞতা, রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কিন্তু হজ্জের সফর, সবাই হজ্জযাত্রী। তাই নামায, কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ শরীফ পাঠের মধ্যে সময় অতিবাহিত হতে লাগলো।

জাহাজ ইয়ালামলামের সন্নিকটে এলে কাপ্তান সে কথা ঘোষণা করে সবাইকে ইহরাম বাঁধতে বললেন। হাজী সাহেবদের মধ্যে ইহরাম বাঁধার ধুমছে-প্রস্তুতি চললো। সাথীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো-তুমি ইহরাম বাঁধছোনা কেন?

বললাম, আমি প্রথমে মদীনা শরীফ যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। তাই আমি মদীনা হতে মক্কা আসার পথে যুল হুলাইফা হতে ইহ্রাম বাঁধবো। আমার মীকাত যুল হুলাইফা। ইয়ালামলাম আমার মীকাত নয়। মদীনা শরীফ আমি প্রথমে কেন যাব সেকথা আমার মনেই রইলো। তা প্রকাশ করার নয়।

বুঝালের সাথীরাও আমার সাথে প্রথমে মদীনা যাওয়ার মনস্থ করলেন। জাহাজ হতে জিদ্দা অবতরনের পর ভ্রমণজনিত কার্যাদি সমাপ্ত করার পর একটি টেক্সি ভাড়া নিয়ে আমরা মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা করলাম। রাস্তায় যোহরের নামায আদায় করলাম। আসরের কাছাকাছি সময়ে আমার মদীনা গিয়ে পৌঁছলাম। মসজিদে নববীর মিনারা সুউচ্চ, তাই শহরের উপকণ্ঠ হতেই ঐ মিনারগুলো ও রওজা শরীফের উপরের সবুজ গম্বুজ দেখা যায়।

মদীনা মুনাওয়ারার যত নিকটবর্তী হচ্ছি, ততই যেন মনের আবেগ ও স্পন্দন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অন্তরে পরম আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। যেন এটাই অন্তর আকর্ষণের কেন্দ্র। মনের সে আকর্ষণ আর অবস্থার কথা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না তাই এ বিষয়ে নীরবই থাকবো। মনের অবস্থার কথা প্রকাশ করতে পারবো না। তবে মদীনা অবস্থানের বাহ্যিক কথাগুলো লিখতে চেষ্টা করবো।

আসরের নামায মসজিদে নববীতে আদায় করলাম। এই মসজিদে এটা আমার প্রথম নামায। হাদীস শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামাযে অন্য মসজিদের তুলনায় পঞ্চাশ হাজারগুণ বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়। তাই নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে হলো যে, আল্লাহ তা'আলা মসজিদে নববীতে নামায আদায় করার সৌভাগ্য আমার মত অধমকে দান করেছেন।

রহমতের নবী (সাঃ) এখানে শুয়ে আছেন। পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত হতে নবীজীর (সাঃ) অনুসারীরা আত্মহারা হয়ে ছুটে আসেন। রওজা মুবারকের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম নিবেদন করেন। দরূদ পাঠ করেন। ওহ! আজ আমারও সে সৌভাগ্য! আমি আজ মদীনায়! নবীজীর (সাঃ) রওজা শরীফের সন্নিকটে! মসজিদে নববীতে! আমি কে ছিলাম, কি ছিলাম?? কোথায় ছিলাম ??? আমি তো ছিলাম কৃষ্ণলাল! ছিলাম মূর্তি পূজক হিন্দু! ছিলাম বৃটিশ ভারতের ঝিলাম জিলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম মিয়ানীতে।

আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহে আজ আমি কৃষ্ণলাল এর পরিবর্তে গাজী আহমাদ, মূর্তি পূজারী হিন্দুর স্থলে তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমান, মিয়ানীর পরিবর্তে মদীনা মুনাওয়ারায়।

মন আমার এমনিতেই আবেগে ভারাক্রান্ত। অতীত জীবন নিয়ে চিন্তা করতে চাইনি। কিন্তু কি করে যেন আমার অজ্ঞাতেই অতীত জীবনের স্পর্শ কাতর অধ্যায়টা অন্তরের পরিসীমায় এসে আমাকে ভাবিয়ে তুলছে! আবেগের চাপ দুর্বহ হয়ে উঠেছে। আমার মতে অন্যদের মদীনা আসা আর আমার মদীনা আসায় কিছুটা তারতম্য রয়েছে। ঐ তারতম্যটুকুর চাপ আমার জন্য অতিরিক্ত ভার বহন সাধ্যাতীত মনে হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলাম–হে আল্লাহ! আমার মনের এই বাড়তি আবেগ দূর করে দিন। নির্মল শ্রদ্ধাভরা মনে আমি নবীজীর (সাঃ) দরবারে গিয়ে সালাত ও সালাম নিবেদন করতে চাই। দরূদ শরীফ পাঠ করতে চাই। ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। নবীজীর (সাঃ) কবর মুবারক বেষ্টন করা পিতলের গালা জালি দ্বারা। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে গিয়ে জালি মুবারকের সাথে মিশে দাঁড়ালাম। অনুচ্চস্বরে সালাত ও সালাম নিবেদন করতে লাগলাম, আস্‌সালাতু

আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আস্‌সালাতু আস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আস্‌সালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ।

জালি মুবারকের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে যাচ্ছি। সালাত পেশ করছি। কিন্তু অন্তরে আবারও অনেক অনেক কথা ভীড় করতে লাগলো। একাধিক বার স্বপ্নে দেখা নবীজীর (সাঃ) পূন্যময়, পবিত্র অবয়ব আমার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। স্বপ্নে শোনা নবীজীর (সাঃ) কথা ও সান্ত্বনা বাণী নূতন করে আমার কানে প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। নবীজীর (সাঃ) কথা ও নির্দেশনা পালন করাতেই তো আমার সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হল। অবারিত ভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে থাকলাম। যার কল্যাণে আজ আমি নবীজীর (সাঃ) রওজা শরীফের পার্শ্বে দাড়ানো,তার জন্য দু'আ করলাম। মনে হচ্ছিল যে, রাহ্‌মাতুললিল আলামীনের অনুগ্রহ আমাকে বেষ্টন করে রেখেছে, তাঁরই রওজার পার্শ্বে আমি দাঁড়ানো। কি বললে, কি করলে তার ঐ সীমাহীন অনুগ্রহের সামান্যতমও কৃতজ্ঞতা আদায় হবে?

যার নির্দেশ গ্রহণ করে আমি কৃষ্ণলাল হতে গাজী আহমাদ হয়েছি, রক্তের সম্পর্ক,দুধের সম্পর্কের সবাইকে হারিয়েছি, আজ তাঁরই পদপাশে এসে দাঁড়িয়েছি। কি বলা প্রয়োজন, কি করা প্রয়োজন, স্থির করতে পারছি না। নবীজীর (সাঃ) রওজা মুবারকের পাশে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত-সালাম নিবেদন করছিলাম স্মরণ নেই। মনে হয় আমি তন্ময় হয়ে অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা নিংড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করছিলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম লোকের ভীড় খুব বেশী। দাড়ানো যাচ্ছে না। লোকদের চাপের কারণে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রায় মাগরিবের সময় হয়ে এল। আযান হলো। মাগরিবের নামায আদায় করলাম। আল্লাহর শোকর মদীনা শরীফ এসে মসজিদে নববীতে হাযির হয়ে দ্বিতীয় কাতারে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলাম। মদীনা মুনাওয়ারার সব কিছুতে যেন রহমতের আমেজ মিশে আছে। প্রিয় নবীর (সাঃ) শহরের সব কিছুই প্রিয় লাগে। যেদিকেই তাকাই চোখ শীতল হয়। আমার সৌভাগ্য আমায় প্রশান্তি দিচ্ছে। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমাকে যে ধরনের কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, বিশেষ করে কাশ্মীরে আপন পিতা যে মারধোর ও নির্যাতন করেছেন, সেসব কষ্টের কথা তো মাঝে মধ্যে স্মরণ হতো, কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর ঐ কষ্টের ব্যথা নূতন করে যেন প্রশান্তি হলো। ঐ কষ্ট আজ খুবই সামান্য মনে হতে লাগলো। কারণ, এত বেশী প্রশান্তির জন্য ঐ কষ্ট আর তেমন কি?

মদীনায় থাকাকালীন মনে হয়েছে আমি নবীজীর (সাঃ) সান্নিধ্যে আছি। তাই সর্বদা ঐ অনুভূতি আমার মনকে প্রশান্তিমুখর করে রেখেছে। মদীনায় প্রতি রাত্রে শেষ প্রহরের পূর্বেই নিদ্রা ভেঙ্গে যেত। প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম সেরে রাত্রের এক প্রহর বাকী থাকতেই মসজিদে চলে যেতাম এবং প্রথমেই রওজা শরীফে হাজির হয়ে সালাত ও সালাম নিবেদন করে নামাযে দাঁড়াতাম।

এই সময়টা ছিল হজ্জের সাপ্তাহ দশ দিন পূর্বের। তাই এ সময় মদীনাতে আশেকে রাসূলদের ভীড় সবচেয়ে বেশী ছিল। লক্ষ লক্ষ আত্মহারা নবী প্রেমিকদের ভীড়ে মিশে গিয়ে মসজিদে যেতে, রওজা শরীফ জিয়ারত করতে খুবই ভাল লাগতো।

এর মধ্যে সাথীদের নিয়ে একদিন অহুদ প্রান্তরে গিয়ে শোহাদায়ে অহুদের জিয়ারত করলাম। মসজিদে কুবা, মসজিদে কিব্‌লাতাইন, খন্দক সহ আরো অন্যান্য বরকতের স্থানগুলো জিয়ারত করলাম। যে স্থানেই গেলাম ঐ স্থানের ঘটনা ও তাৎপর্য জানার পর ইসলাম ধর্মের প্রতি আমার মনের আস্থা ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল।

হজ্জের দিনগুলো খুবই নিকটে চলে এল। মদীনায় থেকে এখনও তৃষ্ণা মিটেনি। তা সত্ত্বেও মক্কা মুকাররমা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হল।

বিদায়ের দিন আসরের নামায রিয়াজুল জান্নাতে আদায় করে নবীজীর (সাঃ) রওজা শরীফে গেলাম। এবারের মত এটা হয়ত শেষ জিয়ারত। সালাত ও সালাম পেশ করার পর একটু অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করলাম! হে আল্লাহ! আমার এ ফিরে যাওয়া যেন মদীনার শেষ ফিরে যাওয়া না হয়। মদীনার এই হাজিরী আপনি কবুল করে নিন। মদীনায় থাকাকালে কোন ভুল ভ্রান্তি ও বেয়াদবী হয়ে থাকলে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! বার বার আপনার নবীর (সাঃ) শহরে তাঁর মসজিদে, তাঁর রওজা শরীফে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দিন। হে আল্লাহ! যেখানেই থাকি আপনার নবীর (সাঃ) সুন্নতের উপর আমল করার তৌফিক দিন।

সাথীদের সাথে পরামর্শ হয়েছিল, আসর নামায পড়ে মদীনা থেকে রওয়ানা করে অগ্রসর হয়ে মাগরিব আদায় করবো। সেভাবেই টেক্সি ভাড়া করা ছিল, প্রস্তুতিও ছিল এবং সে অনুসারে আমরা রওয়ানাও হয়ে গেলাম। আমি সম্মুখের ছিটে ড্রাইভারের সাথে ইচ্ছা করেই বসলাম, যাতে তার সাথে আরবী কথা বলতে পারি। আরবী আমারও জানা ছিল। কিন্তু আমাদের আরবী ছিল পুস্তকের আরবী, আর তারা বলেন আঞ্চলিক আরবী, যা শুনতে ভাল লাগে।

গাড়ী চলছিল। হঠাৎ এক সময় ড্রাইভার মোড় দিয়ে গাড়ী থামিয়ে দিল। দু'একটি গাড়ী আগেই সেখানে থামানো ছিল। ড্রাইভার বললো সূর্য ডুবেছে মাগরিবের নামায পড়ুন। এরপর আবার চলবো। কেন যেন উপস্থিত সবাই আমাকে মাগরিবের নামাযের ইমামতি করতে বললো। তিন রাকাত ফরয আদায়ের পর দেখলাম, অনেকগুলো গাড়ী পার্কিং করা। নামাযীদের সংখ্যাও অনেক। বিভিন্ন দেশের লোকই রয়েছে তার মধ্যে! মন আবেগে ভরে উঠলো। আল্লাহ তা'আলা হজ্জের সফরে পবিত্র মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আমার মত হীনকে আজ নামাযের ইমামতি করার তৌফিক দান করলেন। এই সৌভাগ্য বহন করার সামর্থ আমার কোথায়? এসবই যে ঈমান ও ইসলামের কল্যাণেই লাভ করছি তা নিশ্চিত।

ড্রাইভার গাড়ীতে হর্ণ বাজাতে শুরু করলো। আমরা আমাদের টেক্সিতে গিয়ে বসলাম। অন্য লোকেরাও যার যার গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। একে একে সব গাড়ী ইহরাম পড়া আল্লাহর মেহমানদেরকে নিয়ে রওয়ানা করলো। ইশার নামাযও রাস্তায় একস্থানে আদায় করলাম। ওখানেও আমাকে ইমামতি করতে হলো। পূর্ণ রাত রাস্তায়ই অতিবাহিত হলো। ফজরের আযানের পূর্বক্ষণে আমাদের গাড়ী পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলো। দেহে ক্লান্তি ছিল, তবে চোখে নিদ্রা ছিল না। আর মনটা বর্ণনাতীত প্রভাবান্বিত ছিল। 'পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম আল্লাহর ঘরের শহরে

আসছি'- এ উপলব্ধি আমাকে প্রায় বিলীন করে দিল। মদীনায় থাকাকালীন যেন সব কিছুতেই ছিল রহমত আর করুণার আমেজ, আর মক্কায় এসে অনুভব হচ্ছে আল্লাহর মহিমা ও বড়ত্বের মহা আড়ম্বর, যা চোখে দেখা যায় না, মনে অনুভব হয়। আল্লাহ মহান, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, তাই মন ভীত ও বিনীত। মনের স্পন্দন বেড়ে গেল।

গাড়ী এসে থামলো কা'বা শরীফের কাছাকাছি। আমরা সবাই নামলাম। ড্রাইভারের ভাড়া পরিশোধ করলাম। আসবাবপত্র এক জায়গায় রেখে সাফা-মারওয়ার মাঝামাঝি দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম। মনটা খুবই দুরুদুরু করছিল। বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মনে হলো, চোখ দু'টি যেন স্থির হয়ে গিয়েছে। দৃষ্টি ধন্য হলো আল্লাহর ঘরের দিকে তাকিয়ে। শুনেছি আল্লাহর ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে যে দোয়া করা হয়, আল্লাহ সে দোয়াই কবুল করেন। আগে থেকেই এ কথা স্মরণে ছিল। তাই বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দোয়া করলাম "হে আল্লাহ! দয়া করে আমাকে মুসতাজাবুদ্ দাওয়াত করুন। অর্থাৎ আমাকে ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের দোয়া আপনি সদা কবুল করে থাকেন।

আল্লাহর ঘরের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম। বায়তুল্লাহর অঙ্গন-প্রাঙ্গণে যেন আল্লাহর দয়া আর অনুগ্রহের সমুদ্রে আমি একটি খড়ের মত ভাসছি। পার্থিব জীবনে-আমার এ জীবনের উর্ধ্ব সীমা আর কত উচ্চে যেতে পারে? এতদিন যে কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি, আজ সুযোগ এসেছে ঐ কা'বা গৃহের দেয়ালের প্রান্তে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করার। সত্যিই ইসলামের কল্যাণের কোন পরিসীমা নেই। ইসলামের পথ অনুস্মরণ করে এগুতে থাকলে আল্লাহ এভাবেই মানুষকে মর্যাদায় অগ্রসর করতে থাকেন। কা'বা ঘরে প্রবেশ করে ফজরের নামায আদায় করলাম। এটা আমার প্রথম নামায, যা বায়তুল্লাহ শরীফে আদায় করলাম।

ওমরার ইহরাম বেঁধে এসেছি, তাই এখন উমরা করতে হবে। ফজরের নামায আদায় করার পর উমরা করতে শুরু করলাম। হজ্জের মৌসুম, তাওয়াফে প্রচন্ড ভীড়। তবু যতটুকু সম্ভব কা'বা গৃহের নিকট দিয়ে তাওয়াফ করলাম। কা'বা গৃহের একটি স্থান আমার মনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। সবচেয়ে স্মরণযোগ্য ছিল। হাতীম আর রোকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানটি এবং তার পাশের দেয়ালটি। এই দেয়াল ঘেষে এই স্থানটিতে আমি সর্বপ্রথম নবীজীকে (সাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলাম। নবীজী (সাঃ) এ স্থানেই আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাঁর হাতে হাত দিয়ে স্বপ্ন যোগে কালিমা তায়্যিবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পাঠ করিয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়েছিলেন। এ স্বপ্নই আমার জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। মুর্তি পূজা আর কুফরীর অন্ধকার হতে ঈমানের আলোর দিকে এসেছিলাম। কাজেই কা'বা গৃহের এই দেয়াল, এই স্থান আমার অন্তরে ছিল চির অম্লান, সদা স্মরণীয়। পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে স্বপ্নে দেখা এই স্থান, এই দেয়াল আর আজ চোখে দেখা বাস্তব স্থান ও দেয়াল হুবহু এক। কোন ব্যতিক্রম নেই। স্বপ্নে দেখা দৃশ্য অন্তরের চোখে যেমন ভাসমান, চোখের দেখা দৃশ্যও তদ্রুপ। দুই দেখার

মধ্যে কোন তফাত নেই। তাই বার বার তাকিয়ে তৃষ্ণা মিটছে না। আরো তাকাতে মন চায়, বরং তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছা হয়। ইসলাম ধর্ম কত সত্য-সঠিক কত বাস্তব। স্বপ্নে যা দেখলাম, বাস্তবে তার কোন ব্যতিক্রম নেই। আল্লাহর কুদরত ও মহিমা অসীম। তিনি সবই করতে পারেন। সুবহানাল্লাহ্!

বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত, তাওয়াফ ওসাফা মারওয়ার সাঈ শেষ করার পর জিয়াদ মহল্লায় মুহাম্মদ আমীন সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। আমীন সাহেব আমার স্ত্রীর তৃতীয় ভাই। আমাকে তিনি অকৃত্রিম আদর করতেন ও ভালবাসতেন। ছয় মাস যাবত তিনি এখানে রয়েছেন। দেশ থেকে আসার সময় তার ঠিকানা নিয়ে এসেছিলাম। সেই ঠিকানা মত গিয়ে তাকে পেলাম। আমীন ভাই আমাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন। আমার নিকট খুব ভাল লাগলো। আমার জন্য তার অন্তর যেমন প্রসারিত ছিল, হাতও ছিল তেমনি অবারিত। রাত্রের খাবার তার সাথেই খেলাম। আমীন ভাই পর দিন মক্কা মুকাররমার দর্শনীয় স্থানগুলো আমাদেরকে দেখালেন।

মক্কা পৌছার তৃতীয় দিন ছিল আরাফাহ্ যাওয়ার দিন। সে অনুসারে দ্বিতীয় দিন মিনা যেতে হবে। সাথীরা পায়ে হেটেই মিনা যাওয়ার পরামর্শ করলেন। আমারও তাতে সম্মতি ছিল।

যোহরের নামায মিনায় গিয়ে আদায় করতে হবে। ততটুকু অবকাশ নিয়েই আমরা পায়ে হেটে মিনা রওয়ানা হলাম। পবিত্র মক্কা নগরী। পাহাড় আর পাহাড়। তালবিয়া পাঠ করতে করতে দুপুরের পূর্বেই আমরা মিনায় নিজেদের তাঁবুতে পৌছলাম। মিনায় অবস্থান হতেই হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। সে অনুসারে আমাদের হজ্জের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। মিনাতে দিনের অবশিষ্ট অংশ ও পূর্ণ রাত অবস্থান করে যোহর হতে ফযর পর্যন্ত পাঁচ বেলা নামায আদায় করতে হয়। নবীজী (সাঃ) এরূপ করেছেন এবং করতে বলেছেন। হজ্জের কার্যক্রমে এটা সুন্নত বলে বিবেচিত। তাই আমরাও মিনায় পৌছে সেদিন যোহর হতে পর দিন ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলাম।

পরদিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ। হজ্জের মূখ্য ও প্রত্যাশিত দিন। আজ আরাফাতে অবস্থানের দিন। এটাই হজ্জে সবচেয়ে বড় ফরয-রোকন। নবীজী (সাঃ) সূর্য উদয়ের পর এবং সূর্যের আলো কিছুটা ছড়িয়ে পড়ার পর মিনা হতে দূরের পথে আরাফাতে গমন করেছেন। আমরা মিনা হতে পায়ে হেটে আরাফাহ্ ময়দানে যাওয়ার মনস্থ করলাম। সে অনুসারে সবাই হাটতে শুরু করলো। মিনা হতে আরাফাত নয় কিঃ মিঃ পথ। হাটলে কতক্ষণ? আল্লাহর ইচ্ছায় মুযদালিফা হয়ে আরাফাতে পৌছলাম। দুপুরের বেশ পূর্বেই পৌছে গেলাম। দ্বিপ্রহর থেকে আরাফাতে অবস্থানের সময়। হজ্জ পালন কারীদের সবাইকে এক সময়ে এই আরাফাতে অবস্থান করতে হয়। আমরা এক জায়গায় বসার স্থান করে নিলাম। সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করতে হয়। সুর্যাস্তের পূর্বে কেউ আরাফাহ্ ময়দান ত্যাগ করতে পারেন না। কেউ তা করলে তাকে আবার আরাফাতে ফিরে যেতে হবে। অন্যথায় দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে

রওয়ানা করতে হয়। হাজীগণ মাগরিবের নামায সূর্য ডুবে যাওয়া সত্ত্বেও আরাফাতে আদায় করবেন না, মুযদালিফার পথেও না; বরং মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব আর ইশার নামায একসাথে আদায় করবেন। এক আযান দুই ইকামতে প্রথমে মাগরিব তারপর ইশা আদায় করবেন। দুই নামাযের মধ্যখানে কোন সুন্নতও আদায় করবেন না। সুন্নত আদায় করতে চাইলে ইশার ফরযের পর প্রথমে মাগরিবের সুন্নত তারপর ইশার সুন্নত, পরে বিতর আদায় করবেন। ইশার নামায এখানে সকল হাজীদেরকেই কসর আদায় করতে হয়।

সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আমরাও যথা নিয়মে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করলাম। এবারও আমরা পায়ে হেঁটেই রওয়ানা করলাম। ধীরে ধীরে তালবিয়া পড়তে পড়তে আমরা মুযদালিফায় পৌঁছলাম। সাথীদের একজন আযান দিলেন। আমরা প্রথমে মাগরিবের ফরয, তার পর ইশার ফরয, তারপর সুন্নত ও বিতর ইত্যাদি নামায আদায় করলাম। মুযদালিফায় রাত্র অবস্থান করলাম। হাজীদের এই রাত্র অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের দশম রাত্র মুযদালিফায় অবস্থান করতে হয়। সারা রাত অবস্থান করা সুন্নত, তবে সুবহে সাদিকের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করা ওয়াজিব।

মুযদালিফায় পৌঁছে নামায আদায় করে আমরা এক জায়গায় চাদর বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করলাম। কিছু হালকা আহার করে শুয়ে পড়লাম। মুযদালিফায় কোন তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয় না। খোলা আকাশের নীচেই ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সবাইকে শুয়ে বসে থাকতে হয়। ফজরের নামাযের পর আমরা হাঁটতে হাঁটতে মিনায় আমাদের তাঁবুতে চলে এলাম।

মিনা পৌঁছার পর প্রথমে জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করলাম, তারপর কুরবানী করলাম, মাথা মুন্ডন করে ইহ্‌রাম ত্যাগ করলাম। হাজীদেরকে এভাবেই হজ্জের কার্যাদি আদায় করতে হয়।

হজ্জের শেষ ফরয হলো বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা। আমরা দশ তারিখেই মক্কা এসে তাওয়াফ-ই যিয়ারত সম্পন্ন করলাম। পরবর্তী দু'টি রাত্র মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। তাই হাজী সাহেবগণ পরের দুই রাত মিনাতে অবস্থান করেন। আমরাও তাওয়াফ করে মক্কায় বিলম্ব না করে মিনায় ফিরে গেলাম। এগার ও বার, অন্তত দুই দিন দ্বিপ্রহরের পর তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। দ্বিপ্রহরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নত। তবে ওজর বশতঃ পরবর্তী রাতের শেষ ভাগ সুবহে সাদিক পর্যন্ত তা নিক্ষেপ করার সুযোগ রয়েছে। এসব কাজ যথাসময়ে ও যথা নিয়মে আদায় করে আমরা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ হজ্জের সমস্ত কাজ সমাধা করলাম। আল-হামদুল্লিাহ।

আমাদের ফিরতি জাহাজ ছিল হজ্জের পর পরই। তাই হজ্জের পর বেশী দিন মক্কা মুকাররমায় থাকার সুযোগ হলো না। তাড়াহুড়া করেই দেশে ফিরতে হল।

মিকাতের বাহিরের হাজীদের দেশে ফিরার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হয়, এটা ওয়াজিব। আমাদের যেদিন মক্কা থেকে জিদ্দা আসার কথা, সেদিন আসরের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করতে গেলাম। বিদায়ী তাওয়াফ করার সময় খুবই খারাপ লাগতে লাগলো। আরও থাকতে ইচ্ছা হল, কিন্তু তার তো অবকাশ ছিল না। নির্দিষ্ট

দিনে চলে আসতেই হবে। বিদায়ী তাওয়াফ করার পর আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম–হে আল্লাহ! এটা যেন আমার শেষ যাওয়া না হয়, বরং বার বার আপনার ঘরে আসার তৌফিক দান করুন। একটি অব্যক্ত বেদনা আমার মনকে দগ্ধ করতে লাগলো। হাজী সাহেবরা হজ্জ পালন শেষে বা হজ্জের পূর্বে তাদের পিতা মাতার জন্য উমরা করে থাকেন। আমার সাথীরাও তা করলেন; কিন্তু আমার সে সৌভাগ্য নেই। এদিক দিয়ে আমি বরং নেহায়েতই দুর্ভাগা। কারণ, আমার মাতা-পিতা তো অমুসলিম। অমুসলিমদের পরকালীন নাজাত ও সফলতার জন্য দোয়া করা নিষেধ। অমুসিলম জীবিত থাকা পর্যন্ত তার ঈমান আনার ব্যাপারে দোয়া করা যায়। কিন্তু তারা মারা গেলে তাদের জন্য কোনপ্রকার দোয়া করা যায় না বা তাদের পরকালীন কল্যাণ কামনায় কোন নেক আমলও করা যায় না। আমার মাতা-পিতা অমুসলিম হওয়ার কারণে আমি তা পারলাম না। সারা হজ্জের সফরে হজ্জ পালন কালে, মক্কা ও মদীনায় অবস্থান কালে কতবার কত বিষয়ে দোয়া করেছি, কত পরিচিত জনের জন্য তাদের মাতা-পিতার জন্য দোয়া করেছি, কিন্তু পারিনি আপন পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে! একটি বারও বলতে পারিনি "হে আল্লাহ! আমার মাতা-পিতা ও ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিন। এ ব্যথার কথা কারও কাছে ব্যক্তও করতে পারিনি।

মক্কা মুকাররমায় আল্লাহর ঘরে আরও থাকবার, আরও উমরা করার প্রবল ইচ্ছা ও আকাংক্ষা থাকা সত্ত্বেও দেশে ফিরার নির্দিষ্ট দিনে মক্কা ছেড়ে জিদ্দা চলে আসতে হল। ফলে জিদ্দা পোর্টে ফিরতি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে জাহাজে উঠলাম। জাহাজ করাচী পৌঁছার পর করাচী শহরে মুহাম্মদ হুসাইন সাহেবের গৃহে তিন দিন অবস্থান করে চতুর্থ দিন বাড়ী রওয়ানা করলাম। আমার এই হজ্জ করার পিছনে জনাব মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব ও জনাব মালিক মেহের খান সাহেবের অপরিসীম চেষ্টা ও অনুগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে এর উত্তম সুফল দান করুন। সারগোদা রেল স্টেশনে এসে দেখি অনেক আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা করছে। ইসহাক সাহেব ও ফিরোজ খান সাহেব গাড়ী নিয়ে এসেছেন। আমার এক ভায়রা ভাই কাজী ইকবাল সাহেব (সারগোদা তার বাসা) আমাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি খুবই জাক জমক পূর্ণ মেহমানদারী করলেন।

আহারের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে মিয়ানী রওয়ানা করলাম। আমি চাচ্ছিলাম একটু রাত হয়ে যাক, যাতে ঘরে ফিরার পথে তেমন কারো সাথে দেখা না হয়। ইশার সময় মিয়ানী পৌঁছলাম। ঘরে না গিয়ে আগে মসজিদে গেলাম। নামায আদায় করলাম। তারপর ঘরে গিয়ে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে দেখা করলাম।

সফর থেকে ফিরার পর নবীজী (সাঃ) প্রথমেই ঘরে প্রবেশ না করে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন, তারপর ঘরে যেতেন। এটা সুন্নত।

হজ্জ থেকে ফিরার পর কয়েক দিন পর্যন্ত আত্মীয় আর বন্ধু জনেরা সাক্ষাত করতে এলেন। সাথী-বন্ধুদের অনবরত সাক্ষাত দানে কয়েকদিন ব্যস্তই কাটলো। তাছাড়া সফরের ক্লান্তিও ছিল। তাই কয়েকদিন বাড়ীতে রইলাম। তারপর কলেজে গিয়ে নিজ দায়িত্বে যোগদান করলাম। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ সাহেব নয় মাসের ছুটি নিয়ে তাবলীগ জামাতের সাথে চলে গেলেন। এই জামাত তাবলীগ

করতে করতে পায়ে হেটে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত যাবেন এবং হজ্জ পালন করবেন। আমাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের দায়িত্ব পালন করতে বলা হলো। এটা ছিল ১৯৭৮ ইং মার্চ মাস। কিন্তু একই বছরের ডিসেম্বর মাসে আমাদের অধ্যক্ষ সাহেবকে জড়ানওয়ালা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ পদে বদলী করে আমাকে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হলো। এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ।

১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত বুঝালকালার ইন্টার কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করলাম। স্কুলের রেকর্ড অনুসারে ১৯৮২ সালের মে মাসে আমার বয়স ষাট বছর পূর্ণ হবে। তাই সরকারী চাকুরী বিধি মুতাবেক চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করতে হবে। সে অনুসারে ৩১ শে মে অবসর গ্রহণ করলাম।

আমার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা দেয়া হলো। কলেজের শিক্ষক মন্ডলী ও পরিচালনা কমিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালনা কমিটির প্রধান তার ভাষণে একটি খুবই সুক্ষ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। চাকুরী শেষ হওয়ার পর পেনশন পাওয়ার জন্য কয়েকটি সার্টিফিকেট দেওয়া অপরিহার্য। যেমনঃ নিজের কলেজ ডিপার্টমেন্ট, কর বিভাগ ও পি.ডব্লিউ.ডি ইত্যাদি সংস্থা ও কতৃপক্ষের N.o.C গ্রহণ করে তা জমা দিতে হয়। যাতে লিখা থাকে উল্লেখিত সংস্থা, বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর কোন দাবী দাওয়া বা অভিযোগ অথবা আপত্তি নেই। যথাযথ কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর চাকুরে ব্যক্তিকে পেনশন দিয়ে থাকেন বা তাকে কেবল তখনই পেনশন লাভের যোগ্য বিবেচনা করা হয়।

এই বক্তব্য শোনার পর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আমার জন্য আর আনন্দের রইল না। একটি অজানা শংকা মনকে আচ্ছন্ন করে নিল। পার্থিব জীবনে কর্মকাল শেষ হওয়ার পর পেনশন লাভেল জন্য যেমন বিভিন্ন রকমের সার্টিফিকেট, প্রশংসা পত্র, অনাপত্তি পত্র অপরিহার্য হয় তদ্রূপ আমরা আমাদের পার্থিব জীবনের বৃহত্তম কর্মকাল শেষ করার পর মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা যখন আল্লাহর নিকট ফিরে যাব, তখন পরকালে পেনশন জীবন লাভের জন্য আমাদেরকে কতিপয় বিষয়ে সার্টিফিকেট ও সনদপত্র অবশ্যই দেখাতে হবে।

তাওহীদের পরিচয় পত্র অর্থাৎ আল্লাহর উপর সঠিক ঈমান নিয়ে যেতে হবে। ঈমানী জীবনের সকল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। কোন ফরয-ওয়াজিব পালন বাকী নেই, কোন হারাম কাজের দায়িত্ব নেই' এরূপ সনদপত্র থাকতে হবে। সর্বোপরি হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ মানুষের কোন হক বা অধিকার আত্মসাৎ করা হয়নি, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের দায় দেনা নেই এরূপ N.o.C দেখাতে হবে। তবেই পরকালীন পেনশন জীবন লাভ করা যাবে। ঐ পেনশন জীবন ভোগ করার ব্যবস্থা করা হবে 'শান্তি নিকেতন' জান্নাতের মধ্যে। জানিনা মহান আল্লাহর দরবারে এসব পেশ করার সৌভাগ্য হবে কিনা? পেনশন জীবন পাওয়া না গেলে বিপরীত অবস্থান শাস্তির জাহান্নামই অবধারিত।

হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে পার্থিব জীবনে সফলতা দিচ্ছেন, অনুরূপভাবে

পরকালীন জীবনেও দয়া করে সফলতা দান করুন।

কলেজ হতে অবসর গ্রহণের কিছু দিনের মধ্যেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সম্মান জনক পদের চাকুরীর প্রস্তাব আসতে লাগলো। আমিও এর মধ্যে কোন একটায় যোগদান করার বিবেচেনা করছিলাম। এর মধ্যেই আমাদের বড় ছেলে তাহের জামিল আমার ও তার মায়ের দু'জনের জন্যই সৌদী আরব যাওয়ার Visit visa পাঠিয়ে দিল। আমাদের বড় ছেলে ডাক্তার। সে সৌদী আরবে চাকুরী করতো। আমার অবসর গ্রহণের কথা শুনে পত্র লিখলো আপনারা দু'জনে আমার এখানে এসে কিছু দিন থেকে যান এবং হজ্জ উমরা ও মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারত করে যান। সে উপলক্ষেই এই Visit visa।

প্রথম বার হজ্জে গিয়ে অত্যন্ত অতৃপ্তি সহকারেই দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল, তাহের জামিলের ভিজিট ভিসা পাঠাবার কারণে দ্বিতীয়বারের মত আল্লাহর ঘরে হাজিরী দেওয়ার, নবীজীর (সাঃ) রওজা শরীফে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় মন সৌভাগ্যের খুশীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে হজ্জ পালন শেষে দেশে আসার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফের পর দোয়া করে এসেছিলাম, হে আল্লাহ! আপনার ঘর থেকে আমার এ যাওয়া যেন শেষ যাওয়া না হয়। আবার আসার তৌফিক দান করুন। মনে হয় আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেছেন।

নূতন কোন চাকুরীতে যোগদানের বিষয় স্থগিত করে ভিসা ও টিকেট সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আমাদের এবারের সফর সমুদ্র পথে হবে না, বরং আকাশ পথে হবে। আগের বার গিয়েছি করাচী হতে, এবার যাব ইসলামাবাদ হতে। এবার একটি অতিরিক্ত আনন্দের বিষয় ছিল যে, স্ত্রী যাচ্ছে আমার সাথে। হজ্জ ও উমরা করার ন্যায় এমন একটি দ্বীনী ও পবিত্র দীর্ঘ সফরে জীবন সঙ্গীনী হবেন সফর সঙ্গীনী, এটা খুবই খুশির কথা।

সৌদী দূতাবাস হতে ভিসা গ্রহণ করলাম। এয়ার লাইন্স হতে টিকেট ক্রয় করলাম। ২১শে আগষ্ট সন্ধার সময় ইসলামাবাদ থেকে জিদ্দা যাওয়ার কথা। জাহাজ ইসলামাবাদ হতে সরাসরি জিদ্দা যাবে করাচী হয়ে যাবে। ইসলামাবাদ হতে করাচী এসে আমরা হোটেল মেহরানে রাত যাপন করলাম। ২২শে আগষ্ট সকালের দিকে করাচী হতে রওয়ানা হয়ে দুপুরের দিকে আমরা জিদ্দা বিমান বন্দরে এসে অবতরণ করলাম। জিদ্দা বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বাইরে এসে দেখি আমাদের পুত্র ও পুত্রবধু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা পুত্র ও পুত্র বধুকে দেখে খুবই খুশি হলাম এবং তারাও আমাদেরকে দেখে যারপর নাই খুশি হলো। ছেলের জন্য অন্তর থেকে দোয়া এলো যে, আমাদেরকে আল্লাহর ঘরে হাজিরা দেয়ার ব্যবস্থা করলো।

আসবাব পত্র সহ এয়ারপোর্ট হতে বেরিয়ে আমরা প্রথমে জিদ্দার একটি হোটেলে এলাম। তাহের এই হোটেলে একটি কক্ষ ভাড়া করে রেখেছিল।

হোটেলে উঠে আমরা গোসল করলাম, আহার করলাম, তারপর ইহরাম বাঁধলাম। এরপর মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। জিদ্দা হতে মক্কা তেমন দূরে নয়, আসতেও তেমন সময় লাগে না। মক্কার হারাম এলাকায় পৌছার সাথে সাথে

মনটা আবেগ প্রবণ হয়ে উঠলো।

হোটেল শুব্‌রায় কক্ষ রাখা ছিল। তাই উক্ত হোটেলে গিয়ে উঠলাম। আসবাব পত্র রেখে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে চলে গেলাম। আমার স্ত্রীর যেহেতু এটা প্রথম সফর ছিল, তাই তার জানার বিষয় ছিল অনেক। তাকে বিভিন্ন বিষয় অবহিত করতে হচ্ছিল।

আবদুল আজীজ গেইট দিয়ে আমরা হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম। বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়তেই দোয়া করলাম, "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মুসতাজাবুদ দা'ওয়াত করুন।"

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বিলম্ব না করে উমরার তাওয়াফ শুরু করে দিলাম। তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর মাকামে ইবরাহীমে তাওয়াফের নামায আদায় করলাম। তাহের জামিল ও তার স্ত্রীও আমাদের সাথে ছিল। আমি তাদের সবাইকে হাতীমের পাশ দিয়ে হাতীম আর রোকনে ইয়ামানীর মধ্য খানের কাবা গৃহের সেই দেয়ালের পার্শ্বে নিয়ে এলাম যেখানে চুয়াল্লিশ বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দেখে তাঁর পবিত্র হাত ধরে কালেমা তায়্যিবা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম। আমি, আমার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু সবাইকে উক্ত স্থানটি দেখালাম। এটা আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের স্মৃতি বিজড়িত স্থান। মনের আবেগ আর মনের মধ্যে আটকে রাখতে পারলাম না। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। কৃতজ্ঞতায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোটায় ফোটায় অশ্রু। মনের আবেগ ও কল্পনায় অনুভব করতে লাগলাম রাহমাতুললিল আলামীনের পুণ্যময় হাতের মধ্যে আমার হাত রয়েছে। অন্তরেও মুখে একত্রে উচ্চারিত হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" যেমনটি হয়েছিল চুয়াল্লিশ বছর পূর্বে এই স্থানে। আমার স্ত্রীর অবস্থাও ছিল অবর্ণনীয়। আবেগে অধীর ছিল সে। সেও কাঁদতে ছিল। পুত্র ও পুত্র বধুর চোখেও অশ্রু ছিল। মনের অজান্তেই আল্লাহর দরবারে হাত তুললাম। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু সবাই হাত তুললো আমার সাথে। সকলের রোদনেই ছিল এক আরজি, এক আবেগ, এক মিনতি ও এক সুর।

হে আল্লাহ! আমাদের হাজিরী কবুল করুন। আমাদের ঈমান ও নেক আমল কবুল করুন। আল্লাহ আপনার সন্তুষ্টি দান করুন।

এই স্থানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই দোয়া শেষ করে সাঈ করতে চলে গেলাম। আমাদের সাঈ শেষ হচ্ছে হচ্ছে এমন সময় অন্তর জুড়ানো বায়তুল্লাহ শরীফের আজান শুরু হয়ে গেল। আযানের পর নামায আদায় করে আমরা হোটেলে চলে এলাম। চব্বিশে আগষ্ট আমরা সওর গুহায় গেলাম। গুহা পর্যন্ত পৌঁছার পাহাড়ী পথ খুবই দুর্গম ও কষ্টকর ছিল। কিন্তু মনের অদম্য আগ্রহ গুহার চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদেরকে সাহস যোগাল। নবীজী (সাঃ) হিজরতের সময় আবুবকর (রাঃ) সহ এই গুহায় কয়েকদিন আত্মগোপন করেছিলেন। হিজরতের স্মৃতি বিজড়িত এই গুহায় পৌঁছে খুবই অনুপ্রাণিত হলাম। পৃথিবীতে মানুষের কোন স্থানে নির্দিষ্টভাবে থাকাটাই মূখ্য ও মূল বিষয় নয়। মূল ও মূখ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন, দ্বীনের বিধান পালন করা। এক জায়গায় সম্ভব না হলে অন্য জায়গায়, যেখানে সম্ভব চলে যেতে হবে। পালন করতে হবে আল্লাহর দ্বীন, তা যেখানেই

হোক। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশই পালন করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ। নিজের জন্মস্থান, বাড়ী, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ত্যাগ করে শূন্য হাতে তারা মক্কা থেকে আবিসিনিয়া ও মদীনা গিয়ে হিজরতের এই মহান আদর্শের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং হিজরতের ইহকালীন ও পরকালীন অপরিসীম কল্যাণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনের হিজরত কারীদের পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

আমাদের পুত্র তাহের জামিল সৌদী আরবের 'শারুরা' নামক স্থানে কর্মরত ছিল। তার ছুটি শেষ হওয়ায় সে তার কর্মস্থলে চলে গেল। এরই মধ্যে আমিন ভাই এসে পৌঁছলেন। আমিন ভাই তায়েফ ছিলেন। সেখান হতে তিনি আমাদের আসার কথা শুনে আমাদের সাথে হজ্জ পর্যন্ত থাকার জন্য ও আমাদের সাথে হজ্জ করার জন্য ছুটি নিয়ে এসেছেন।

ছাব্বিশে আগষ্ট আমরা হোটেল ছেড়ে জিয়াদ মহল্লায় জনাব মুহাম্মদ সফী খান এর এখানে চলে এলাম। সাত হাজার পাঁচশত টাকা দিয়ে আমরা একটি পৃথক কক্ষ নিলাম। আমাদের আহারের যাবতীয় ব্যবস্থাও এরই মধ্যে ছিল। আহারের আয়োজন ও রান্নার দায়িত্ব না থাকায় প্রচুর সময় ছিল আমাদের হাতে। এই সময়ের সদ্ব্যবহার করে প্রায় ষোল ঘন্টা আমরা হারাম শরীফে অতিবাহিত করতাম। আল্লাহ তা'আলার কত অনুগ্রহ ছিল আমদের উপর!

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে হজ্জ হবে। হজ্জের পূর্বে এক মাস সময় রয়েছে। তাই মদীনা মুনাওয়ারা জিয়ারতের প্রোগ্রাম স্থির করে নিলাম। আমিন সহেবও আমাদের সাথে থাকবেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমরা বাসে মদীনায় রওয়ানা করলাম। মদীনা পৌঁছতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে গেল। তাই পূর্ব থেকে ঠিক করা বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম এবং কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। সেহেরীর সময় নিদ্রা ত্যাগ করে ইসতিন্জা অজু সেরে মসজিদে নববীতে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

মসজিদে গিয়ে দেখি এখনও মসজিদে প্রবেশের দরজা বন্ধ। অপেক্ষা করতে থাকলাম দরজা খোলার জন্য। আরো লোকেরা অপেক্ষা করছে। আমাদের পূর্বেই অনেকে সেখানে পৌঁছেছে। দরজা খোলার সাথে সাথে অপেক্ষমান সবাই মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলো। আমরা প্রবেশ করে রওযা শরীফ জিয়ারতে চলে গেলাম। দ্বিতীয়বারের মত আমার সুযোগ হলো। এজন্য প্রথমে আল্লাহর মহান দরগাহে শোকর আদায় করলাম। তারপর সালাত ও সালাম পেশ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিয়ারতকারীদের ভীড় বেড়ে গেল। তাই আর বেশীক্ষণ কবর শরীফের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলোনা। পুনরায় মসজিদের ভিতরে এসে ফজরের নামাযের অপেক্ষা করতে লাগলাম। ফজরের আযান হলো, জামাত হলো। তারপর ঘরে চলে এলাম।

মদীনা মুনাওয়ারার সংক্ষিপ্ত অবস্থান কালে ধারাবাহিক ভাবে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে আদায়ের সংকল্প ছিল, সে অনুসারেই মসজিদের উপস্থিতি স্থির করে নিলাম। মক্কা মুকাররমা থাকাকালীন হারাম শরীফে জামাতে

সালাত আদায়ের সাথে সাথে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা ও উমরাহ্ করার বিষয় থাকে। সেজন্য মসজিদে অবস্থানের সময় কম পাওয়া যায়। কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় উমরা বা তাওয়াফের বিষয় থাকে না। অবশ্য রওযা শরীফ জিয়ারতের বিষয় থাকে, তা সত্ত্বেও মসজিদে অবস্থানের সময় ও সুযোগ মদীনায় বেশী পাওয়া যায়। আমরা এই অবকাশকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করতে লাগলাম এবং প্রায় ষোল-সতর ঘন্টাই মসজিদে অবস্থান করতে লাগলাম। নামায আদায়ের সাথে সাথে কুরআন তিলাওয়াতের দিকে বিশেষ জোর দিলাম। আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে মদীনায় নয় দিনের অবস্থানে তিন খতম কুরআন তিলাওয়াত করলাম।

মদীনা অবস্থানের সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু বিভিন্ন পবিত্র ও বরকতময় স্থানগুলোর জিয়ারত করা হয়ে উঠেনি। তাই বারই সেপ্টেম্বর একটি টেক্সি ভাড়া করে আমার স্ত্রী ও তার ভাই আমিন সহ সেসব স্থান জিয়ারত করে এলাম। তেরই সেপ্টেম্বর সকালে রওজা শরীফে বিদায়ী জিয়ারত করে একটি প্রাইভেট গাড়ী নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং সন্ধার কাছাকাছি সময়ে এসে মক্কা পৌছলাম।

মক্কা মুকাররমায় কাজ ছিল নফল তাওয়াফ করা, জামাতে নামায আদায় করা, আর অবসরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা। পঁচিশে সেপ্টেম্বর মিনা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় পাঁচ খতম কুরআন তিলাওয়াত করলাম। পঁচিশে সেপ্টেম্বর ইহরাম বেঁধে মিনায় গেলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর ছাব্বিশ তারিখ সকালে আরাফাহ্ রওয়ানা হলাম। সাথে মহিলা থাকার কারণে এবার গাড়ীতেই যেতে হলো। পায়ে যাওয়া হলো না। আগের বার কিন্তু মিনা হতে আরাফায় পায়ে হেটে গিয়েছিলাম। আরাফায় মসজিদের কাছাকাছি আমাদের তাঁবু ছিল। আমাদের তাঁবুতে তিনশ'র কাছাকাছি হাজী ছিলেন। ভাই আমিন সাহেব সম্ভবত কয়েক জনের সাথে আমার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তাই একে একে অনেকেই আমার বিষয়ে জেনে ফেললেন। সেজন্য লোকেরা খুব বিনয় ও ভক্তি সহকারে আমার সাথে দেখা করে কথা বলতে লাগলো। অনুরোধ করলো আরাফাতে আমি যেন নামাযে ইমামতি করি ও দোয়া পরিচালনা করি।

হজ্জের দিন পবিত্র আরাফায় নামাযের ইমামতি করতে গিয়ে মনটা ভীত হয়ে ধুক ধুক করতে লাগলো। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে আরাফায়, মুযদালিফায় ও পরবর্তী দিনগুলোতে মিনায় ইমামতির দায়িত্ব পালন করলাম এবং হজ্জ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসায়িলও আলোচনা করলাম।

ঊনত্রিশে সেপ্টেম্বর হজ্জের কাজ শেষ করে মক্কা মুকাররমা ফিরে এলাম। এর মধ্যে তাহের জামিল তার স্ত্রী সহ মক্কা এল আমাদেরকে তার কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে আনুসারে পরদিন অর্থাৎ ত্রিশে সেপ্টেম্বর ফজরের নামাযের পরপরই আমিন ভাই সহ মোট পাঁচ জন একটি প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করে রওয়ানা হলাম।

আমাদের প্রথম গন্তব্য হল তায়েফ। আমিন তায়েফে থাকেন। তাই তার বাড়ীতে আগে বেড়ানো, তারপর তাহেরের কর্মস্থলে যাওয়া। তায়েফের কাছাকাছি আসার পর মনে পড়ে গেল নবীজীর (সাঃ) এই তায়েফ শহরে নিগৃহীত হওয়ার

কথা।

মক্কাতে নবীজীর (সাঃ) তখন বড়ই দুঃখের সময় চলছিল। বড় আশা নিয়ে এসেছিলেন তায়েফে। তায়েফবাসী যদি ইসলাম ধর্ম কবুল করে তাহলে মক্কায় তার প্রভাব পড়বে। আশা ছিল মক্কার লোকদের নির্যাতন ও জুলুম হয়তো কিছুটা হ্রাস পাবে। নবীজী (সাঃ) তায়েফবাসীকে আল্লাহর তাওহীদ গ্রহণ করার জন্য আহবান করলেন। মুর্তি পূজা ত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু তায়েফবাসী তখন হক বুঝতে পারলোনা। নবীর সত্যতা তারা অনুবাধন করতে পারলো না। তাই তারা মূর্তি পূজা ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হলো না। উপরন্তু তারা বখাটে যুবক ও গোলামদেরকে নবীজীর (সাঃ) উপর লেলিয়ে দিল। তায়েফের বখাটে যুবকরা রাহমাতুললিল আলামীনকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলো, পাথর ছুড়তে লাগলো। পাথরের আঘাতে আল্লাহর নবীর পবিত্র দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও তিনি তায়েফবাসীকে লক্ষ করে গলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে আওয়াজ দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, হে লোকেরা তোমরা বল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-তুফলিহুন "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা সফল হবে।" একদিন দু'দিন নয়, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নাকি পাথরের আঘাত খেয়ে খেয়ে দশ দিন তায়েফের অলিতে গলিতে ঘুরে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। হায় তায়েফবাসী! আল্লাহর নবী তোমাদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন জান্নাতের চাবি, আর তোমরা তার গায়ে ছুড়েছ পাথর। কি নিষ্ঠুর বিনিময়!

দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে দ্বীনের নবীকে কি অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, এই কল্পনার সূত্র ধরে আমার মনে কখন যেন ভেসে উঠলো–আমার কাশ্মীরের দিনগুলো। এই দ্বীন গ্রহণ করার কারণেইতো আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে কত নির্যাতন করেছে! কত বেত্রাঘাত করেছে! মন যেন আমার কোথায় হারিয়ে গেল। কল্পনার কিনারাহীন ইথারে ভাসছি আমি। আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর তাওহীদ গ্রহণ করার কারণে, তা প্রচার করার কারণে কেন এত নির্যাতন করা হয়? কেন এত অত্যাচার করা হয়? কেন নির্যাতনকারীরা আল্লাহর তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা বুঝতে পারে না! পৃথিবীর সমস্ত নবী-রাসূলগণকেই তো আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার কারণে নির্যাতিত হতে হয়েছে, কাফেরদের হাতে যাতনা ভোগ করতে হয়েছে, কত মানুষকে দ্বীন গ্রহণ করার কারণে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে নিগৃহ হতে হয়েছে! এই কল্পনায় আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম! আমার মত সাধারণের কষ্টতো তুচ্ছ! বিশ্ব মানবের মুক্তির মহান দূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই তায়েফ শহরে যে কষ্ট করেছেন সারা পৃথিবীর মানুষের দ্বীনের জন্য ভোগকৃত সকলের কষ্টের চেয়েতা বেশী হবে। এমন অনুভূতির কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করেছেন।

সান্ত্বনা বোধ করলাম নিজের কষ্টের জন্য, লজ্জাও বোধ করতে থাকলাম। ইসলাম ধর্মের জন্য আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) এত কষ্ট করেছেন। সে তুলনায় আমাদের আর কি কষ্ট হয়েছে? আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কল্যাণ ও নেয়ামত লাভের কারণ হচ্ছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও পালন করা। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত কল্যাণ ও

নেয়ামত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণও হচ্ছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও পালন না করা।

তাই ইসলামই মানব জীবনের পার্থিব ও পরকালীন সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও সম্পদ। এই সম্পদ ও নেয়ামত লাভ করতে ও তা হেফাজত করতে কষ্টও তদ্রূপ হবে এটাই স্বাভাবিক। যারা এই নেয়ামত লাভে যত ত্যাগ ও কষ্ট বরদাশত করবেন তারা তত সফল ও সমৃদ্ধ হবেন। এর বাস্তবতা স্বয়ং আমি নিজে পাচ্ছি। আমি এমন কিইবা কষ্ট করেছি, সে তুলনায় এ পৃথিবীতেই যে মান-মর্যাদা ও সমৃদ্ধি লাভ করেছি তা সীমাহীন।

আমাদের গাড়ী তায়েফে আমিন ভায়ের বাসস্থানে পৌঁছলো। আমরা গাড়ী হতে নামলাম- আমিন ভাই এর ঘরে উঠলাম। পরদিন আমাদের সকালের নাস্তার দাওয়াত দিলেন আমিন ভায়ের এক সৌদী বন্ধু আবদুল্লাহ আলী আহ্সান। নাস্তার পর তাহের জামিল আমাদেরকে নিয়ে তার কর্মস্থল খামীস রওয়ানা হয়ে গেল। আমিন ভাই আর গেলেন না। তিনি তার কাজে যোগ দিলেন। তাহের তার গাড়ী তায়েফে রেখে গিয়েছিল। কারণ, হজ্জ মৌসুমে মক্কায় ভীড়ের কারণে ছোট ছোট গাড়ী প্রবেশ করতে দেয় না। সে গাড়ীতেই আমরা খামীস রওয়ানা করলাম। তায়েফ থেকে খামীস প্রায় সাড়ে ছয় শত কিঃ মিঃ দূর। পাহাড়ী পথ এবং সবুজ শ্যামল। ইশার সময় আমরা পথে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলাম। আমাদের পাশের গ্রামের এক ঘনিষ্ঠ লোক এখানে চাকুরী করত। তিনি অবহিত ছিলেন যে আমরা হজ্জের পর এ পথে আমাদের ছেলের কর্মস্থল শারুরাহ্ যাব, তাই তার একান্ত আবদার ছিল আমরা তার এখানে একদিন বেড়াই। সে আবদার রক্ষা করতেই আমরা রাত্রে ফজল আহমাদ সাহেবের ওখানে উঠলাম। পরদিন ২রা অক্টোবর শারুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। খামীস থেকে শারুরাহ পর্যন্ত প্রায় ছয় শত কিঃ মিঃ পথ। শারুরাহ পৌঁছতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। মক্কা হতে শারুরাহ পর্যন্ত দুই দিনে প্রায় বার শত কিলোমিটারের অধিক পথ টেক্সি যোগে এলাম। এত দীর্ঘ পাহাড়ী পথ টেক্সি যোগে অতিক্রম করে আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে গেলাম। রাত্রে বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। ক্লান্তি একটু দূর হলো।

পরদিন সকালে তাহের আমাকে তার কর্মস্থল C.M.H. এ নিয়ে গেল। পাকিস্তনী ডাক্তাররা এসে সাক্ষাত করলো, পরিচয় বিনিময় করলো। মনে হচ্ছিল পূর্ব থেকে আমি তাদের পরিচিত। হাসপাতালের বিভিন্ন শাখা ঘুরে, ডাক্তারদের সাথে পরিচিত হয়ে এবং কথা বলে খুবই ভাল লাগলো। শারুরাহ ইয়ামান সীমান্তের কাছাকাছি। এখানে একটি বড় সেনা ছাউনি রয়েছে। এটা সেই সেনা ছাউনিরই C.M.H.। আর এখানেই তাহের ডাক্তার হিসেবে কর্মরত।

শারুরাহ পৌঁছার তৃতীয় দিন শারুরাহ সেনা ছাউনী দেখতে গেলাম। বিকাল পর্যন্তই য়ামানের সীমান্ত 'অদীয়া' পর্যন্ত ঘুরে এলাম।

সৌদী আরব খুবই শান্তির দেশ, অতীব পূন্যময় ভূমি। যে দেশে আল্লাহর ঘর রয়েছে, মসজিদে নববী রয়েছে। রাহমাতুললিল আলামীন যেদেশে শায়িত আছেন। যেদেশের প্রতিটি অঞ্চল নিরাপদ ও শান্তির। যেখানে চুরির ভয় নেই, লুটের ভয় নেই, ধনী-গরীব সবাই নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে ঘুমাতে পারেন। ইসলামী শরীয়তের

বিধান ও দন্ডবিধি সেখানে বাস্তবায়িত আছে। সে কারণেই নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করছে। মুসলমানদের অন্যান্য দেশগুলোতে ইসলামী বিধি-বিধানের প্রয়োগ না থাকার দরুণই যত সব অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা।

শারুরায় তাহেরের বাসায় দশ দিন রইলাম। খুবই আরামের মধ্যে দিনগুলো কাটলো। ছেলের কর্মস্থলে তার বাসায় থাকতে বড়ই প্রশান্তি অনুভব হলো। ছেলে-সন্তান যোগ্য হলে পিতা-মাতা বড়ই প্রশান্তি লাভ করেন। আর যদি সন্তান অযোগ্য ও অথর্ব হয় তাহলে পিতা-মাতার অশান্তির শেষ নেই। আমরা এখানে আসাতে ছেলে যেমন খুশী হয়েছে আমরাও তেমনই আনন্দ পেয়েছি।

দশদিন থাকার পর ১৩ই অক্টোবর আমরা সৌদী বিমানে জিদ্দা চলে এলাম। আমিন ভাইকে এ বিষয় জানানো হয়েছিল। তাই তিনি জিদ্দা বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের গ্রামের দু'জন ঘনিষ্ঠ লোক সুলতান সিকান্দার সাহেব ও আমির আফসার সাহেবও জিদ্দা বিমান বন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সুলতান সিকান্দার সাহেব জিদ্দায় তার বাসায় আমাদের রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের উমরা করার ইচ্ছা ছিল, তাই আমরা জিদ্দায় রাত্রে না থেকে মক্কা চলে এলাম। জিয়াদ মহল্লায়তো আমার কক্ষ রাখাই ছিল, তাতে গিয়ে উঠলাম এবং পরে উমরা আদায় করলাম।

১৪ই অক্টোবর বিদায়ী তাওয়াফ করলাম, দোয়া করলাম হে আল্লাহ! আমাদেরকে পূনঃ পূনঃ আপনার ঘরে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আপনার ঘরের কল্যাণ ও হিদায়াত দান করুন। আমার স্ত্রীর অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। সে আল্লাহর ঘরের দেয়ালে মিশে অঝোরে কাঁদছিল। আমি লক্ষ্য করেছি এই হজ্জের সফরে বিভিন্ন স্থানে যেখানেই দোয়া করেছি সে কেঁদেছে আমার চেয়ে অনেক বেশী। এমনিতেই বলে মহিলাদের মন বেশী নরম। তাদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালনা করলে তারা খুব বেশী দ্বীনদ্বার হয়।

বিদায়ী তাওয়াফ ও দোয়া সেরে ঘরে এলাম। আজই আমাদের জিদ্দা যাওয়ার কথা। রাত্র জিদ্দায় যাপন করলাম।অবসরে বাজারে গেলাম। বাচ্চাদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করলাম। আমিন ভাই এই হজ্জের সফরে মক্কা ও মদীনায় আমাদের যে খিদমত করেছেন সত্যিই তা ভুলার মত নয়। আল্লাহ তাকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম বিনিময় দান করুন।

১৫ই অক্টোবর ১৯৮২ ইং দুপুরে আমাদের ফ্লাইট। সেভাবেই বিমান বন্দরে এলাম ও বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বিমানে উঠলাম। পি,আই,এর জাহাজ। বিকালেই করাচী এসে পৌঁছলাম। কাষ্টম বিভাগ খুব সহজভাবেই আমাদেরকে অবসর করে দিল। সন্ধার পর পর একই দিন আমাদের রাওয়াল পিন্ডির জাহাজ ছিল। তাই আমরা পিন্ডির জাহাজে গিয়ে বসলাম। পিন্ডিতে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত এগারটা হয়ে গেল। বিমান বন্দরে অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। একাধিক গাড়ী রাখা ছিল আমার জন্য। বন্ধুরা বড়ই ভালবাসা ব্যক্ত করে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। কাষ্টমের ডাইরেক্টর জেনারেল আহসান আলম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। আমি সবিনয়ে বললাম, জনাব আপনার এত রাত পর্যন্ত এখানে কষ্ট করার

কি প্রয়োজন ছিল? বললেন, এটাতো আমাদের সৌভাগ্যের কারণ। আপনি আল্লাহর ঘর দেখে ফিরছেন। আপনার দেখা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

রাওয়াল পিন্ডি বা ইসলামাবাদে আর বিলম্ব করলাম না। রাত বারটার দিকে রওয়ানা করে তিনটার সময় সহীহ-সালামতে বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে আমি মধ্যম পর্যায়ের ছাত্র ছিলাম। শ্রেণীতে মেধা তালিকায় থাকতে পারতাম না। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমার মেধা খুবই বৃদ্ধি পেল। নীচের শ্রেণী হতে উপরের শ্রেণীগুলোতে অপেক্ষা কৃত ভাল ফল হল। আমার ছাত্র জীবনে আমি মোট তিনটি গোলড্ মেডেল দু'টি রৌপ্য মেডেল লাভ করেছি, যা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার কারণে লাভ করেছি।

দরসে নেজামী-কাওমী মাদ্রাসার ক্লাশ মোট বারটি, যা স্বভাবিক ভাবে ছাত্ররা দশ বছরে শেষ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে আমি তা ছয় বছরে সমাপ্ত করেছি এবং উত্তম ভাবেই করেছি। আমি অনুভব করছি এটা ইসলামের কল্যাণ।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে আমি জাগতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করেছি। কিশোর বয়সেই আমি আমার পিতামাতার আশ্রয় ত্যাগ করেছি। পিতার ঘরে আমি দারিদ্রতা বা অভাব দেখিনি, বরং প্রাচুর্যের মধ্যেই আমার বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। কৈশোরেই আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে আমাকে পিতার গৃহ ত্যাগ করতে হলো। তখন আমি কোন উপার্জনের পথ ধরিনি, বরং দীর্ঘ শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেছি। আমার এই দীর্ঘ শিক্ষা জীবনে আমি কখনও অভাব-অনটনে পড়িনি, বরং যা প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে বেশীই আমার নিকট থাকতো।

আদালতে মামলা চলাকালীন মেজিস্ট্রেটরা প্রায় সকলেই আমাকে বলতো, ভিক্ষা করে তোমাকে জীবন যাপন করতে হবে। ভিক্ষা ছাড়া তোমার কোন পথ থাকবে না। যে মুসলমানরা আজ তোমার সাথে এসেছে বা রয়েছে, এরা কাল বা দু'চার মাস পর তোমার কাছেও থাকবে না, তোমার কোন খোঁজ খবরও রাখবেনা, তখন দেখবে তোমার অভাবের অন্ত থাকবে না। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর অনেককে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখেছি ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলতো।

এসব কথা শুনে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি কখনও ভিক্ষা করবো না, যত প্রয়োজন হোক ভিক্ষা আমি করবো না। প্রয়োজনে মজুরী করে লেখা পড়া করবো। আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে আমার ভিক্ষা করতে হয়নি। এমন একদিনও আসেনি যে কাউকে বলতে হয়েছে আমার স্কুলের বেতন দিতে হবে, বই কিনতে হবে, খাতা পেন্সিল নাই, জামা কাপড় লাগবে। এ রকম প্রয়োজনের কথা কারো নিকট ব্যক্ত করতে হয়নি। নও মুসলিম পরিচয় দিয়ে অনেককে এরূপ করতে হয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকালে যেসব হৃদয়বান মুসলমান আমার নিকট ছিলেন, উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, তারা কোনদিনই আমাকে ছেড়ে যাননি, বরং সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরকে আমার হিতাকাঙ্খীরূপে পেয়েছি। আমার প্রয়োজনের কথা তাদের সামনে ব্যক্ত করতে হয়নি। তারা এ ব্যাপারে সর্বদা খুবই সজাগ ছিলেন। তাই প্রয়োজন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই এবং

প্রয়োজন পরিমানের বেশীই আমাকে তারা দিয়ে রাখতেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, পিতা, মাতা, ভাই গোত্র হারিয়েছি সত্য, কিন্তু একাধিক ব্যক্তি আমাকে পিতৃত্বের স্নেহ দিয়েছেন। অনেকের মাতৃত্ব আমাকে বিমোহিত করেছে। শত শত ভাই শত শত বন্ধু আমাকে তাদের ভ্রাতৃত্বে ও বন্ধুত্বে আবেষ্টিত করে রেখেছে। এমনি ভাবেই আমার জীবন সব দিক দিয়ে শিক্ষায়, স্বাচ্ছন্দে, ভ্রাতৃত্বে, বন্ধুতে সমৃদ্ধ রয়েছে। কোনপ্রকার গ্লানি-দৈন্য আমাকে আচ্ছন্ন করেনি। বিবাহের পর তো 'আইনি' আত্মীয়তায় আরো স্বাচ্ছন্দ পেলাম। শিক্ষা অধিদপ্তরে যখন চাকুরী পেলাম, তখনতো নিয়মিত বেতন গ্রহণ করতে লাগলাম। তখন হিতাকাংক্ষী ও বন্ধুদেরকে বললাম, এখনতো আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপার্জনের পথ করে দিয়েছেন, যা দ্বারা আমার প্রয়োজন ভালভাবেই পূরণ হয়ে যায়। তাই আপনারা যারা এতদিন আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আসছিলেন ভবিষ্যতে আর সেটার প্রয়োজন হবে না এবং তা বাঞ্ছনীয়ও হবে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সবাইকে এর উত্তম সুফল দান করুন।

যখন থেকে আমার এই আত্মজীবনী কেন্দ্রীক বই "মিনায যুলুমাতি ইলান নূর" আঁধার থেকে আলোর দিকে প্রকাশিত হয়ে বন্ধুদের হাতে পৌছলো তখন আমার অনুগ্রহ-ভাজনদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। এমন অনেক বন্ধু রয়েছেন, যাদের সাথে এখনো দেখা সাক্ষাত হয়নি, চিঠি পত্রে তাদের সাথে অব্যাহত ভাবে যোগাযোগ চলছে। অনেকে দেখা করার জন্য বাড়ীতে এসেছেন। পরিচিত হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। মনের অকৃত্রিম অনুরাগ অফুরন্ত ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে অনেকে অগাধ সম্পদের মালিক, অনেকে আবার উচু পদ মর্যাদারও অধিকারী।

মাসিক উর্দূ ডাইজেষ্ট এর অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯৮০ ইং এই তিন সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে আমার আত্ম কথা প্রকাশিত হওয়ার পর শুধু যে দেশের চিঠি পত্র আসা বেড়ে গেল তাই নয়, বরং বিদেশ হতেও চিঠি পত্র আসতে শুরু করলো এবং দিন দিন তার সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। এরই সূত্র ধরে রেডিও পাকিস্তান ইসলামাবাদ হতে আমার জীবনী ভিত্তিক একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হলো। সিনিয়র প্রডিউসর জনাব সাদেক সাহেব সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করে তা প্রযোজনা করেন এবং প্রচার করেন। রেডিও পাকিস্তানের বহিঃবিশ্ব প্রোগ্রামে প্রতিদিন আধা ঘন্টা পর্যন্ত আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ, এর প্রেক্ষাপট, পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলী ইত্যাদি বিষয়াদি থাকতো এই সাক্ষাৎকারে। আমার জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ও থাকতো তার মধ্যে।

উর্দূ ডাইজেষ্ট এ আত্ম কথা ও রেডিওতে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার কারণে আমার এ বইটির চাহিদা এত বেড়ে গেল যে, বছরে প্রায় দু'টি মুদ্রণ প্রকাশ করতে হয়েছে। বইটির মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন করাচীর মহানুভব ব্যক্তি সিদ্দীকী ট্রাষ্টের স্বনামধন্য সত্ত্বাধিকারী জনাব মনসুরুজ্জামান সাহেব। এই ট্রাস্ট প্রতিবছর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদির উপর লিখিত ছোট ছোট বহু পুস্তিকা প্রকাশ করে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পৌছানোর ব্যবস্থা করে। আল্লাহ তাদের এই দ্বীনী খিদমত কবুল করুন।

চার পাঁচ বছরে আমার এ বইটির সাতটি মুদ্রণ প্রকাশ করতে হয়েছে। বিভিন্ন

ভাষাভাষী লোকদের চাহিদার কারণে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় এর অনুবাদ শুরু করা হয়েছে। বুঝাল ইন্টার কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ মুমতাজ আহমাদ সাহেব ইংরেজী অনুবাদ আর মাওলানা মুহাম্মদ আহমাদ সাহেব হিন্দী অনুবাদ শুরু করেছেন এবং এরই মধ্যে মনসুরুজ্জামান সাহেব করাচী থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, সিন্ধি ভাষায়ও এর অনুবাদ শুরু করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কারো হিদায়াত এবং আমার নাজাতের উসিলা করুন।

আমাদের দেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনা ওয়াজ-নাসীহত করার প্রচলন অনেক দিন পূর্ব হতেই রয়েছে। এরই মধ্যে এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ওয়াজ বা আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন এলাকা হতে লোকেরা দাওয়াত দেওয়া শুরু করলো। চিঠি পত্রে এরূপ দাওয়াত পেতে লাগলাম। প্রায় সকলেই আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানাবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। যেখানে যেখানে আমার বইটি পৌঁছেছে সেখানে সেখানে আমার বক্তব্য শোনার ও আমাকে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মনের আবেগ যাই হোক আমি কোথাও ওয়াজ করতে যাওয়ার ব্যাপারে নিঃসংকোচ হতে পারিনি। মনে হচ্ছিল মানুষেরা আমাকে একটু বাড়িয়েই প্রত্যাশা করছে। আমার তো জানা আছে আমার মধ্যে দ্বীনী আলোচনা বা ওয়াজ করার যোগ্যতা হয়নি। তা সত্ত্বেও মানুষের আবেগ পূরণ করতে হয়েছে সসংকোচেই। বিভিন্ন স্থানে যেতে শুরু করলাম। আর এটাকে আমি দ্বীনের তাবলীগ রূপে গণ্য করতে লাগলাম। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ ও চেতনা রয়েছে। সত্যিকারের ধর্মীয় নেতার যথাযথ নেতৃত্ব পেলে দেশে পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যন্তএলাকা পর্য ন্ত যাওয়ার সুযোগ হলো।

ঐ সময়কার পাঞ্জাবের এক প্রখ্যাত বুজুর্গ ও আলেমেদ্বীন জনাব সাইয়্যিদ নজীর হুসাইন শাহ হাসেমী রমযানের পূর্বে আমাকে একটি পত্র লিখলেন। তিনি আমার সাথে কথা বলতে চান। তাঁর পত্র পাঠে মনে হল তিনি আমার এই বইটি সম্ভবত পড়েছেন। আর বই এর কোন বিষয় সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিতে চান।

একদিন আমি ও আমার এক বিশেষ বন্ধু জনাব মালিক মুহাম্মদ নাওয়াজ গাড়ীতে লাহোর যাচ্ছিলাম। লাহোরের পথেই ঝং জিলার লালিয়া শহর। আর ঐ শহরেই সাইয়্যিদ নজীর হুসাইন সাহেবের বাড়ী। কথাটি আমার মনে ছিল, তাই আমাদের গাড়ী লালিয়া শহরের কাছে আসতেই আমি নাওয়াজ সাহেবকে বললাম, এই শহরে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি রয়েছেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। লাহোর যাওয়ার হাইওয়ে শহরের বাহির দিয়ে, আমার কথা শুনেই মালিক নাওয়াজ সাহেব গাড়ী মোড় দিয়ে শহরে প্রবেশের পথ ধরলেন। মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করে আমরা শাহ সাহেবের বাড়ী পৌঁছলাম। প্রসিদ্ধ আলেমেদ্বীন শহরের সবাই তাঁকে চিনেন। শাহ সাহেবের নিকট নিজের নাম বলতেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুবই খুশী প্রকাশ করলেন। কথার মাঝে আমি শাহ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমার বইটি পড়েছেন কি? বললেন না, আমি আপনার বই সম্পর্কে অবহিত নই, বরং আপনার সম্পর্কেও আমার কোন কিছু জানা ছিল

না। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কলেজের ঠিকানায় পত্র লিখলেন কিভাবে? কলেজের ঠিকানাই বা জানলেন কার কাছে?

শাহ সাহেব বললেন, এটা একটা গোপন বিষয়, মিয়ানী এসেই আমি আপনাকে তা বলব।

আমি নিবেদন করলাম ঃ হুজুর মিয়ানীতে আপনার পদধুলি পড়লে তা হবে মিয়ানীবাসীর পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ মানুষ, এতটুকু কষ্ট করে যাওয়া আপনার স্বাস্থ্যে দুঃসাধ্য হতে পারে। আমি যখন উপস্থিত হয়েছি, যা কিছু ইচ্ছা নির্দেশ দিন। জবাবে শাহ সাহেব শুধু এতটুকু বললেন, আমার কাছে আপনার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি পয়গাম (খবর) আমানত রয়েছে। আপনার বাড়ীতে গিয়েই পৌঁছাবার নির্দেশ।

শাহ সাহেবের একথা শুনে আমি নীরব হয়ে গেলাম, চিন্তিতও হলাম হয়তো নবীজীর (সাঃ) পক্ষ হতে কোন তিরস্কার বা সতর্কবাণী হবে। নবীজী (সাঃ) যদি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন তাহলে আমার কি হবে? মনে একটা অজানা চিন্তা সৃষ্টি হলো। মাঝে মধ্যে উৎকণ্ঠাও বোধ করতে লাগলাম।

পবিত্র রমযান মাসের উনত্রিশ তারিখ ইফতারের পূর্বক্ষণে-ইফতারের আয়োজন করছি এমন সময় শাহ নজীর হুসাইন সাহেব এলেন আমাদের বাড়ীতে। পবিত্র রমযান মাসের এমনি বরকতময় সময়ে এত বড় বুযুর্গ ব্যক্তির আগমনকে আমরা পরম সৌভাগ্য মনে করতে লাগলাম। ইফতারের আয়োজন আরো কিছু বাড়ানো হলো। শাহ সাহেব ইফতারের পর বললেন, আমি এখনই খানা খাব এবং বাড়ী চলে যাব। যদি আগামী কাল ঈদ হওয়ার ঘোষণা হয়ে যায় তাহলে যেন আমি বাড়ীতে পৌঁছে ঈদ করতে পারি।

মাগরিবের নামায আদায়ের পর আমি শাহ সাহেবের সম্মুখে আদব ও বিনয়ের সাথে বসে গেলাম। সেই খবর শোনার জন্য- যা নবীজীর (সাঃ) পক্ষ থেকে আমাকে পৌঁছাবার নির্দেশ তিনি পেয়েছেন। মনটা আমার ভীষণ দুরু দুরু করতে লাগলো।

শাহ সাহেব বলতে লাগলেন, একবার আমার পা এক প্রকার বিশেষ ক্ষত রোগে আক্রান্ত হলো। ক্ষত বাড়তে বাড়তে এমন হলো যে, সর্বদাই ঐ ক্ষত হতে রক্ত বের হতে থাকতো। ক্রমে ক্রমে পায়ের স্থুলটা কমতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত হাঁটবার জন্য যষ্ঠি ব্যবহার করতে বাধ্য হলাম। একদিন আমার এক আত্মীয় তার গাড়ীতে বসিয়ে আমাকে লাহোরে এক হোমিও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমার পা ভালভাবে দেখে বললো, এতো প্রায় অকেজোই হয়ে গিয়েছে। এখন তো পায়ের ক্ষত অংশ কেটে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। ঔষধ দ্বারা পা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সকালে হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। অস্ত্রোপোচার করে ক্ষত অংশ কেটে দিক। অন্যথায় বাকী অংশটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে।

শাহ সাহেব বলতে লাগলেনঃ রাত যাপনের জন্য আমরা একটি হোটেলে উঠলাম। ইশার নামায আদায়ের জন্য যষ্ঠির উপর ভর দিয়েই মসজিদে গেলাম। ইশার নামায আদায়ের পর লোকেরা যার যার মত চলে গেল। আমি বসে বসে

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে মনে এরূপ ধারণা ও চিন্তা আসতে লাগলো–হে আল্লাহ! ডাক্তারদের নিকট আমার পা রক্ষা করার মত তো কোন চিকিৎসা নেই। তারা বলছে তারা আমার পা রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে ইচ্ছা করলে তো মুহূর্তেই আমার পা সুস্থ করে দিতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ করলে মানুষের অসাধ্য কাজ আপনি তো চোখের পলকেই সমাধান করতে পারেন।

বিষণ্ন মনে মসজিদেই বসে রইলাম। কখনও কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম, কখনওবা বসে বসে চিন্তা করছিলাম। এভাবে রাত প্রায় দু'টা বেজে গেল আমার ঘুম পেল। কুরআন মজীদ বন্ধ করে আমি মসজিদেই শুয়ে পড়লাম এবং পরক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, একটি অত্যন্ত সুন্দর বাড়ী, অনেক লোকজন আসা যাওয়া করছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ বাড়ীতে এত লোক কেন আসা যাওয়া করছে?

সেই ব্যক্তি জবাব দিলেনঃ শাহ সাহেব আপনি কি জানেন, যেন এ বাড়ীতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবস্থান করছেন?

(শাহ সাহেব বলেন) একথা শুনে আমি স্বপ্নেই উঠে দাঁড়ালাম এবং যষ্ঠির সাহায্যে সেই বাড়ীতে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

গৃহে প্রবেশ করে দেখলাম, রাহমাতুল লিল আলামীন (সাঃ) আসনরত। আর অনেক লোক তাঁর চারদিকে নতশীরে নীরবে বিনীতভাবে বসে আছেন। আমি নবীজীর (সাঃ) নিকটে গিয়ে বিনীতভাবে সালাম নিবেদন করলাম।

নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি উদ্দেশ্যে এসছে? (শাহ সাহেব) আমি বললাম, সাইয়িদী আমার এই রোগ মুক্তির দোয়া প্রার্থনা করার জন্য আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি।

নবীজী (সাঃ) বললেন ঃ সকালে বাড়ী চলে যাও, আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন।

শাহ সাহেব বলেন ঃ নবীজীর (সাঃ) এ কথা শুনে আমি আশ্বস্ত ও নিশ্চিত হলাম যে, ইনশাআল্লাহ আমি সুস্থ হব। এখন অস্ত্রোপাচার বা পা কেটে ফেলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বিদায় হওয়ার জন্য পূনঃসালাম পেশ করে বিদায় হতে উদ্যত হলাম, এমন সময় নবীজী (সাঃ) বললেনঃ আমার পার্শ্বে দাঁড়ানো এ ব্যক্তিকে তুমি চিন ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমি তাঁর সাথে পরিচিত নই। নবীজী (সাঃ) বললেন, এ হলো আবু বকর আমার সাথী; এর কথা শুনে তারপর তুমি যাবে। নবীজীর (সাঃ) এ নির্দেশের পর আমি আবু বকর (রাঃ)-এর দিকে ফিরে সবিনয়ে সালাম দিলাম। আবু বকর (রাঃ) খুবই স্নেহভরে আমার সালামের জবাব দিয়ে পকেট হতে এক টুকরা কাগজ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কাগজটির উপর লিখা ছিল-

"প্রফেসর গাজী আহমাদ, প্রিন্সিপাল গভর্মেন্ট ইন্টার কলেজ; বুঝালকালা, জিলাঃ ঝিলাম। আবু বকর (রাঃ) বললেন" ঠিকানাটা ভাল করে পড় এবং মুখস্ত করে নাও।

শাহ সাহেব ঃ মুহতারাম, আমি কাগজটি পড়েছি ইনশাআল্লাহ মনে থাকবে।

আবু বকর ঃ এই ব্যক্তিকে তুমি চিন কি ?

শাহ সাহেব ঃ জনাব আজ পর্যন্ত আমি এই নাম শুনিনি এবং তাকে জানিও না।

সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) বললেন, গাজী আহমাদ এমন এক ব্যক্তি যে স্বয়ং আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তুমি গাজী আহমাদের বাড়ীতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই পয়গাম পৌঁছে দিয়ে আসবে- গাজী আহমাদ যেন ইসলাম ধর্মের খিদমত করার জন্য প্রস্তুত থাকে। "এ ছিল নবীজীর (সাঃ) পয়গাম। নির্দেশ ছিল তোমার বাড়ীতে এসে পৌঁছে দেয়ার। আল হামদুলিল্লাহ আজ নবীজীর (সাঃ) সে আদেশ আমার পালন করার সৌভাগ্য হলো। তুমি যখন আমার বাড়ী গিয়েছ, সেখানে এ পয়গাম পৌঁছালে নবীজীর (সাঃ) নির্দেশ অমান্য হতো।"

শাহ সাহেব বললেন ঃ ফজরের নামায আদায় করে আমি হোটেলে এলাম। সাথীদেরকে বললাম, চল বাড়ী চলে যাই। হাসপাতালে ভর্তি হব না। অপারেশনের প্রয়োজন নেই। কোন প্রকার চিকিৎসাও করাব না। আল্লাহ আমার পা ভাল করে দিবেন। সাথীদের একজন টেক্সি ঠিক করে আনলেন। হোটেলের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমরা বাড়ী চলে এলাম। বাড়ী ফিরার পর ক্রমে ক্রমে আমার পায়ের ক্ষত ভাল হতে লাগলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমার পা পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

আমি বললাম (গাজী আহমাদ) মুহতারাম ঃ আমার বিশ্বাস রাহমাতুললিল আলামীন যার দিকে করুণার দৃষ্টি বুলান, তার দৈহিক ও মানসিক সব রোগ দূর হয়ে যায়।

এরই মধ্যে রেডিওতে পরদিন ঈদ হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা প্রচারিত হলো। শাহ সাহেব বললেনঃ গাজী সাহেব এবার অনুমতি দিন। একথা বলেই শাহ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং চলতে শুরু করলেন। শাহ সাহেবের চলার অবস্থা দেখে মনেই হয়নি যে তাঁর পায়ে কোন ত্রুটি আছে।

শাহ সাহেবের মুখে তার স্বপ্নের কথা শোনার পর আমার মনের অবস্থা যে কেমন হয়েছিল, তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। আমি কেন, যে কোন ব্যক্তিই মনের এরূপ অবস্থা ব্যক্ত করতে পারবেন না। আনমনেই আমার চোখ অশ্রু বারি করতে লাগলো। এরূপ সৌভাগ্য সম্ভবত ঃ অনেক বড় দুর্ভাগ্য সহনের চেয়েও দুঃসহ। শাহ সাহেবকে বিদায় দিয়ে ঘরে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসে রইলাম। মন পূনঃ পূনঃ ফরিয়াদ করছে আল্লাহ এ সৌভাগ্য বহন করার তৌফিক আমাকে আপনি দান করুন।

অল্পদিনের মধ্যে আরও দু'তিন জন বন্ধু প্রায় একই রকমের স্বপ্ন আমাকে শুনিয়ে গেল। এক বন্ধু শুনালো যে,"আমি, স্বপ্নে দেখেছি একটি বিল্ডিং, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবস্থান করছেন। নবীজীর (সাঃ) অবস্থানের কথা শুনে আমি তাতে প্রবেশ করতে চাইলাম, কিন্তু দরজায় দাঁড়ানো কিছু লোক আমকে বাঁধা দিয়ে বললোঃ তোমাদের এই শ্রেণীর লোকদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নেই। আমি একথা শুনে কাঁদতে লাগলাম। এরই মধ্যে 'আপনাকে' গাজী আহমাদ সাহেব দেখলাম। আমাকে আপনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে ভিতরে প্রবেশের

নিয়ম বলে দিব। তারপর ইনশাআল্লাহ তুমি অনুমতি পেয়ে যাবে।

আরেক বন্ধু বললো ঃ আমি স্বপ্নে দেখি আপনি (গাজী সাহেব) এক জায়গায় কুরআনের দরস দিচ্ছেন। অনেক লোক তাতে শরীক হয়ে দরস শুনছে। আমি স্বপ্নেই জিজ্ঞাসা করলাম এ জায়গায় দরস দেওয়ার রহস্যটা কি ?

আপনি জবাব দিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং আমাকে এখানে কুরআনের দরস দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আরও দু'জন পরিচিত লোক এসে এমনি স্বপ্ন দেখার কথা বলে গেল। এক একটি স্বপ্নের কথা শুনে আমি অভিভূত হতে লাগলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমি যে নিজের কত বড় কল্যাণ করেছি তার পরিমাপ করাও সম্ভব নয়। এসব শুধুই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কল্যাণে লাভ করছি। ইসলাম ধর্মের জন্য যে যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করবে সে ততবেশী কল্যাণ লাভ করবে। আমি বাস্তব ভাবেই তার প্রমাণ পাচ্ছি।

১৯৪৮ ইং হতে ১৯৫৮ ইং পর্যন্ত আমি অন্যান্য কর্মের সাথে বুঝালকালার জামে মসজিদের খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। আমি লক্ষ করেছি মানুষেরা আমার দ্বীনি বক্তব্য শ্রবণে অধিক মনোযোগী হত। ইসলাম ধর্মের যথার্থতা সম্পর্কে আমার উপলব্ধি ছিল ভিন্ন। কারণ, আমি ছিলাম অন্য ধর্মের অনুসারী, তাই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমার উপলব্ধি ছিল বাস্তব।

১৯৫৮ ইং থেকে ১৯৬৩ ইং পর্যন্ত আমি লাহোর ছিলাম, তাই লাহোর পোঁঞ্চ হাউস কলোনী জামে মসজিদে বাদ মাগরিব কুরআনের তাফসীর করতাম এবং রমযান মাসে প্রতি রাত্রে খতমে তারাবীতে প্রতি চার রাকাত পর চার রাকাতে যতটুকু তিলাওয়াত করা হতো ততটুকুর সংক্ষিপ্ত সার ও বিষয় বস্তু আলোচনা করে দিতাম। মাস শেষে শ্রোতাবৃন্দ আমাকে পাঁচশত টাকা দিতে চাইলো, আমি তা উক্ত টাকা মসজিদের নির্মাণ কাজে জমা দিয়ে দিলাম। তখন আমি শিক্ষা অধিদপ্তরে চাকুরী করতাম। ঐ চাকুরীতে আমি যে বেতন পেতাম তা আমার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৯৬৩ সালের শেষ ভাগে আমি লাহোর থেকে মিয়ানী ফিরে এলাম। মহল্লার লোকদের অনুরোধে মহল্লার মসজিদে কুরআনের তাফসীর, মিশকাত শরীফের দরস ও জুমার নামাযে খোৎবা প্রদান শুরু করলাম। মসজিদটির নির্মাণ পুরানো হয়ে গিয়েছিল। পুনঃ নির্মাণ জরুরী হয়ে পড়লো। আমরা পুনঃ নির্মাণে হাত দিলাম। আল্লাহ তাআলার অসীম অনুগ্রহে অল্প দিনে এক মনোরম মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেল। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করতে থাকলাম।

১৯৭৬ সালে বুঝালকালার কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব অবসর গ্রহণের পর বুঝালের লোকেরা আমার নিকট এল এবং ঐ কেন্দ্রীয় মসজিদে খতীবের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো। বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও চিন্তা বিবেচনার পর বুঝালের কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীবের দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত হলো। বুঝালে তিনটি মসজিদ ছিল। ধর্মীয় কোন্দলের কারণে এলাকার লোকেরা পৃথক পৃথক ভাবে জুমার নামায আদায় করতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় মসজিদে সকলের জন্য জুমা

আদায় সম্ভব ছিল। তাই সকলকে এক মসজিদে জুমা আদায়ে একত্রিত করার চেষ্টা করে আল্লাহর অনুগ্রহে সফল হলাম এবং কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বুঝালের সকল মুসলমানরা জুমার এক জামাতে একত্রিত হল। এটা আমার জন্য এক মহা আনন্দের কারণ হলো। মিয়ানী ষ্টেশন বিভিন্ন কারণেই খুব গুরুত্ববহ ছিল। কিন্তু সেখানকার একমাত্র মসজিদটি প্রায় অনাবাদ পড়ে থাকত। এলাকার লোকেরা আমার নিকট এসে বললো, বুঝালের জামে মসজিদ তো আবাদ হয়ে গেল,এবার আপনি মিয়ানী স্টেশনের মসজিদটি আবাদ করে দিন।

বুঝালের কেন্দ্রীয় মসজিদের জন্য একজন যোগ্য খতীব খোঁজা শুরু হলো। কিছুদিন পর একজন খতীব পাওয়া গেল। তাকে দায়িত্ব দিয়ে আমি মিয়ানীতে চলে এলাম। জুমার খতীবের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে মসজিদের সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হলো। জায়গারও প্রয়োজন ছিল, টাকারও প্রয়োজন ছিল। কিছু দিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সব ব্যবস্থা হল।

বুঝালের কলেজে কোন মসজিদ ছিল না। কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরা বাজারের মসজিদে নামায আদায় করতো। কলেজ ক্যাম্পাসে মসজিদ নির্মাণ খুবই জরুরী ছিল। বিভিন্ন দিকে আমরা হাত বাড়ালাম। সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক আলহাজ্জ ফজল আহমাদ সাহেব এক হাজার টাকা দিলেন। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সঙ্গতি অনুসারে মসজিদ নির্মাণের জন্য দান করতে থাকলেন। ভিত্তি স্থাপন করে নির্মণ কাজ শুরু করা হলো। ছাদ পর্যন্ত আসার পর আওয়ান বাস সার্ভিসের মালিক মিয়া সুলতান সাহেব পূর্ণ ছাদ একাই করে দেয়ার অঙ্গীকার করে সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিলেন। ছাদও নির্মিত হল। এভাবে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে বুঝাল ইন্টার কলেজে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হলো।

পাঠ্যজীবন থেকেই আমার মনের একান্ত আগ্রহ ছিল ইসলামী ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের সাক্ষাত ও তাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য গ্রহণ করা। এই আকর্ষণে যেখানেই যখন গিয়েছি বা অবস্থান করেছি সেখানে তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করেছি। এ পর্যায়ে প্রথম ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা আবদুর রউফ। তিনি বুঝালের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণে তাঁর শ্রম, সাধনা ও নির্দেশনাই ছিল মূল। আলেম ও ব্যক্তি হিসাবে তিনি অতি প্রসিদ্ধ না হলেও তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই আকর্ষণীয় ও মধুর। মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব আজ জীবিত নেই। অন্যথায় তিনি আজ আমাকে দেখলে বড়ই খুশী হতেন। আমার জন্য তিনি যে অকৃত্রিম ও অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্ট করেছেন আজ তিনি তাঁর শ্রমের সফলতা স্বীকার করতেন। আমি কোনদিনও তাঁর শ্রমের ও সেবার প্রতিদান দিয়ে শেষ করতে পারবো না। যখন মাওলানার কথা স্মরণ হয় তখন আমার মন বিচলিত হয়ে উঠে।

দারুল উলুম দেওবন্দ থাকাকালে কারী তায়্যিব সাহেব ও শাইখুল আদব মাওলানা এজাজ আলী সাহেব দ্বয়ের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তাদের মহান ব্যক্তিত্ব ও আদর্শিক জীবন দেখে আমি অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছি। তাদের কর্মজীবন আমার নিকট অতুলনীয় ও অনুস্মরণীয় মনে হয়েছে। কারী

তায়্যিব সাহেব দেওবন্দের একটি মসজিদে জুমার নামায পড়াতেন, আমি নিয়মিত ভাবে সেই মসজিদে জুমা আদায় করতাম। তাদের দু'জনের শিক্ষা জীবন, পান্ডিত্য ও জ্ঞান-গরিমা আমার শিক্ষা জীবনে অনেক প্রেরণা জুগিয়েছে।

মানুষের পরহেযগারী জীবন আমার মনকে খুব আকৃষ্ট করতো। কোন পরহেযগার ব্যক্তি বা বুযুর্গ ব্যক্তির নাম শুনলে বা সন্ধান পেলে তার সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠতো। আমি ও আমিন ভাই এরূপ বুযুর্গ ও পরহেযগার ব্যক্তিদের নিকট যেতাম। মনের একান্ত কামনা ছিল, আমরাও যেন কর্মজীবনে তাদের ন্যায় পরহেযগার হতে পারি। পরহেযগারী দ্বারাই জীবন পরিশুদ্ধ হয়। পরিশুদ্ধ জীবনই নিরাপদ ও আল্লাহর প্রিয়। মাওলানা হুসাইন সাহেব ঐ সময়ের একজন প্রখ্যাত পরহেযগার ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সায়্যিদ এনায়েতুল্লাহ শাহ বুখারী নির্ভীক, সাহসী ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁদের নিকট গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। জীবন শোধরাবার জন্য ও আল্লাহর পথে নিজেকে অটল রাখার জন্য তাদের জীবন থেকে অনেক কিছু শিখেছি। শিখবার রয়েছেও। আহ্লুল্লাহদের দরবারে গেলে আল্লাহর স্মরণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আহ্লুল্লাহদের পরিচয় ও নিদর্শনও বলেছেন যে, তাদেরকে দেখলেই আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। অন্তর আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। পবিত্র কুরআনে এরূপ নির্দেশনা রয়েছে যে, যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় তোমরা তাদের অনুসারী হও।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ সকলেই মানব মর্যাদার এমনি সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের ধর্ম আদর্শ এতই অনুপম ছিল যে, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লাখো মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। সাহাবীদের যুগ হতে আজ পর্যন্ত প্রতি যুগে এমন কিছু মানুষ জন্ম লাভ করেছেন, যারা ইতিহাসে ইসলামের দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। তারা ইসলামের মশাল। কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষেরা তাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করবে।

ইসলামের আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ যারা যত নিষ্ঠার সাথে ও পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করবে, তারা মানব মর্যাদার তত উপরে উঠবে। ইসলামের আদেশ পালন না করে ও নিষেধ বর্জন না করে উত্তম মানুষ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম ধর্মে হালাল-হারামের, বৈধ-অবৈধের যে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, অন্য কোন ধর্মে তা নেই। আমি শেষ কৈশোরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তার পূর্বে তো হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলাম। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আমার জানাশোনাও কম ছিল না। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কেও অবগত হতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইসলাম ধর্মের ন্যায় এমন বাস্তব ও স্পষ্ট আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারামের দ্ব্যর্থহীন ধর্ম আর একটিও নেই।

ইসলাম ধর্ম, আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণের সাথে সাথে মানুষের অধিকারও সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করেছে এবং অপরিহার্য পালনীয় করেছে এবং এক মানুষের জন্য অন্য মানুষের অধিকারের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে এবং অতি ক্ষুদ্র স্তর পর্যন্ত তা প্রসারিত করেছে। অন্য কোন ধর্মে মানুষের প্রতি মানুষের এত অধিকার ও দায়-দায়িত্বের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্যের

অবকাশ নেই। এটা ইসলাম ধর্মের অনন্য ও একক বৈশিষ্ট্য। নিজ হাতে রোজগার করা শ্রেষ্ঠতম কর্ম স্থির করা হয়েছে। নিজ হাতে যখন মানুষ রোজগার করবে তখন তাকে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না এবং ভিক্ষাও করতে হবে না। রোজগারের ক্ষেত্রে কোন অবৈধ-অন্যায় পন্থা গ্রহণ করা নিষেধ। অবৈধ রোজগার তো দূরের কথা, সন্দেহ-দ্বিধাযুক্ত দ্রব্য পর্যন্ত বর্জনীয়।

মোটকথা, ইসলাম ধর্মের প্রতিটি বিষয় ইসলামের সত্যতা ও কল্যাণের প্রমাণ ও জামিন। ইসলামের আদেশ-নিষেধের যে সঠিক অনুসারী সে শত্রুরও বন্ধু। কারণ, বন্ধুর বন্ধু তো সকলেই। কিন্তু ইসলামের নির্দেশনা এত কল্যাণকর যে, তার অনুসারী শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। সে শত্রুর ধ্বংস চায় না, চায় তার হিদায়াত ও সংশোধন। দুষ্কর্মী সংশোধন হলে সে কল্যাণেরই অনুসারী হলো। তাই ইসলাম ধর্মের সত্যতা ও কল্যাণ অনুধাবনে হাজারো লাখো নয়, বরং কোটি কোটি মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

বায়েজীদ বোস্তামী একজন প্রসিদ্ধ ইসলামী সাধক। একবার তিনি সফর করছিলেন। একজন খৃষ্টান তার সঙ্গী হলো। দুপুরের আহারের সময় হলে বায়েজীদ-বোস্তামী (রঃ) খৃষ্টান ব্যক্তিকে বললেন ঃ ঐ পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে আহারের ব্যবস্থা করুন। খৃষ্টান ব্যক্তি বললো; আপনি আল্লাহর সাধক, আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই তো আমাদের আহারের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

বায়েজীদ বোস্তমী (রঃ) দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে মুনাজাত শুরু করলেন ঃ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার ধর্ম পরীক্ষা করছে। আপনি ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করুণ, যাতে তার সম্মুখে আমার লজ্জা পেতে না হয়। আপনি আমাদের আহারের ব্যবস্থা করুন।

বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) দোয়া শেষ করার পূর্বেই দেখেন এক ব্যক্তি চারটি রুটি এবং তরকারী নিয়ে উপস্থিত হলো। দু'জনেই তৃপ্তি সহকার আহার করলেন। যখন সন্ধা হলো খৃষ্টান ব্যক্তি বললো; হুজুর এই রাত্রের আহারের দায়িত্ব আমার। আমি এখনকার আহারের ব্যবস্থা করবো। একথা বলে খৃষ্টান ব্যক্তি হাত তুলে দোয়া করতে শুরু করলো। দেখা গেল তার দোয়ার মধ্যেই এক ব্যক্তি আহার নিয়ে উপস্থিত হলো। দেখা গেল এবার রুটি রয়েছে আটটি এবং তরকারী রয়েছে দুপুরের দ্বিগুণ।

বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) আশ্চর্যান্বিত হলেন। খৃষ্টান ব্যক্তির দোয়ার এত প্রভাব! জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি দোয়া করেছ ? খৃষ্টান ব্যক্তি বললো, আগে আপনি আমাকে মুসলমান করুন, তারপর বলবো আমি কি দোয়া করেছি।

বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) খৃষ্টানকে ইসলামের কালিমা পাঠ করালেন। মুসলমান বানালেন। এরপর সে বললো, আমি এরূপ দোয়া করেছি, হে আল্লাহ! ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়ে থাকে আর বায়েজীদ যদি আপনার পছন্দনীয় বান্দা হয়ে থাকে তাহলে এখন আমাদের জন্য আপনি দুপুরের দ্বিগুণ আহারের ব্যবস্থা করুন। দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। ইসলাম সত্য ধর্ম, আর আপনি আল্লাহর পেয়ারা বান্দা। তাই আমি আর বিলম্ব করলাম না, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। আল্লাহর

মনোনীত ধর্ম আল্লাহর পেয়ারা বান্দার হাতে কবুল করলাম।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্ম সমূহের মধ্যে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) ইসলাম ধর্মের অনন্য ও একক বৈশিষ্ট্য। অন্য সকল ধর্ম তাওহীদের ধারণা থেকে প্রায় শূন্য। কোন কোন ধর্মের মূলনীতিই হচ্ছে তাওহীদ পরিপন্থী বিশ্বাস। মূর্তিপূজা আর দেবতা পূজা। কোন কোন ধর্মে রয়েছে ত্রিত্ববাদ, আর আল্লাহর অংশীদারিত্বে বিশ্বাস। এভাবে ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম পৃথিবীর বেশীর ভাগ অঞ্চল কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বেশীর ভাগ লোকের অন্তরে তাওহীদের আলো নেই, আছে কুফরীর অন্ধকার। যাদের ভাগ্য ভাল তারা তাদের অন্তরের কুফরী বুঝতে পেরে তা পরিত্যাগ করে তাওহীদ গ্রহণ করে। কুফরীর অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে চলে আসে। আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের পরিসীমা নেই। সারা গোত্রের মধ্যে সারা বংশের মধ্যে আল্লাহ আমাকে কুফরীর অন্ধকার হতে ঈমানের আলোর দিকে চলে আসার তৌফিক দান করেছেন।

সমস্ত নবী-রাসূলগণের ধর্মের মৌল বিষয় হলো আল্লাহর তাওহীদ। তাঁরা সকল মানব মন্ডলীকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহর তাওহীদের উপর ঈমান আনা পৃথিবীর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই অবধারিত ও অপরিহার্য কর্তব্য। এই ঈমানের উপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর তাওহীদের উপর ঈমান আনেনি বা ঈমান সহ মরতে পারেনি, পরকালে সে এক মুহূর্তের জন্যও বেহেস্তে যাওয়ার সুযোগ পাবে না।

আল্লাহর তাওহীদে ঈমান আনা না আনার ব্যাপারে কোন মানুষের এরূপ স্বাধীনতা বা এখতিয়ার নেই যে, মন চাইলে ঈমান আনবে, আর মন না চাইলে আনবেনা; বরং এটা অবধারিত কর্তব্য। প্রত্যেক নবী-রাসূল তাদের যুগের বিভ্রান্ত মানুষকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন।

কিন্তু নবীগণের ইন্তিকালের পর ক্রমে ক্রমে মানুষ আবার শিরক্-কুফরীতে লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহর তাওহীদের সবক ভুলে মূর্তি পূজা শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা আবার নবী পাঠান। মূর্তি পূজারীদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। এভাবে নূহ আঃ থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত এই সিলসিলা চলতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তার সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ধর্ম আজ দেড় হাজার বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। এই ধর্মের সত্যতা অবহিত হয়ে, এই ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজারো নয়, বরং লাখো কোটি মানুষ আল্লাহর তাওহীদের দীক্ষা গ্রহণ করছে। কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী কোন নবীর ধর্ম বা তার উপর অবতীর্ণ কিতাব অবিকৃত থাকেনি। তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্ম, নিজেদের আসমানী কিতাব চরমভাবে বিকৃত করে ফেলেছে। শব্দগত ভাবেও করেছে, বিষয়গত ভাবেও করেছে। পূর্ববর্তী ধর্মের দাবীদার কেউ বলতে পারবে না যে, তাদের নবীর নিকট পাঠানো আসমানী কিতাব অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এ সৌভাগ্য শুধুই মুসলমানদের। আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআন তাদের কাছে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। একটি অক্ষরও পরিবর্তন হয়নি।

কিয়ামত পর্যন্ত হবেওনা, হতে পারবেও না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর তার সাহাবীগণ কুরআন হেফাজত করেছেন। তারপর হতে আজ দেড় হাজার বছর পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে কুরআনের আলেমগণ, হাফেজগণ, কারীগণ, মুফাসসিরগণ কুরআন হেফাজত করে আসছেন। কিয়ামত পর্যন্ত করবেন। আমি যখন খাদিমুশ শরীয়ত মাদ্রাসায় (পিন্ডিঘেব) পড়াশুনা করছিলাম তখন ওখানে থাকাকালে একটি খৃষ্টান দল তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য সেখানে আসে। ফারদ্ আলিম নামে এক পাদ্রী এই মিশনের দায়িত্বে ছিল। এবং চার্চে ৩/৪ জন পুরুষ মহিলা ছিল। পিন্ডিঘেব এর পূর্বদিকে একটি খোলা মাঠে তারা ক্যাম্প তৈরী করলো। এলাকার দূর দূরান্তে ছড়ানো ছিটানো দু'চার জন খৃষ্টান আসা যাওয়া করতে লাগলো। চার্চের লোকেরাও আসা যাওয়া করতে লাগালো। এলাকার কৌতুহলী মুসলমানরাও মাঝে মধ্যে যেত আসতো। মিশনের লোকেরা তাদেরকে খৃষ্টান ধর্মের কথা শুনাতো। একদিন বিকালে অবসর সময় কাটাবার জন্য আমি কয়েকজন ছাত্রসহ ক্যাম্পে গেলাম।

পাদ্রী আমাদের দেখেই বিরক্তি প্রকাশ করে বললো, এখানে আমরা তেমন সুবিধা করতে পারছি না। আপনাদের মুসলমান আসে চা খেয়ে চলে যায়। যুবকরা এসে আমাদের মেয়েদের সাথে আড্ডা দিতে চায়, গল্প করতে চায়। তাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা নেই। তাই আমাদের ধর্ম সম্পর্কেও কিছু শুনতে চায় না। আমরা আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনাদের যদি ধর্ম সম্পর্কে কথা বলার ইচ্ছা থাকে তাহলে আগামীকাল সকালে আসুন।

আমি বললাম, পাদ্রী সাহেব আমরা তো ছাত্র। সকালে আমাদের ক্লাশ আছে, তখন আসতে পারবো না। তাছাড়া আমরা চা-ও পান করতে চাই না। আপনাদের যুবতীদের ব্যাপারেও আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আমরাতো আপনার সাথে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

শুনুন! আমার বর্তমান নাম গাজী আহমাদ। পূর্বের নাম ছিল কৃষ্ণলাল। হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। ১৯৩৮ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। বর্তমানে মাদ্রাসায় ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা লাভ করছি। প্রথম দিকেরই ছাত্র। ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক কিছুটা জানা শোনা আছে। আপনার কাছে আগ্রহ সহকারে এসেছি। আপনি যদি ইসলাম ধর্মের মোকাবিলায় বর্তমান খৃষ্টান ধর্ম পালনের ও তা গ্রহণের সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আপনার হাতেই আপনার ধর্ম আমি খুশী মনে গ্রহণ করবো।

আমার কথা শুনে পাদ্রী অখুশী প্রকাশ করলো না, বরং বাহ্যত খুশীই দেখাল। বললো আমার সাথে আসুন। আমাদেরকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল, চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললো। পাদ্রীর মিশনের বাকী লোকেরাও এসে নীরবে তাঁবুর একেক স্থানে বসলো।

পাদ্রী সাহেবই কথা শুরু করলেন। আমি বললাম, অনেক কথা আছে বলবো না, আপনি বলবেন? আচ্ছা তাহলে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করবো। আপনি যদি তার প্রামাণ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করতে পারেন তাহলে আপনার

কথা গ্রহণে আমার কোন ওজর-আপত্তি থাকবে না। আমি ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোকপাত করবো এবং খৃষ্ট ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসার জবাব চাইবো।

আমি আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) এর ব্যাখ্যা করছি। আপনি ত্রিতত্ত্ববাদের ব্যাখ্যা বলুন। দু'জনের বিতর্কে সঠিক কথা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে। আমি পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তাওহীদের মর্ম বুঝিয়ে বললাম। পাদ্রী ত্রিতত্ত্ববাদের পক্ষে যুক্তি দিলেন। আমি বললাম, পাদ্রী সাহেব! ত্রিতত্ত্ববাদের মর্মতো হচ্ছে তিন প্রভু ঃ ১. আল্লাহ ২. (ঈসা আঃ) ৩. মরিয়াম (আঃ)। যার ফল দাড়াচ্ছে মরিয়াম আল্লাহর স্ত্রী। আর এখানে এটা স্বাভাবিক যে, পিতা, মাতা, পুত্র একই প্রকারের ও প্রকৃতির সকলের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে। ঈসা (আঃ) মরিয়াম (আঃ)-এর গর্ভ থেকে আর মরিয়াম ইমরানের স্ত্রীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে। আপনাদের দুই প্রভু যখন দুই মহিলার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে তাহলে তৃতীয় প্রভু সম্পর্কে আপনাদের ধারণাটা কি ? তিনি কার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছেন ? আল্লাহ তা'আলার মাতা কে? বলবেন কি?

পাদ্রী ঃ ঈসাকে (রুহুল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ক্ষমতা ও নির্দেশ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

জনাব, তাহলে তো ঈসা (আঃ) সৃষ্টি হলেন। রুহুল কুদুসও সৃষ্টি হলেন। এবার ইনসাফ করে বলুন, সৃষ্টি আর স্রষ্টা এক প্রকারের কি করে হতে পারেন? পাদ্রী সাহেব মুচকি হাসতে লাগলেন–কোন জবাব দিলেন না। তার এই হাসির মর্ম আমি বুঝতে পারলাম না।

পাদ্রী সাহেবের দ্বিতীয় কথা হলো, একই শ্রেণী বা প্রকারের একাধিক সংখ্যা সম বৈশিষ্ট্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ। মনুষ মাত্রেই মানবিক চাহিদা, মানবিক দুর্বলতা, মানবিক বৈশিষ্ট্যে সমান। আপনি একটু পূর্বেই স্বীকার করলেন ঈসা (আঃ) সৃষ্টি (মানুষ) ছিলেন। তাহলে কি আপনি একথা বলতে চান ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে যেসব চাহিদা ও প্রয়োজন ক্ষুধা-নিদ্রা, পিপাসা-আনন্দ, ব্যথা-রোগ ইত্যাদি অবস্থা বিদ্যমান ছিল, সেসব অবস্থা, চাহিদা ও প্রয়োজন আল্লাহর মধ্যে রয়েছে?

ক্ষমা করবেন পাদ্রী সাহেব ! এমন ত্রুটিযুক্ত প্রভূ আপনাদের ধর্ম বিশ্বাসে থাকতে পারে, আমাদের ধর্ম বিশ্বাসে ঐরকম প্রভু নেই। আমাদের প্রভুকে তো নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ করে না। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই নেই। আসমান-যমিনে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুই তার দাস, তাঁর অধীন ও আজ্ঞাবহ। কিছুই তাঁর সমতুল্য, সমকক্ষ ও সাদৃশ্য নেই। তাঁর কোন সহকর্মী ও সহযোগী নেই। তিনি এক, একক স্বত্ত্বা ও গুণাবলীতে তাঁর কোনই অংশীদার নেই। আপনাদের প্রভু তো আমাদের প্রভুর বান্দা ও সৃষ্টি।

পাদ্রীকে এবার বিষণ্ন মনে হলো। কিন্তু ঠোটের কোণে হাসির রেখা টেনে রাখতে চেষ্টা করে বললো–গাজী আহমাদ আপনি এখনও যুবক মানুষ। উদ্যম আপনার অনেক, আবেগও আছে, অপেক্ষা করুন আমাদের পোপ আসবে এ এলাকায়। আপনাকে তার সাথে দেখা করিয়ে দিব। সব জবাবই তিনি আপনাকে

দিবেন। এরপর বললেন, তাহলে এখন আসুন।

বিদায় করে দিচ্ছেন না বিদায় চাচ্ছেন? এর অর্থ এই আমার প্রশ্নের জবাব অন্ত-ত আপনার নিকট নেই। আমি বলে গেলাম, আপনার পোপ কেন মাটির উপরে কারো কাছেই নেই।

বিদায় হয়ে চলে যাব এমনি সময় পাদ্রী একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিল, যা ছিল খুবই ভ্রান্তিকর, বরং সব ভ্রান্তির উৎস। বললো, আপনারা যদি আল্লাহকে এক, একক ও অংশীদারহীন স্বীকার করে নেন তাহলে তো নবী-রাসূলগণ শুধু মানুষ থেকে যান। মানুষ কি করে নবী-রাসূলের মর্যাদা লাভ করতে পারেন?

হাঁ, হাঁ পাদ্রী সাহেব! আপনারা খৃষ্টান জগত এখানেই জ্ঞানের ভারসাম্য হারিয়ে পরবর্তীতে কুফরের পথে ত্রিত্ববাদ নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

মানব মর্যাদার প্রকৃত ও সমুচ্চ অবস্থান আপনারা স্থিরই করতে পারেননি, অন্যথায় আপনাদের এই দশা হতো না। ঈসা (আঃ) আগমন করলেন ইয়াহুদীদের কুফরী মতবাদ দূর করতে, ভাগ্যের কি পরিহাস কুফরীর অতলে থেকেই আপনারা বিশ্বজুড়ে ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার ডামাডোল পিটাচ্ছেন, পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলই মানব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সমস্ত নবী-রাসূলগণ সহ সব মানুষই আদম (আঃ)-এর নসল বা বংশধর। কাজেই সমস্ত নবী-রাসূলগণই মানব সম্প্রদায় ভুক্ত।

মানুষের স্থান ও মর্যাদা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম। মানুষ হওয়া কোন ক্ষুণ্ন কিছু নয়। আমরাও মানুষ, আর নবী-রাসূলগণও মানুষ; কিন্তু নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রকার মানবিক ত্রুটিমুক্ত এবং মানবিক গুণাবলী ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ। আর আমরা নানারকম ত্রুটিযুক্ত। আমাদের মধ্যে হাজারো ত্রুটি ও অভাব রয়েছে। আপনারা হয়ত নবুওয়াতের ও রিসালাতের স্থান নিজেদের উপর কিয়াস করেছেন। এখানেই আপনাদের ভ্রান্তির মোড়। আর একারণেই আপনারা মানুষকে নবী মনে করতে পারছেন না। ত্রুটিমুক্ত ভাবার জন্য তাদেরকে আল্লাহর স্থানে বা আল্লাহর অংশ মনে করে নিয়েছেন। কি ভ্রান্তিতে পড়লেন আপনারা। একারণেই ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে কুল-কিনারাহীন কুফরীতে ডুবলেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ না করলে আপনারা কোনকালেও কুফরীর অন্ধকার অতিক্রম করে ঈমানের আলোতে আসতে পারবেন না।

ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে তাঁকে আপনারা মানুষের উপরে তুলে নবীর মর্যাদা দিতে চেয়েছেন-আপনারা একথা কি চিন্তা করেছেন, তাতে আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে কিনা?

কোন নবী বা রাসূল একথা বলেননি যে তাঁরা আল্লাহর অংশীদার। এমনকি ঈসা (আঃ)ও এমন কথা বলেননি, বলতে পারেন না। এটা শুধুই আপনাদের পোপদের বানানো। এ দ্বারা ধর্মের মৌল বিশ্বাস ও আবেদন বিকৃত হয়েছে। এমন বিকৃতি যা প্রকাশ্য শিরক্ ও কুফরী।

পাদ্রীকে আমিই বলে যাচ্ছিলাম। কথা তো বেশ লম্বা হলো। আমরা উঠছিলাম এরই মধ্যে মিশনের 'বয়' চা নিয়ে এল। আমরা চা খেলাম না! বললাম, আমরাতো

পূর্বেই বলেছি, আমরা চা খেতে আসিনি। আমি আসার সময় পাদ্রী সাহেবকে আমাদের মসজিদে আসার দাওয়াত দিয়ে এলাম। বললাম, আপনি এলে আমরা আপনার যথাযথ সম্মান করবো। আমাদের উস্তাদ কাজী শামছুদ্দীন সাহেব ধর্মীয় জ্ঞান-গরিমায় খুবই সমৃদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর সাথে কথা বলে আপনি প্রীত হবেন। কিন্তু পাদ্রী ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

পাদ্রী সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে অপর একটি তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন, আপনি খুব ভাল মানুষ। ভালভাবে কথা বলেছেন। আমি আপনার কথায় খুশী হয়েছি। আপনার ধর্ম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান অনেক। আপনি যদি খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করতে চান তাহলে আপনি ক্যামেলপুরে আমাদের চার্চে আসুন। সেখানে পড়াশুনা ও থাকার মানোরম ব্যবস্থা ও পরিবেশ রয়েছে। আসা যাওয়া ও থাকা খাওয়া সহ যাবতীয় ব্যবস্থা আমরা করব। পাদ্রী উৎসাহিত হয়ে বললেন, কথা দিন আসবেন। আপনার একা যেতে হবে না। সম্মতি জানতে পারলেই হলো। আমাদের গাড়ী পৌঁছে যাবে আপনার নিকট। ঠিক আছে?

আমি বললাম, জনাব খুব নিকট ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে না। আমি ছাত্র মানুষ। পড়াশুনার ব্যস্ততায় থাকতে হয় সব সময়।

পাদ্রী বলল, গাজী আহমাদ সাহেব আপনাকে স্মরণ রাখবো। আপনাকে পত্র লিখবো। আপনার প্রশ্নের জবাব চার্চের মাধ্যমে লিখে পাঠাবো। কেমন?

গাজী আহমাদ ঃ ঠিক আছে! আমিও আপনার পত্রের জবাব দিতে চেষ্টা করবো।

সাথীদেরকে নিয়ে আমি পাদ্রীদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলাম। মাদ্রাসায় এসে মাদ্রাসা প্রধান কাজী শামছুদ্দিন সাহেবকে ঘটনা শুনালাম। হুজুর বললেন, তুমি এখনও মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমের শুরু ভাগের ছাত্র। সতর্কতার সাথে কথা বলবে। সামনে গেলে আমাকে সাথে নিয়ে যাবে।

পাদ্রী সাহেব তাদের ক্যাম্প তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই তার এক দীর্ঘ পত্র এল। তাতে তাদের ত্রিতত্ত্ববাদ সম্পর্কে একটি কথাও লেখা পেলাম না। শুধু পেলাম ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনর্থক কতগুলো আপত্তি। আমি আমাদের উস্তাদের সহযোগিতায় তার জবাব লিখে পাদ্রীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।

প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত আমাদের চিঠি-পত্রের আদান প্রদান রইল। মনে হচ্ছিল পাদ্রী সাহেব আমাকে হাতছাড়া করতে চাইছেন না। যে কোনভাবেই হোক আমাকে শিকার করবেনই করবেন। এটা খৃষ্টান মিশনারীদের অপকৌশল, কাউকে নজরে পড়লে যে কোনভাবেই হোক, তাকে শিকার করতেই সচেষ্ট থাকেন। মিষ্টিকথা দিয়ে না হলে অর্থ দিয়ে, অর্থ দিয়ে সম্ভব না হলে 'অন্য' কিছু দিয়ে। বর্তমান সময়ে যারা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছেন, তাদের একজনও খৃষ্ট ধর্মের সত্যতা বা তার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়ে সেই ধর্ম গ্রহণ করছেন না, বরং দারিদ্র মোচন করে দেয়ার আশ্বাস বা সম্পদের লোভ বা নারীর মোহেই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছেন অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মূল উপাদানই হচ্ছে-এক খন্ড জমি বা একটা বাড়ী বা একজন যুবতী।

একদিন বিকালে আমাদের মাদ্রাসায় একটি কার এসে থামলো। কারের ভিতর হতে দু'জন ভিনদেশী পরমা সুন্দরী মেয়ে নামলো। তারা আমার মাদ্রাসায় এসে আমাকে খোঁজে বের করলো। বললো, আলীম সাহেব আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে বলেছেন। যতদিন ইচ্ছা আমাদের ওখানে থাকবেন। আপনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। ইচ্ছা করলে লন্ডনও ঘুরে আসতে পারবেন। ধর্মীয় বিষয়ে অনেক আলোচনা করতে পারবেন। আলীম সাহেবের কুমতলবের কথা আমার বুঝতে বাকী রইলো না। খুব কম মানুষই তো এই ধোকা থেকে বাঁচতে পারে।

যুবতীদ্বয় আমাকে অনুনয়-বিনয় করে বলতে লাগলো আপনি আমাদের সাথে অবশ্যই চলুন। অলীম সাহেব আমাদের খুব তাকিদ করেছেন আপনাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যুবতীদের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এক বিয়াইকে দুই বিয়াইন নিতে এসেছে।

আমি স্থির কণ্ঠে বললাম, আপনারা চলে যান। এখন আমার পড়াশুনার ব্যস্ততা অনেক। আমি কোন এক সময় উপস্থিত হতে চেষ্টা করবো। যুবতীদ্বয় নিরুপায় হয়ে ফিরে গেল।

অলীম সাহেব তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যম গ্রহণ করেছেন যুবতী নারী। কিন্তু তার হয়তো জানা নেই, যাদের মনের গভীরে ঈমান প্রবেশ করেছে, তারা এসব যুবতীর মোহে বা লোভে পড়বে না; বরং তারা এ পন্থাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করবে, বর্জন করবে।

আমার পিতাও তো আমাকে বলেছিলেন, হিন্দু উচ্চবর্ণ ও ধনাঢ্য ঘরে আমার বিবাহের প্রস্তাবনা রয়েছে, কিন্তু আমি সেদিকে বিভ্রান্ত হইনি। এমনকি আমাকে যখন কাশ্মীরে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল তখনও কয়েকটি সমবয়সী যুবতী মেয়ে আমার পিছনে প্রায় লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল, যেন আমি তাদের কারো সাথে মনের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি, আর ইসলাম ধর্মের কথা বিস্মৃত হয়ে যাই। একে একে এই তিন বার যুবতীদের দ্বারা আমাকে ইসলাম ধর্ম থেকে সরিয়ে নেয়ার ফাঁদ ফেলা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাকে ইসলামের উপর অটল রাখলেন।

ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করার পর মক্কার মুশরিক নেতারা এক পর্যায়ে প্রস্তাব নিয়ে এল হে মুহাম্মদ! আপনি ইসলাম প্রচার বন্ধ করুন। আমরা তার বিনিময়ে আপনার পদতলে সম্পদের স্তুপ এনে দিব। যদি আপনি নেতৃত্ব চান তাহলে আরবের অনন্য নেতা মনোনীত করে দিব, যদি রূপসী যুবতী-নারী চান আরবের সুন্দরতম নারীদের এনে দিব আপনাকে। আপনার যে কোন ইচ্ছা আমরা অবশ্যই পূরণ করে দিব। তার বিনিময়ে আমরা শুধু এটুকু চাইবো আপনার কাছে যে, আপনি আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না।

বিশ্ব মানবের মুক্তির দূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জবাবে বলেছিলেন, "তোমাদের প্রস্তাবগুলোর মধ্য হতে আমার একটিরও কোন লোভ নেই, প্রয়োজনও নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবুওয়াত-রিসালাতের গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন। যে

কোন অবস্থায় আমাকে এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। এর অন্যথার কোনই অবকাশ নেই। বাঁধা-বিপত্তি বা চাপের মুখে অথবা যে কোন লোভ-লালসা আমাকে এ গুরু দায়িত্ব পালনে বিরত রাখতে পারবে না।

আলহামদুলিল্লাহ্! আমি সেই মহান মর্যাদা সম্পন্ন নবীর (সাঃ) হীনতম গোলাম, যিনি ইসলাম প্রচারের মোকাবিলায় সারা পৃথিবীর লোভনীয় সবকিছু ত্যাগ করেছেন।

আমার শুধু দাবী নয়, বাস্তব অবিজ্ঞতাও এই যে, ইসলামই মানুষের জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও অনুগ্রহ। আল্লাহর এই আপার অনুগ্রহের জন্য পৃথিবীর সব ত্যাগ করা যায়। যে ঐরূপ করবে সে চরমভাবে বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবন কথা শেষ করার পূর্বে আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে- ইসলামের নির্দেশ-নির্দেশনা (যতটুকু সম্ভব) পালন করে-ইসলামী জীবন যাপন অনুসরণ ও অনুশীলন করে আমি সঠিক ভাবেই আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করেছি, বরং ইসলাম গ্রহণে আমি ধন্য ও পূর্ণ হয়েছি। নিজেকে ভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত মনে করছি। ঈমানে প্রবেশ করেছি; অন্ধকার হতে আলোতে এসেছি।

যারা কোন মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, তারা তো জন্মগত ভাবেই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন, কিন্তু আমি যেহেতু এক সনাতন হিন্দুর ঘরে জন্মেছি, তাই জন্মগত এই সৌভাগ্য আমার নেই। এ কারণেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের এই সৌভাগ্য আমার উপলব্ধিতে ও আমার মনে এত প্রখর ও ভাস্বর। আমি নাম প্রকাশ না করে সেই সব ভাই ও করুণা ভাজনদের শুকরিয়া আদায় করছি, যারা আমার ইসলাম গ্রহণের পর আমার জন্য নিজেদের কাজকর্ম ফেলে বিভিন্ন আদালত পর্যন্ত মাইলের পর মাইল পথ পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয়েছেন- তারা তাদের রক্তের মূল্যে আমাকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছেন। মূলত তারা তাদের পবিত্র ধর্ম ইসলামের জন্যই এরূপ করেছেন। আল্লাহ তাদের সেই খিদমত কবুল করুন।

সমাপ্ত